সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন

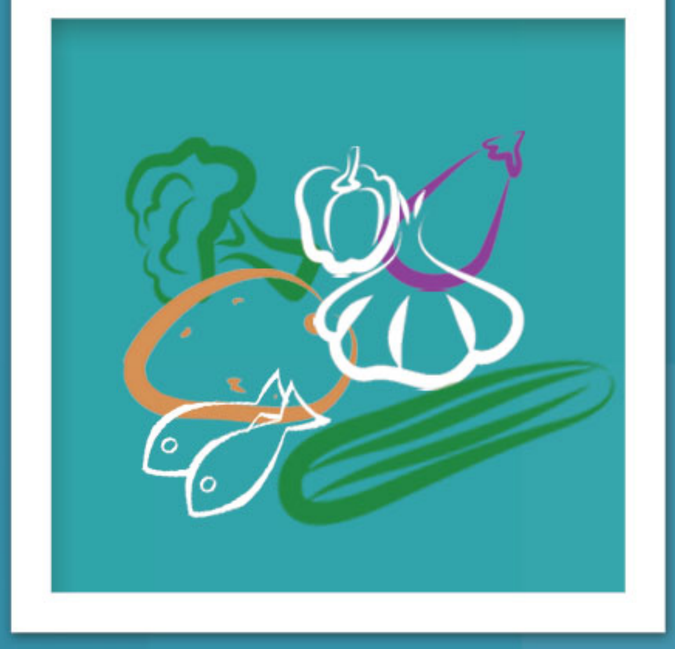

কোয়ান্টাম

সুস্থ দেহ
প্রশান্ত মন

সংকলন ও সম্পাদনা

ডা. আতাউর রহমান

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
www.quantummethod.org.bd

সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন

সংকলন ও সম্পাদনা

ডা. আতাউর রহমান

প্রকাশক

মায়িশা তাবাসসুম
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৮৩৯৬৮১৫, ৯৩৫৫৭৫৬, ০৯৬১৩-০০২০২৫
০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩, ০১৭৪০-৬৩০৮৫৬, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮
E-mail : info@quantummethod.org.bd

গ্রন্থস্বত্ব

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

প্রথম প্রকাশ

১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

মুদ্রাকর

উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার
ইসলাম ভবন (২য় তলা)
৬৮ ফকিরাপুল বাজার রোড,
ঢাকা-১০০০

মূল্য

২২৫ টাকা

Shustho Deho Proshanto Mon
(Healthy Body Peaceful Mind)

Published by

Quantum Foundation
www.quantummethod.org.bd

Price : 25 $

উৎসর্গ

বরেণ্য চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও
বাংলাদেশে স্বাস্থ্য-চেতনা বিস্তারের পথিকৃৎ
জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম-এর
স্মৃতির উদ্দেশ্যে–

সুস্থ জীবনদৃষ্টি
স্বাস্থ্যসম্মত পরিমিত আহার
পর্যাপ্ত পানি পান
মেডিটেশন
দম চর্চা
ও
কোয়ান্টাম ব্যায়াম দিতে পারে
সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন
কর্মব্যস্ত সুখী জীবন

সূচিপত্র

সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন	১১
সুস্বাস্থ্য ও সাফল্যের পথে একধাপ এগিয়ে থাকুন	১৬
'সুখ' তৈরি করে নিন! সুখী হোন	২১
হাসুন, প্রাণখুলে হাসুন, আনন্দে বাঁচুন	২৩
আপনিও দীর্ঘায়ু হবেন	২৭
সুস্বাস্থ্য ॥ প্রাচুর্যের অন্যতম ভিত্তি	৩১
সকাল শোয় সকাল ওঠে, তার কড়ি বৈদ্য না লুটে	৩৩
দম ॥ জীবনের মূল ছন্দ	৩৭
মায়ের দুধ হোক শিশুর প্রথম খাবার	৪০
পানিই সেরা পানীয়	৪৬
সুস্থ খাদ্যাভ্যাস সুস্থ জীবন	৫০
বিস্ময়কর সব্জি-রাজ্য	৫৪
ডিম ॥ প্রতিদিনের দরকারি খাবার	৫৬
আলু খান ভালো থাকুন, ভাতের পাশে আলু রাখুন	৫৯
মাশরুম ॥ হতে পারে প্রাণীজ আমিষের বিকল্প	৬৩
সয়াবিন ॥ প্রকৃতির এক অমূল্য খাদ্য-উপাদান	৬৫
বাদাম খান প্রতিদিন, আপনি ভালো থাকবেন	৭০
ওমেগা-৩ ॥ হৃৎবান্ধব বটে, তবে...	৭৫
রোজা পালন করুন, রোগ থেকে বাঁচুন, অটুট রাখুন অনন্ত যৌবন	৭৯
ফাস্টফুড ॥ ধেয়ে আসছে স্বাস্থ্য-বিপর্যয়	৮১
কোমল পানীয় ॥ আসলে কতটা কোমল?	৮৯
চিনি ॥ হোয়াইট পয়জন : এলকোহলের মতোই বিপজ্জনক!	১০০
টেস্টিং-সল্ট ॥ সুস্বাদু 'স্নায়ু বিষ'	১০৪
মেদস্থূলতা ॥ সচেতনতা প্রয়োজন এখনই	১০৮
অধিক সময় টিভি দেখা হৃদরোগ ও অকালমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়	১১৫
ভুল বিনোদন ॥ ডেকে আনতে পারে ভয়াবহ পরিণতি	১১৭
মোবাইল বোমা ॥ স্বাস্থ্যঝুঁকি ও শঙ্কায় আগামী প্রজন্ম	১২০
আপনার স্ট্রেস-এর শিকার হতে পারে আপনার পরবর্তী প্রজন্ম!	১২৪
সচল থাকুন সুস্থ থাকুন	১২৬
হাঁটুন, নিয়মিত হাঁটুন	১৩০

শিশুদের দিনে কমপক্ষে তিন ঘণ্টা সক্রিয় রাখতে হবে ■ ১৩৪
ব্যায়াম মস্তিষ্কের শক্তি বাড়ায় ■ ১৩৬
অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসাকে 'না' বলুন ■ ১৩৯
ওষুধ-বাণিজ্যের ফাঁদে বিষণ্নতা ■ ১৪৪
সিজারিয়ান ॥ নতুন চিকিৎসা মহামারি? ■ ১৪৯
নিরাময়ের আধুনিক ধারণা ॥ জানা চাই সবারই ■ ১৫৭
প্লাসিবো ॥ বিশ্বাস রোগ নিরাময় করে ■ ১৬১
ধর্মবিশ্বাস রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে ■ ১৬৫
প্রার্থনায় ওজন কমে ■ ১৬৮
ক্যান্সার প্রতিরোধ করুন ■ ১৭০
নার্ভ সেলের পুনর্জন্ম ॥ চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিস্ময় ■ ১৭৩
মেডিটেশন ও সুস্থ জীবনচর্চা ॥ জিনগত পরিবর্তনের সূচনা করে ■ ১৭৫
নেতিবাচকতার বৃত্ত ভাঙতে চাই মেডিটেশন ও আনন্দ-অনুরণন ■ ১৭৯
মেডিটেশন ও ইতিবাচক চিন্তায় প্রভাবিত হয় আপনার অনাগত সন্তান ■ ১৮৩
মেডিটেশন করুন ॥ বাড়বে আপনার নিরাময় ক্ষমতা ■ ১৮৫
মেডিটেশন ॥ হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় করে ■ ১৮৯
মেডিটেশন ও নিউরোনের সংযোগায়ন মস্তিষ্ককে শাণিত করে ■ ১৯৩
মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি বাড়ায় মেডিটেশন ■ ১৯৭
মেডিটেশন দেবে নতুন আইডিয়া আর সমাধান ■ ১৯৯
স্কুলে মেডিটেশন চর্চা শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ কমায় ■ ২০১
মেডিটেশন স্থায়ী ও অনন্ত সুখের মূল উপাদান ■ ২০৩

সুস্থ দেহ
প্রশান্ত মন

সুস্বাস্থ্যই জীবন

সুস্বাস্থ্যই জীবন। সুস্বাস্থ্যের গুরুত্ব আর প্রয়োজনীয়তা সবসময় সবকালেই অনুভব করেছে মানুষ। একবিংশ শতাব্দীতে এসে এটি আরো বেশি করে অনুভূত হচ্ছে, কারণ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশ আর বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতির পথ ধরে আমাদের জীবন আগের চেয়ে অনেক সহজ আর গতিশীল হয়ে উঠেছে সত্যি, কিন্তু আক্রান্ত হয়েছে আমাদের স্বাস্থ্য–শারীরিক মানসিক আত্মিক এমনকি সামাজিক দিক থেকেও।

আর, সার্বিক মনোদৈহিক সুস্থতা ও আনন্দময় দিনযাপনের জন্যে চাই সুস্থ জীবনদৃষ্টি ও জীবনের সবক্ষেত্রে সমন্বয়। কারণ, শরীর ভালো থাকলে যেমন মন ভালো থাকে, তেমনি প্রশান্ত মন নিশ্চিতভাবেই বাড়িয়ে দেয় দেহের শক্তি আর উদ্যম। তাই বলা যায়, এ সবগুলো অনুষঙ্গকেই যিনি যতটা ভালোভাবে সমন্বয় করতে পারেন, তিনিই পারেন ততটা সুস্থ জীবনযাপন করতে।

গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে এসব বিষয়ে মানুষকে সচেতন করে তুলছে কোয়ান্টাম। কোয়ান্টাম বুলেটিনে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে আধুনিক ধারার শতাধিক স্বাস্থ্য-নিবন্ধ। বিশ্বখ্যাত সাময়িকী টাইম, নিউজউইক, রিডার্স ডাইজেস্ট, নিউসায়েন্টিস্ট, সায়েন্টিফিক আমেরিকান এবং খ্যাতনামা মেডিকেল জার্নাল ও স্বাস্থ্য-বিষয়ক ওয়েবসাইটগুলোতে প্রকাশিত সাম্প্রতিক তথ্য-উপাত্তের আলোকে লেখা এসব নিবন্ধ আগ্রহী পাঠকেরা সাদরে গ্রহণ করেছেন, পড়েছেন, উপকৃত হয়েছেন। সবার দীর্ঘদিনের একটি আকাঙ্ক্ষাও ছিলো লেখাগুলোকে একত্র করে প্রকাশের। তারই ফলাফল এ সংকলন–সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন।

সহজ সাবলীল ভাষার এ সংকলনটি পড়ে আপনিও সুস্বাস্থ্যের সঠিক ধারণায় উজ্জীবিত হোন; আপনার জীবন ভরে উঠুক কল্যাণ ও সমৃদ্ধিতে– এ কামনায়।

রোগব্যাধির অনুপস্থিতিই সুস্বাস্থ্য নয়।
সুস্বাস্থ্য হচ্ছে
ভালো থাকার এক অন্তর্গত অনুভূতি
যা আপনাকে সবসময়
আনন্দোচ্ছল করে রাখে।

সুস্থ দেহ
প্রশান্ত মন

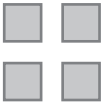

মানুষ এমন এক সত্তা
যার রয়েছে দেহ ও মন।
সুস্থ দেহ ও সবল মনের সম্মিলনেই
জীবন পায় নতুন গতি।

দেহ-মনকে সবসময়
আনন্দে প্লাবিত হতে দিন।
আনন্দের প্লাবন
সকল রোগব্যাধি ক্লান্তি আলস্য
ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন
কর্মব্যস্ত সুখী জীবন

সুস্থ থাকতে চাই আমরা সবাই। কারণ, সুস্থতাই স্বাভাবিক আর অসুস্থতা অস্বাভাবিক। আর সুস্বাস্থ্য বলতে কেবল শারীরিক সুস্থতাকেই বোঝায় না; বরং শরীর-মন সব মিলেই আমাদের সত্যিকারের সুস্বাস্থ্য। এ কারণেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক আত্মিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যের কথা-ও উল্লেখ করেছে।

দৈনন্দিন জীবনের কিছু সাধারণ বিষয়ের প্রতি একটু মনোযোগী হলে খুব সহজেই আমরা পেতে পারি সুস্বাস্থ্যের দেখা। চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণা ও বিভিন্ন দেশি-বিদেশি জার্নালে প্রকাশিত নানা তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে এ বিষয়গুলো এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য। আসুন, জেনে নিই স্বতঃস্ফূর্ত সুস্থতার সহজ সূত্রগুলো–

প্রাকৃতিক খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হোন

আপনার প্রতিদিনের খাবার হোক বিজ্ঞানসম্মত। তাই সব ধরনের প্যাকেটজাত ও কৃত্রিম খাবার বর্জন করুন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এগুলো আসলে সুন্দর মোড়কে আবর্জনা (জাংক ফুড) বৈ আর কিছু নয়। অনুসন্ধানে জানা যায়, প্যাকেটজাত খাবারগুলোকে আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন করে তুলতে পাঁচ ধরনের প্রায় ১৫ হাজার কৃত্রিম রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হয়। দীর্ঘমেয়াদে যা শরীরের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই ফাস্টফুডসহ সবরকম প্রক্রিয়াজাত খাবার যতটা সম্ভব বর্জন করুন।

এড়িয়ে চলুন রঙ দেয়া মিষ্টি ও টেস্টিং-সল্টযুক্ত খাবার। টেস্টিং-সল্ট মস্তিষ্কে টিউমারসহ বিভিন্ন রকমের মনোদৈহিক জটিলতা সৃষ্টির কারণ বলে প্রমাণ মিলেছে। এছাড়াও কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংকস, প্যাকেটজাত জুসসহ সব ধরনের কৃত্রিম ও প্রক্রিয়াজাত পানীয় থেকে থাকুন শত হস্ত দূরে। জেনে রাখুন, কৃত্রিম রঙ আর একাধিক ক্ষতিকর উপাদানে ভরা এসব পানীয় আপনার শরীরের জন্যে বেশ ক্ষতিকর।

প্রাকৃতিক খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হোন। প্রাকৃতিক এবং সুষম। আর এটাই বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভ্যাস। দৈনন্দিন খাবারের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকুক মৌসুমি ফলমূল, শাক-সব্জি, সব ধরনের ডাল ও সালাদ। সাথে পরিমাণমতো ভাত, মাছ কিংবা মাংস। খাবারে যতটা সম্ভব তেল চর্বি ভাজাপোড়া এড়িয়ে চলুন। প্রচার স্বাধীনতার এ যুগে হৃৎস্বাস্থ্যকর (!) বিভিন্ন তেল নিয়ে চলছে ব্যাপক প্রচারণা। কিন্তু জেনে রাখুন, কোনো তেলই আসলে হৃদযন্ত্রের জন্যে উপকারী নয়। কারণ, কমবেশি সব ধরনের তেলেই রয়েছে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড বা সম্পৃক্ত চর্বি, যা শরীরে গিয়ে ক্ষতিকর এলডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রাকে নিশ্চিতভাবেই বাড়িয়ে দেয়।

তাই যতটা পারেন তেলের পরিমাণ কমিয়ে দিন আপনার দৈনন্দিন খাবারে। আর কমিয়ে দিন চিনির পরিমাণ, সাম্প্রতিককালে এটিকে 'হোয়াইট পয়জন' নামে অভিহিত করা হচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব অঞ্চলের খাবারে চিনির পরিমাণ বেশি থাকে বার্ধক্যজনিত রোগের প্রকোপও সেখানে তুলনামূলক বেশি এবং সেখানকার মানুষ দ্রুত বুড়িয়ে যায় অর্থাৎ অকাল-বার্ধক্য ত্বরান্বিত হয়।

পাশ্চাত্যে দীর্ঘ নৃ-তাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষের দাঁত এবং পুরো পরিপাকতন্ত্র লতা-পাতা অর্থাৎ শাক-সব্জি হজমের উপযোগী করেই গঠিত। তাই খাদ্যতালিকায় এ খাবারগুলো অধিক পরিমাণে থাকাটা আপনার সুস্থতার জন্যেই প্রয়োজন। তাই প্রচুর আঁশ-জাতীয় খাবার খান নিয়মিত। সেইসাথে প্রচুর পানি পান করুন। স্বাভাবিক আবহাওয়ায় কমপক্ষে দুই লিটার প্রতিদিন। তাতে ত্বকের সুস্থতা আর কমনীয়তার জন্যে প্রয়োজন হবে না বাড়তি কিছুর। আর পানীয় হিসেবে ডাব কিংবা লেবু পানি আদর্শ।

প্রতিদিন খেতে পারেন একটু টক দই। সবদিক থেকেই এটি ভালো। আর মোটা হয়ে যাওয়ার ভয়ে যারা দুধ খেতে চান না তারা নির্ভয়ে খেতে পারেন সয়াদুধ। এটি স্বাস্থ্যকর। সয়াদুধ নিজেই বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারেন খুব সহজেই।

মুঠোভর্তি বাদাম খান প্রতিদিন। বাদাম উপকারী কোলেস্টেরল এইচডিএল-এর পরিমাণ বাড়ায় ও অন্যান্য কোলেস্টেরলের মান স্বাভাবিক রাখে। তাই এটি হৃদযন্ত্রের জন্যে এবং আরো নানাভাবে উপকারী। পেনসিলভ্যানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির একটি গবেষণায় দেখা গেছে, সপ্তাহে পাঁচবারের বেশি বাদাম খান যারা, করোনারি হৃদরোগে তাদের মৃত্যুর সম্ভাবনা ২৫ থেকে ৩৯ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়।

হাঁটুন, প্রতিদিন হাঁটুন

পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ ব্যায়াম বুঝি এটাই। সহজ কিন্তু দারুণ উপকারী। বিশেষজ্ঞদের মতে, ঘণ্টায় চার মাইল বেগে প্রতিদিন আধঘণ্টা হাঁটা হৃদরোগ, ডায়াবেটিস আর উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্যে তো বটেই, সুস্থতা-প্রত্যাশী সব মানুষের জন্যেই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত হাঁটলে শরীর হয়ে ওঠে ঝরঝরে। মনটা থাকে চনমনে আর সুখানুভূতিময়। পরখ করে দেখতে পারেন। উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন যারা, তাদের জন্যে সকালের চেয়ে বিকেলে হাঁটা ভালো।

হালকা ব্যায়াম, সাথে দমচর্চা

প্রযুক্তির ক্রম-উৎকর্ষতার ফলে আমাদের জীবন হয়ে পড়েছে শারীরিক পরিশ্রমহীন। আর যারা এভাবে দীর্ঘক্ষণ শুয়ে-বসে কাটান অর্থাৎ পরিশ্রমহীন জীবনযাপন করেন, তারা বেশকিছু রোগ ও দুর্বল রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ঝুঁকিতে আছেন বলে একাধিক গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাই পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্যে প্রয়োজন পরিকল্পিত শারীরিক পরিশ্রম অর্থাৎ ব্যায়াম।

এক্ষেত্রে সর্বোত্তম হলো যোগ ব্যায়াম। গত দুই দশক ধরে পাশ্চাত্যে এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যায়াম পদ্ধতি। আর যোগ ব্যায়ামেরই সহজ ও আধুনিক সংস্করণ কোয়ান্টাম ব্যায়াম। খুব সহজ। ঘরে বসে বই দেখে নিজেই এটি চর্চা করতে পারেন। এ ব্যায়ামে শরীরের প্রতিটি অঙ্গে রক্ত চলাচল বাড়ে। সবচেয়ে বড় কথা, শরীরের প্রতিটি গ্ল্যান্ডের হরমোন-প্রবাহ সুষম ও স্বাভাবিক থাকে, যা অন্য ব্যায়ামে পুরোপুরি হয় না। দিনে ২০ থেকে ৩০ মিনিট ব্যায়ামই এজন্যে যথেষ্ট।

সাথে হোক একটু দমচর্চা। যেমন : সহজ উজ্জীবন অর্থাৎ দিনে কয়েক দফায় বুক ফুলিয়ে দম নিন, একেক দফায় ১৫ থেকে ২০ বার। এতে ফুসফুস পূর্ণমাত্রায় প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পাবে, বাড়বে এর অক্সিজেন ধারণ ক্ষমতা। সারাদিন চমৎকার উজ্জীবিত থাকবেন আপনি। সমস্ত অযাচিত ক্লান্তি দূর হবে।

নিমগ্ন হোন, ডুব দিন নিজের ভেতর

আধুনিক জীবনের অন্তহীন প্রতিযোগিতায় আমরা নিয়ত ছুটছি এক অসম্ভব অলীক সুখের পেছনে। ফলাফল ক্লান্তি অবসন্নতা দুশ্চিন্তা টেনশন এবং কখনো-বা বিষণ্নতা, অবসাদ। বিজ্ঞানীরা বলেন, দিনের পর দিন এভাবে

চলতে থাকলে এগুলোই একসময় শারীরিক-মানসিক নানা দুরারোগ্য ব্যাধিরূপে দেখা দিতে পারে। আর করোনারি হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, মাইগ্রেন, আইবিএস, স্কিন এলার্জি, আলসার, ব্যাক পেইন ইত্যাদি রোগের সাথে টেনশনের যোগাযোগ তো এখন প্রমাণিত। এছাড়াও ক্রমাগত দুশ্চিন্তা ও হতাশায় শরীরের ইমিউন সিস্টেম দুর্বল হয়ে পড়ে। কমতে থাকে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। অসুস্থতার সম্ভাবনা যায় বেড়ে।

তাই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও টেনশনের আগ্রাসন থেকে মুক্তি পেতে দিনের কিছুটা সময় নীরবে কাটান। মেডিটেশন করুন, ধ্যানমগ্ন হোন। ডুব দিন নিজের ভেতর। সুখময় ভাবনার টলটলে স্বচ্ছ জলে ভাসিয়ে দিন নিজেকে। অযাচিত সব রাগ ক্ষোভ দুঃখ বিষাদ একসময় ছেড়ে যাবে আপনাকে। ভারমুক্ত হবেন আপনি। সুস্থতা ও নিরাময়ের জন্যে এটি গুরুত্বপূর্ণ।

মেডিটেশন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত রাগ, ক্ষোভ, হতাশা জটিল দুরারোগ্য রোগ এমনকি ক্যান্সারেরও কারণ হতে পারে। আর এসব নেতিবাচক অনুভূতির দুঃসহ বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে মেডিটেশন চমৎকারভাবে কার্যকরী। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, নিয়মিত মেডিটেশন করেন যারা, তাদের ব্রেনের প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স দারুণভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। আর ব্রেনের এ অংশটি থেকেই উৎসারিত হয় আমাদের সুখ ও আনন্দের মতো ইতিবাচক আবেগ-অনুভূতিগুলো। মেডিটেশনকালে ব্রেন থেকে নিঃসৃত হয় আনন্দবর্ধক সেরোটনিন ও এন্ডোরফিন নামক রাসায়নিক উপাদান।

দুঃখস্মৃতি ঝেড়ে ফেলুন

দুঃখস্মৃতি স্মরণশক্তি নাশ করে। তাই যাবতীয় দুঃখস্মৃতি, অস্বস্তিকর ও ব্রিবতকর স্মৃতি ঝেড়ে ফেলুন। বাড়বে আপনার স্মরণশক্তি। যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা স্টেট ইউনিভার্সিটির দুজন গবেষক কিটি ক্লেইন ও এড্রিয়েল বোলস্। ৩৫ জন স্বেচ্ছাসেবীকে নিয়ে তারা একটি ভিন্নধর্মী গবেষণা পরিচালনা করেন, যেখানে তাদের জীবনের একটি অত্যন্ত বিব্রতকর অভিজ্ঞতা বিস্তারিতভাবে লিখতে বলা হয়। স্বেচ্ছাসেবীরা লিখলেন এবং দিন কয়েক পর জানালেন যে, আগের চেয়ে কিছুটা হালকা বোধ করছেন তারা। এরপর দেখা যায়, দৈনন্দিন বাজারের হিসাব বা গাড়ির চাবি খুঁজে পাওয়ার মতো বিষয়গুলো তারা খুব দ্রুত মনে করতে পারছেন। অর্থাৎ তাদের দৈনন্দিন স্মৃতি জোরদার হয়েছে।

অন্যদিকে এ ধরনের স্মৃতিকে ধামাচাপা দেওয়ার যে একটা সাধারণ চেষ্টা আমাদের মধ্যে থাকে তাতে গবেষকরা দেখেছেন, এভাবে অসচেতনভাবেই মস্তিষ্কের দৈনন্দিন স্মৃতিকে আমরা ক্রমান্বয়ে রুদ্ধ করে ফেলি। তাই বিজ্ঞানীদের পরামর্শ হলো, জীবনের যেসব তিক্ত অভিজ্ঞতার সাথে আপনার গভীর আবেগ জড়িয়ে আছে, এরকম ঘটনাগুলো সবিস্তারে লিখে ফেলুন। তারপর কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলুন কিংবা পুড়িয়ে ফেলুন। সাবধান! ভুলেও আর পড়বেন না এটি। অর্থাৎ কোনো না কোনোভাবে ঝেড়ে ফেলুন আপনার অস্বস্তিকর স্মৃতিগুলো। সুফল পেতে শুরু করবেন খুব শিগগিরই।

সঠিক জীবনদৃষ্টি দেবে ইতিবাচকতা

ইতিবাচক হোন, আনন্দে বাঁচুন। আর এজন্যে প্রয়োজন জীবন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ সঠিক জীবনদৃষ্টি। ইতিবাচকতা আপনার জীবনে সৃষ্টি করবে সুস্থতা ও নিরাময়ের এক চমৎকার অনুরণন। বিজ্ঞানীরা বলেন, ইতিবাচক মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত নিরাময় লাভের ক্ষমতা অন্যদের চেয়ে ঢের বেশি। কারণ, মনের এ অবস্থায় রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা হয়ে ওঠে সবচেয়ে সংহত আর কার্যকরী।

তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইতিবাচক হোন। আশাবাদী ও বিশ্বাসী মানুষদের সংস্পর্শে থাকুন। কৃতজ্ঞচিত্ত থাকুন সবসময়। প্রার্থনায় লীন হোন উচ্চতর অস্তিত্বে। সুস্থতার সম্ভাবনা ত্বরান্বিত হবে। পুরনো বলে হেসে উড়িয়ে দেবেন না মোটেও। এটি বরং নিরাময়ের সবচেয়ে আধুনিক ধারণা। পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা গবেষকদের দীর্ঘ গবেষণার ফলাফল এসব তথ্য।

শরীর-মনে ইতিবাচকতা সৃষ্টির জন্যে অটোসাজেশন চর্চা করুন। গত শতকের শুরুতে ফরাসি সাইকোথেরাপিস্ট এমিল কুয়ে শুধুমাত্র অটোসাজেশনের মাধ্যমেই শত শত রোগীকে সুস্থ করে তুলেছেন, উজ্জীবিত করেছেন মনোদৈহিকভাবে। সেসব রোগীরা সারাদিনে অসংখ্যবার বলতেন– Day by day in every way I am getting better and better.

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, এভাবে একটি ইতিবাচক বাক্য ক্রমাগত বলতে থাকলে মস্তিষ্ক উদ্দীপিত হয়ে ওঠে এবং শরীরকেও সেভাবেই পরিচালিত করে নিরাময় ও সুস্থতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই সার্বিক সুস্থতা ও আনন্দময় জীবনের জন্যে আপনিও দিনে শতবার হাজারবার বলুন, সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন।

সুস্বাস্থ্য ও সাফল্যের পথে একধাপ এগিয়ে থাকুন

আপনি হয়তো আপনার পুরনো সেলফোন সেটটি বদলে উচ্চপ্রযুক্তির আইফোন কেনার কথা ভাবছেন, কম্পিউটারে ব্যবহার করছেন বাজারে সদ্য আসা নতুন সফটওয়্যারটি। আপনার ওয়ারড্রোব প্রতি মৌসুমেই বোঝাই হচ্ছে নিত্যনূতন কাপড়ে কিংবা কয়েক বছর পর পর বদলে ফেলছেন গাড়ির মডেল। কিন্তু এর পাশাপাশি নিজেকেও এগিয়ে রাখছেন তো?

এজন্যে খুব যে কঠিন কোনো কসরত করতে হবে তা নয়, বরং দৈনন্দিন জীবনে কিছু সহজ সূত্র প্রয়োগ করেই আপনি পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে পারেন সুস্বাস্থ্য, প্রাচুর্য ও সাফল্যের পথে–যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনাকে নিয়ে যাবে আত্মনির্মাণের অনন্য ভুবনে। আধুনিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ এসব তথ্য ও প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে আপনিও পারেন নিজেকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলতে–

দীর্ঘায়ুর পথে নতুন ধারণা

বর্তমানে পৃথিবীতে মানুষের গড় আয়ু যা-ই হোক, জীবনযাপন পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে আমরা একে সত্যিই বাড়াতে পারি। একবিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতির ধারায় গবেষকরা এখন বলছেন, বার্ধক্যকে পিছু হটিয়ে দেড়শ বছর পর্যন্ত আমরা থাকতে পারি চিরতরুণ!

'দি ট্রুথ এবাউট এজিং' বইয়ের লেখক ড. জর্জ এস রথ-এর ভাষায়, 'বয়সজনিত অসুস্থতাগুলোকে পাশ কাটিয়ে আমরা অনায়াসেই উপভোগ করতে পারি একটি আনন্দময় দীর্ঘজীবন।' এজন্যে কিছু উপায়ও বাতলে দিয়েছেন তিনি–মেদস্থূলতা কমান, তাতে হরেক রকম রোগ-বালাইয়ের বিরুদ্ধে একটি শক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে আপনার দেহে। আর দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস থাকা চাই আপনার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। ফলে ধীর হয়ে পড়বে আপনার বার্ধক্যের গতি। আপনি ঠেকিয়ে দিতে পারবেন বার্ধক্যের আগ্রাসন।

খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণের ফলে আপনার তারুণ্যই যে কেবল দীর্ঘায়িত হবে তা নয়, উপরন্তু নানান দুরারোগ্য রোগের ঝুঁকি থেকেও আপনি মুক্ত থাকবেন। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব ইঁদুরের খাবারে ক্যালরি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে ক্যান্সার, ডায়াবেটিস ও বয়সজনিত মেদস্থূলতায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তুলনামূলক কম।

মানুষের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটিই ঘটে থাকে, বলেন লুইজিয়ানার বায়ো-মেডিকেল রিসার্চ সেন্টারের প্রফেসর ড. এরিক র‍্যাভুসন। প্রতিদিনের খাবারে অন্তত শতকরা ২৫ ভাগ ক্যালরি নিয়ন্ত্রণকে আদর্শ হিসেবে ধরা হয়, এটুকু যারা কমাতে সক্ষম হয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে জেনেটিক অসুখগুলোতে ভোগার হার অনেকখানিই কমে গেছে। এছাড়াও আপনার খাবারটা হতে হবে স্বল্প চিনি ও স্বল্প চর্বিযুক্ত এবং অবশ্যই পুষ্টিসমৃদ্ধ, আর তাতে আধিক্য থাকবে আঁশ-জাতীয় শাক-সব্জি, সালাদ ও ফলমূলের।

সামাজিক হোন। পরিবার বন্ধু আত্মীয় সহকর্মী ও প্রতিবেশী–সবার সাথেই গড়ে তুলুন একটি সহযোগিতাপূর্ণ সামাজিক সুসম্পর্ক। বিজ্ঞানীদের মতে, শুধু এর মাধ্যমেই আপনি ঠেকিয়ে দিতে পারেন টেনশনজনিত উচ্চ রক্তচাপ থেকে সৃষ্ট হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের সম্ভাবনা। টিভির সামনে বসে উদ্দেশ্যহীনভাবে চ্যানেল ঘুরিয়ে অলস সময় কাটানোর চেয়ে মেতে উঠুন কোনো নির্মল আনন্দে। বাড়ির পোষা বিড়ালটার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিন। এতে স্বাভাবিক থাকবে আপনার রক্তচাপ, শ্লথ হবে বার্ধক্যের গতি।

গতিশীল হোন। আপনি অনেকদিন বাঁচবেন। কবির ভাষায়, 'গতিতে জীবন মম, স্থিতিতে মরণ।' আনন্দময় গতিশীলতার জন্যে নিয়মিত ব্যায়াম করুন। প্রতিদিনের হালকা ব্যায়াম আপনার অকারণ আলস্য ও বিষাদ দূরে ঠেলে দেয়, জীবনকে প্রকৃত অর্থেই করে তোলে গতিময় ও আনন্দপূর্ণ। প্রতিদিন ৩০ মিনিট হাঁটুন, সপ্তাহে অন্তত চার/ পাঁচ দিন। সুস্বাস্থ্যের জন্যে এটি দারুণ উপকারী।

তৃপ্তিময় নিদ্রা হোক প্রতিরাতের সঙ্গী

একটি ভালো ঘুম আপনাকে সারাদিন রাখবে প্রাণোচ্ছল ও উৎফুল্ল, আপনার প্রতিদিনের কাজগুলো হয়ে উঠবে আরো সুন্দর। কিন্তু অতিরিক্ত ওজন, ক্যাফেইন, নিকোটিন, এলকোহল তৃপ্তিময় ঘুমের পথে অন্তরায়। ঘুমানোর আগে ভারী খাবার কিংবা ভারী ব্যায়ামও ঘুমহীনতার জন্যে সমানভাবে দায়ী। আর প্রতিদিন একই সময়ে ঘুমানো ও জেগে ওঠার অভ্যাস করুন।

ঘুমানোর আগে লিখে ফেলুন মনের যত ভয়, দুশ্চিন্তা ও পরের দিনের কাজগুলো নিয়ে যত চাপ বা আশঙ্কা। ভেতর থেকে বেরিয়ে যেতে দিন এসব। বিছানায় বসে হালকা যোগাসনের মাধ্যমে শিথিল করে নিন হাত-পা, ঘাড়, কাঁধসহ শরীরের সব পেশি। তাতে সুনিদ্রার পথ হবে সুগম। আর দিনের বেলায় ঘন ঘন হাই তোলার বিরক্তিকর অভ্যেসটির জন্যে ব্রেনের অক্সিজেন স্বল্পতাকেই দায়ী করেছেন বিজ্ঞানীরা। এ থেকে মুক্তি পেতে তারা নিয়মিত গভীরভাবে বুক ফুলিয়ে দম নেয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন।

প্রশস্ত করুন যোগাযোগের ক্ষেত্র ॥ প্রাচুর্য আসবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে

আজকের দিনে আপনার আয়ের পথকে আরো বিস্তৃত ও বহুমুখী করতে আপনি খুব সহজেই নানা পদক্ষেপ নিতে পারেন। খুব জোরেশোরে কিংবা বড় করে কিছু শুরু করার প্রয়োজন নেই। এজন্যে প্রয়োজন শুধু যোগাযোগ-দক্ষতা, যা আপনার জানাশোনার পরিধি অর্থাৎ নেটওয়ার্কটিকে আরো বিস্তৃত করে তুলবে। তাই আজই শুরু করুন, যা আছে তা-ই নিয়ে শুরু করুন।

এছাড়াও আপনার দক্ষতা, আগ্রহ ও সৃজনশীলতা অনুযায়ী আপনি নিজেকে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রাখতে পারেন। কাজ করতে পারেন কোনো একজন পেশাজীবীর সহযোগী হয়ে। হতে পারেন একজন ডাক্তার অথবা আইনজ্ঞের সহকারী কিংবা করতে পারেন ওয়েব ডিজাইনিং-এর মতো কাজ। মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সেবা কিংবা পরামর্শ দিতে পারেন। ইউরোপ আমেরিকায় দিন দিন এসব পেশা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এগুলো কোনো গৎবাঁধা চাকরি নয় বটে, কিন্তু এতে আপনার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে এবং প্রাচুর্য আসবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

মেধাকে বিকশিত করুন

প্রচলিত পেশার বাইরে যারা বিভিন্ন ধরনের কাজে দক্ষ, সেটিকেই তারা কাজে লাগাতে পারেন সফলতা ও প্রাচুর্যের সিঁড়ি হিসেবে। মালয়েশিয়ার সাধারণ এক কিশোর ডেভিড ল্যাইয়ের যখন ১০ বছর বয়স, তখন থেকেই সে টেলিভিশনে অবাক বিস্ময়ে দেখতো ডেভিড কপারফিল্ডের জাদু।

ল্যাইয়ের ভাষায়, 'এভাবে হাজারো মানুষের সামনে মঞ্চে জাদু দেখানোটা আমাকে ভীষণ মুগ্ধ ও রোমাঞ্চিত করতো।' এর প্রতি আগ্রহের কারণে মাইন্ড রিডিং ও জাদুর চর্চা শুরু করেন ল্যাই। নিরন্তর চেষ্টা আর কঠোর অনুশীলনে স্বভাবতই এতে তার দক্ষতার বিকাশ ঘটে।

মালয়েশিয়া ম্যাজিক ফেলোশিপের সদস্য ২১ বছর বয়সের ল্যাই এখন বড় বড় জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে জাদু প্রদর্শন করেন। এবং প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকেই তার আয়ের অংকটা থাকে বেশ মোটা। আর এ সাফল্যের পেছনে ছিলো তার আগ্রহ, নিষ্ঠা ও অন্যান্য জাদুশিল্পীদেরকে সঙ্ঘবদ্ধ করে একটি সংগঠন গড়ে তোলা। নিজের দক্ষতাকে সবার সামনে তুলে ধরার মাধ্যমে তিনি এগিয়ে গেছেন সফলতার পথে। নিজের জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে তরুণদের প্রতি ল্যাইয়ের পরামর্শ–'একজন ভালো শিক্ষকের সাথে থেকে কঠোর পরিশ্রম কর, সাফল্যের দেখা তুমি পাবেই।'

ব্রেনের ক্ষমতা বাড়ান

সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন যে, উচ্চ আইকিউ সম্পন্ন মানুষ তুলনামূলক সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর অধিকারী হন। তারা অন্যদের চেয়ে যেকোনো কিছু দ্রুত শিখতে পারেন এবং যেকোনো সাফল্যের জন্যে ঝুঁকিও নিতে পারেন স্বচ্ছন্দে। বিজ্ঞানীদের মতে, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন বলে এদের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও কমে যায় অনেকখানি।

সচেতন প্রচেষ্টা ও নিয়মিত কিছু মানসিক অনুশীলনের মাধ্যমে আপনিও কিন্তু বাড়াতে পারেন আপনার আইকিউ। যেমন, সারাদিনের অন্তত ১০টি কাজের তালিকা করুন মনে মনে, তারপর চোখ বন্ধ করে ভাবুন কোনটার পর কোনটা আছে তালিকায়। পাঁচ নম্বরে রেখেছেন কোনটি কিংবা অফিস থেকে বাসায় ফেরার পর কোন কাজটি করবেন বলে ভেবেছিলেন। এভাবে দ্বিতীয় তালিকায় কাজের সংখ্যা ২০ পর্যন্ত বাড়ান। কিংবা চেয়ারে আরাম করে বসুন, এবার মনে মনে পুরো ঘর জুড়ে পায়চারি করে দেখুন–কোথায় কী আছে। আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ অবলোকন করুন। মনের চোখে বোঝার চেষ্টা করুন। এরপর একটি কাল্পনিক ট্রে-তে ঘরের এসব জিনিসপত্র থেকে যেকোনো ১২টি জিনিস তুলে নিয়ে সাজান।

এছাড়াও ব্রেনের কার্যক্ষমতাকে ঝালাই করে নিতে মেতে উঠুন শব্দ ও সংখ্যার খেলায়। বিভিন্ন পত্রিকা বা ম্যাগাজিনে দেয়া সংখ্যার ধাঁধা কিংবা শব্দজটের সমাধান নিয়ে ভাবুন। প্রতিদিন একটি নতুন শব্দ শিখুন, এ দিয়ে সারাদিনে বিভিন্ন সময় কয়েকটি বাক্য তৈরি করুন। এসব অভ্যাস আপনার দ্রুত বোঝার ক্ষমতাকে বাড়াবে। আইকিউ বাড়ার সাথে সাথে আপনার সচেতনতাবোধ ও স্মৃতিশক্তি হয়ে উঠবে আরো প্রখর, আরো সুসংহত। আপনি দিন দিন হয়ে উঠবেন কর্মতৎপর ও কুশলী।

এখানেই শেষ নয়, অপেক্ষা করছে আরো বিস্ময়। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ড. মার্ক লিথ্‌গো। তিনি বলেন, যখন আমি নিউরো-ফিজিওলজিস্ট হিসেবে কাজ শুরু করি তখন বিশ্বাস করা হতো যে, মানুষের হাড়ের মতোই মস্তিষ্কও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, উপযুক্ত তথ্য ও জ্ঞানের প্রভাবে স্মৃতিশক্তির পাশাপাশি মস্তিষ্কের নিউরোনগুলো উদ্দীপ্ত হয়, সৃষ্টি হতে পারে নতুন ডেনড্রাইট। সোজা কথা, মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটানো সম্ভব। লিথ্‌গো বিশ্বাস করেন, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মস্তিষ্ক নতুন ডেনড্রাইট সৃষ্টি করতে সক্ষম, এমনকি এক সপ্তাহের মধ্যেও। মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে সফল হওয়ার জন্যে ড. মার্ক লিথ্‌গো পরিচালিত 'গেট স্মার্টার ইন এ উইক' কর্মশালায় নিয়মিত মনের ব্যায়াম অনুশীলনের পাশাপাশি তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন সুষম খাবার গ্রহণ, যোগ ব্যায়াম ও মেডিটেশনকে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ এসব তথ্য, জ্ঞান ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে মস্তিষ্ককে শাণিত করে তুলতে পারেন আপনিও। হয়ে উঠতে পারেন সুখ সুস্বাস্থ্য সাফল্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী।

তথ্যসূত্র : রিডার্স ডাইজেস্ট (জানুয়ারি ২০০৮)

‘সুখ’ তৈরি করে নিন! সুখী হোন

হেলেন কেলারের একটি কথা আছে–‘সুখ আপনিই আসে না, একে তৈরি করে নিতে হয়’। সাম্প্রতিককালে মনোবিজ্ঞানী আর গবেষকরাও বলছেন অনেকটা সেরকম কথাই। তাদের মতে, দৈনন্দিন জীবনে কিছু আপাত সাধারণ আচরণ বৈশিষ্ট্যই আমাদের সুখী হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিতে পারে। আর ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট অনুসারে, আপনি কতটা সুখী তার ওপর নির্ভর করে আপনার ভবিষ্যৎ সুস্বাস্থ্য।

সম্পর্ককে গুরুত্ব দিন

পরিবার, সহকর্মী, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী–সবার সাথে আপনার যে সম্পর্ক, তার যথাযথ মূল্যায়ন করুন। সম্পর্কগুলোকে গুরুত্ব দিন। আপনি সুখী হবেন। আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দীর্ঘ গবেষণার পর বলছেন এমন কথা। ৩০ বছর ধরে এক লক্ষ ২০ হাজার মানুষের ওপর পরিচালিত এ গবেষণাটিতে তাদের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যেমন : তাদের আয়, শিক্ষাদীক্ষা, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা, সেবামূলক কাজে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

এ গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয় অধুনালুপ্ত বিশ্বখ্যাত সাময়িকী নিউজউইক-এর একটি রিপোর্টে। রিপোর্টটিতে বলা হয়, সত্যিকার অর্থে তারাই সবচেয়ে বেশি সুখী, যাদের সম্পর্কগুলো তুলনামূলক দীর্ঘস্থায়ী ও পরিতৃপ্তিময়।

নিজেকে মেলে ধরুন

দৈনন্দিন রুটিন কাজের বৃত্তে নিজেকে গুটিয়ে রাখবেন না। মাঝেমধ্যে অন্যরকম কিছু একটা করুন। নতুন কারো সাথে পরিচিত হোন। রাস্তা দিয়ে চলছেন, অচেনা কোনো পথিকের দিকে সাহায্যের হাতটি কি বাড়িয়ে দেয়া যায়? কিংবা প্রতিদিনের ভারিক্কি গাম্ভীর্য ভুলে হঠাৎ প্রিয় গানের একটি লাইন গেয়ে ওঠার মতো কিছু একটা!

নর্থ ক্যারোলিনার ওয়েক ফরেস্ট ইউনিভার্সিটির গবেষকদের পরামর্শটা সেরকমই। তাদের মতে, যারা প্রায়শই চেনা গণ্ডির বাইরে হাঁটতে পারেন, কিছুটা মেলে ধরতে পারেন নিজেদের, তাদের মনের ভাবগতিক ভালো থাকে, তারা আনন্দে সময় পার করেন। আর যারা সবসময় গুটিয়ে রাখেন নিজেদের, তাদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই ঘটে এর উল্টোটা।

পরার্থে ব্যয় করুন

আমেরিকার বিখ্যাত ব্যবসাভিত্তিক সাময়িকী ফোর্বস-এর উদ্যোগে একবার একটি সমীক্ষা চালানো হয়। এতে একদল স্বেচ্ছাসেবককে বিভিন্ন অংকের কিছু ডলার দেয়া হয়। তাদেরকে দুটি দলে ভাগ করা হয়। একদলকে বলা হয়, তারা নিজেদের প্রয়োজনমতো সেটি খরচ করতে পারে আর অন্যদলকে বলা হয় যে, তারা যেন অর্থটা ব্যয় করে অন্যের জন্যে, অন্যের কল্যাণে।

দিন শেষে দেখা গেল, যারা অন্যের কল্যাণে ব্যয় করেছিলেন তারা তুলনামূলক সুখী ও আনন্দিত ছিলেন, সেই ব্যয়ের পরিমাণ যত অল্পই হোক। পরার্থে ব্যয় ওদের দারুণভাবে উজ্জীবিত করে তুলেছিলো।

ইতিবাচকতার চর্চা জরুরি

জীবনে চলার পথে প্রতিদিন কতরকম কিছুই তো ঘটে। এর মধ্যে নিশ্চয়ই থাকে ভালো আর মজার কিছুও। সেগুলো লিখুন। বিস্তারিত লিখুন প্রতিদিন। এভাবে দৈনন্দিন সুখকর ঘটনাগুলো লিখতে লিখতেই আপনি একসময় হয়ে উঠবেন ইতিবাচক আর উদ্যমী। পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পজিটিভ সাইকোলজি সেন্টার পরিচালিত একটি গবেষণায় এর প্রমাণ মিলেছে। তাতে বলা হয়েছে, হতোদ্যম মানুষদের মধ্যে যারা প্রতিদিনকার ভালো বিষয়গুলো নিয়মিত লিখে গেছেন, ছয় মাসের মধ্যেই তাদের জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেছে। তারা হয়ে উঠেছেন ইতিবাচক আর তুলনামূলক সুখী।

পানি পানে সুখ!

সারাদিনে পর্যাপ্ত পানি পান করুন। আপনি প্রফুল্ল থাকবেন। ২০১২ সালে কানেকটিকাট বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, পানিশূন্যতা এমনকি শরীরে পানির ন্যূনতম অভাবও মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে। অবসাদ আর বিষাদগ্রস্ততা ভর করতে পারে আপনার ওপর। আর এটি তুলনামূলক বেশি ঘটে মহিলাদের ক্ষেত্রে।

তথ্যসূত্র : রিডার্স ডাইজেস্ট (জানুয়ারি ২০১৩)

হাসুন, প্রাণখুলে হাসুন আনন্দে বাঁচুন

রোগী গেলেন ডাক্তারের কাছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন– হার্টের সমস্যা, কিছু ওষুধ লিখে দিচ্ছি, নিয়মমতো খাবেন। আর আপাতত কিছুদিন ভারী পরিশ্রম হয় এমন কাজগুলো করবেন না, অন্তত একমাস সিঁড়ি ভাঙা পুরোপুরি নিষেধ।

মাসখানেক পর রোগী পুনরায় গেলেন ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার সব দেখেশুনে বললেন, আপনার হার্টের অবস্থা আগের চেয়ে ভালোই মনে হচ্ছে, এখন আর সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করতে কোনো অসুবিধা নেই। এই শুনে রোগী হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন–'উফ্, বাঁচালেন ডাক্তার সাহেব, পানির পাইপ বেয়ে বাসায় ওঠা যে কী কষ্টের, এই কদিনে তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি!'

জানি বলবেন, পুরনো কৌতুক। তা বটে। কিন্তু দরকার কী হাসি থামানোর? আপনি না হয় নতুন করেই হাসলেন। তাতে ক্ষতি নেই, বরং লাভ আছে ঢের। তাই হাসুন, প্রাণখুলে হাসুন। আনন্দে বাঁচুন।

হাসিতে সুস্বাস্থ্য, সুখনিদ্রা ও অটুট স্মৃতিশক্তি

সুস্বাস্থ্যের সর্বোত্তম দাওয়াই হতে পারে হাসি। খোদ চিকিৎসকরাই বলছেন এমন কথা। স্বাস্থ্যের ওপর হাসির প্রভাব নিয়ে প্রথম গবেষণা করেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ডা. উইলিয়াম ফ্রাই। তার মতে, হাসি এক ধরনের ব্যায়ামের কাজ করে।

প্রাণবন্ত হাসির দমকে দমকে কেঁপে ওঠে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পেট ও মুখের পেশিগুলো। ফলে চমৎকার ব্যায়াম হয় এদের এবং পর্যাপ্ত রক্তসঞ্চালন ঘটে। পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছে যায় হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও বিভিন্ন পেশিতে। শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পাশাপাশি পাকস্থলীতেও রক্তসঞ্চালন বাড়ে। ফলে হজম প্রক্রিয়া ভালো হয়। স্বাস্থ্য-গবেষকরা তাই হাসিকে অভিহিত করেছেন 'ইন্টারনাল জগিং' হিসেবে।

ক্যালিফোর্নিয়ার লোমা লিন্ডা ইউনিভার্সিটির মেডিসিনের প্রফেসর ডা. লি ব্রেক বলেন, হাসি কখনো কখনো সত্যিকার ওষুধের মতোই কাজ করে। হাসিতে শিরা ও ধমনী-পথে রক্ত চলাচল সুষম হয়, ফলে দেহকোষে অক্সিজেনের সরবরাহ বাড়ে। তা-ই শুধু নয়, রক্তনালীর, বিশেষত ধমনীর অযাচিত সংকোচন রোধেও হাসির রয়েছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। ২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর প্রিভেন্টিভ কার্ডিওলজি পরিচালিত গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, হাস্যপ্রবণ মানুষদের হৃৎস্বাস্থ্য তুলনামূলক ভালো থাকে।

হাসি আপনার শারীরিক মানসিক আবেগীয় স্বাস্থ্য ভালো রাখে। মনের বোঝা কমায়। আপনি কিছুটা হলেও ভারমুক্ত হন। তাতে সাইকো-সোমাটিক ডিজিজ বা মনোদৈহিক রোগে ভোগার আশঙ্কা স্বাভাবিকভাবেই কমে। এছাড়াও টেনশনজনিত মাথাব্যথা ও মাইগ্রেন নিরাময়ে হাসির ভূমিকা ইতোমধ্যে একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত।

হাসিতে পেশির সংকোচন কমে, পেশি শিথিল হয়। সে কারণেই বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন–এটি ভালো ঘুমে সহায়ক। বলা হচ্ছে, হাসি ইনসমনিয়া থেকে মুক্তি দিতে পারে।

হাসিখুশি থাকুন। অটুট থাকবে আপনার স্মৃতিশক্তি। যুক্তরাষ্ট্রের জন্স হপকিন্স মেডিকেল স্কুলের একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, হাসি স্মৃতিশক্তি ও শেখার ক্ষমতা বাড়ায়। সৃজনশীলতা হয়ে ওঠে শাণিত। সবসময় হাসিখুশি থাকেন এমন মানুষদের ওপর গবেষণা চালিয়েই মিলেছে এসব তথ্যপ্রমাণ।

হাসিতে ব্যথা উপশম!

হাসি আপনার ব্যথা ও শারীরিক যন্ত্রণার অনুভূতি কমায়। আনন্দময় প্রাণখোলা হাসিতে মস্তিষ্কের পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে নিঃসৃত হয় এন্ডোরফিন, যা ব্যথার অনুভূতি কমিয়ে দেয়। একবার প্রাণখোলা হাসি শরীরের মাংসপেশিকে শিথিল রাখতে পারে ৪৫ মিনিট পর্যন্ত। নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন-এ প্রকাশিত একটি গবেষণা-প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১০ মিনিটের উচ্ছল হাসি পরবর্তী দু-ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যথামুক্তির কাজ করতে পারে।

হাসি যে কেবল ছোটখাটো ব্যথার অনুভূতি কমায় তা নয়, স্প্যানিশ মেডিকেল জার্নাল র‍্যাবিস্তা দ্য এনফারমারিয়া-র একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, পেশি ও হাড়ের দীর্ঘদিনের ব্যথা উপশমে হাসি হতে পারে এক দারুণ কার্যকরী ওষুধ।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়

হাসুন। বাড়বে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। সদা হাস্যময় ও উৎফুল্লচিত্ত থাকেন যারা, তাদের রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকে অধিকতর সংহত। দেখা গেছে, এ ধরনের মানুষের ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম উপাদান গামা ইন্টারফেরন ও টি সেল-এর কার্যকারিতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে। আর তাতে কমে রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি। হাসিকে তাই ন্যাচারাল এন্টিবায়োটিক বা প্রাকৃতিক জীবাণুরোধী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

হাসির রয়েছে ক্যান্সার প্রতিরোধী ক্ষমতা। স্বাভাবিক শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়ায় আমাদের শরীরে প্রতিনিয়তই তৈরি হচ্ছে ক্যান্সার সেল। কিন্তু তা টিউমারে রূপ নেয়ার আগেই আমাদের রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ন্যাচারাল কিলার সেল ক্যান্সার সেলগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। আমেরিকার ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, নিয়মিত হাসিতে ন্যাচারাল কিলার সেল-এর কার্যকারিতা বাড়ে। রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, ক্যান্সার একবার হয়ে গেলে তা নিরাময়ে হাসির কোনো ভূমিকা আছে কি না, সেটি এখন পর্যন্ত প্রমাণিত হয় নি বটে, কিন্তু ক্যান্সারের সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকার উদ্যম যোগাতে পারে হাসি।

হাসুন, সুখী হবেন

হাসি আপনাকে সুখী করে। বাড়ায় আপনার ইতিবাচকতা বোধ। আপনাকে স্ট্রেস থেকে দূরে রাখে। জীবনের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। স্থায়ী করে আপনার আনন্দের অনুভূতি। আমাদের চারপাশের বন্ধু প্রিয়জন আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে যাদের আমরা পছন্দ করি, যারা তুলনামূলক জনপ্রিয়, যাদের সঙ্গ আমাদের ভালো লাগে তাদের সবার একটি জায়গায় খুব মিল– তারা হাসেন, জীবনের কোনো না কোনো কিছু নিয়ে তারা সবসময়ই থাকেন হাসিখুশি আর আনন্দ-উৎফুল্ল।

জীবন কখনোই একমাত্রিক নয়। জীবনে চলার পথে নানা উত্থানপতন আর বিচিত্র সব কারণে স্ট্রেস আসতেই পারে। কিন্তু সদানন্দ মানুষেরা খুব সহজেই এসব স্ট্রেস সামলে নিতে পারেন। আধুনিক ধারার স্বাস্থ্য-গবেষকরা তাই বলছেন, যাবতীয় স্ট্রেস, দুশ্চিন্তা, মানসিক চাপের সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক হতে পারে হাসি। কারণ, আমরা যখন নির্মল আনন্দে হেসে উঠি– হোক তা যত তুচ্ছ কারণেই–তখন কর্টিসোল আর এড্রিনালিনের মতো স্ট্রেস হরমোনগুলোর প্রভাব কমে যায়। ফলে চাপ নিয়ন্ত্রণে আসে সহজেই।

ব্যক্তিগত জীবনেই শুধু নয়, সামাজিক জীবনেও পারস্পরিক সম্পর্ককে সহজ স্বাভাবিক করে তুলতে পারে একটা ছোট্ট হাসি। আর সঙ্ঘবদ্ধ কাজেও হাসি প্রাণ সঞ্চার করে, পুনরুদ্যম যোগায়।

আপনি হাসুন, হাসবে আপনার চারপাশ

দুঃখী নিপীড়িত মানুষের মাঝে জীবনভর হাসিমুখে সুখের ছোঁয়া বিলিয়ে গেছেন মহিয়সী মাদার তেরেসা। তার নিজের জীবনোপলব্ধি–'হাসি দিয়েই আমাদের সব সুখ আর আনন্দের শুরু'।

তাই হাসুন। সুখী হওয়ার জন্যে, মনের চাপ কমিয়ে আনন্দময় জীবনের জন্যে নির্মল আনন্দে হেসে উঠুন। মনের কোণে জমে থাকা রাগ ক্ষোভ দুঃখ হতাশা সহজেই প্রশমিত হবে। ক্যালিফোর্নিয়ার পিপার্ডিন ইউনিভার্সিটির সাইকোলজিস্ট প্রফেসর ড. স্টিভেন সুলতানফের পরামর্শ–জীবনে হাসির পরিমাণ বাড়িয়ে দিন, আপনার জীবন সত্যিই বদলে যাবে।

ভোরে, দিনের শুরুতেই, কোনো একটি সুখস্মৃতি মনে করে হেসে উঠুন। হাসি শুকরিয়ার প্রকাশ। কথায় বলে, মর্নিং শোজ দ্য ডে। তাই আপনি হাসুন, আপনার সাথে সাথে হেসে উঠবে অন্যরাও। হাসবে আপনার চারপাশ।

তথ্যসূত্র : নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন

আপনিও দীর্ঘায়ু হবেন

মা-বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জিনগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই শুধু নয়, অনন্য কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করেও আপনি আপনার দীর্ঘায়ুর সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারেন। মনোবিজ্ঞানীদের নিরন্তর গবেষণায় সে বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দেবে দীর্ঘজীবন

মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি আর বিবেকপ্রাণ হৃদয় আপনাকে দেবে দীর্ঘজীবন। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, এটি আপনার দীর্ঘায়ুর সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিতে পারে অনেকখানি। যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞানী ডা. লুইস টারম্যান। ১৯২১ সালে তিনি একটি দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা কার্যক্রমের সূচনা করেন, যেখানে ১৯১০ সালে জন্ম নেয়া প্রায় দেড় হাজার শিশুর ব্যক্তিগত জীবনাচার ও তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়।

পরবর্তীকালে এ গবেষণার কাজ এগিয়ে নেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজিস্ট প্রফেসর হাওয়ার্ড ফ্রেডম্যান ও বিংশ শতাব্দীর আরেক খ্যাতিমান এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট লেসলি মার্টিন।

গবেষণার ফলাফলে তারা দেখান, সেসব শিশুদের মধ্যে যারা পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পর বা জীবনের বিভিন্ন সময়ে অধিকতর বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, অধ্যবসায়, নিয়ন্ত্রিত জীবনাচারের পরিচয় দিয়েছেন এবং সবমিলিয়ে একটি মানবিক আর দায়িত্বশীল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন তারা দীর্ঘায়ু হয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, সবদিক থেকেই তাদের জীবন ছিলো সুখী আর তৃপ্তিময়।

এমনটা হওয়ার উপায় কী? এ প্রশ্নের উত্তরে লেসলি মার্টিনের পরামর্শ– এ ধরনের একজন মানুষে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে ছোট ছোট পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। আজ থেকেই চেষ্টা শুরু করতে পারেন। আর আপনার চারপাশে এরকম মানুষজন যারা আছেন, তাদের সংস্পর্শে থাকুন বেশি বেশি।

বৃত্ত ভেঙে বাইরে আসুন

রবীন্দ্রনাথের গান আছে– *'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া, বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া... ।'* তাই নিজস্ব গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে আসুন। জীবনে নির্মল আনন্দের যোগান দিতে পারে এমন বিভিন্ন বিষয়ে হয়ে উঠুন কৌতূহলী। নতুন নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হোন, চারপাশের মানুষের সাথে আপনার যোগাযোগ বাড়ান, আপনার পরিচিতির বলয়টা আরো বিস্তৃত হয়ে উঠুক। লাভ আপনারই। আপনি দীর্ঘায়ু হবেন।

গবেষকরা বলছেন, চারপাশের মানুষের সাথে মমতাপূর্ণ আন্তরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ আপনার দীর্ঘায়ুর সম্ভাবনা বাড়ায়। দীর্ঘদিন বাঁচার ইচ্ছা-আকুতিকে করে সুতীব্র। জীবনের সাথে যোগ করতে পারে অতিরিক্ত কিছু দিন। কারণ, ভালবাসা আর মমতার মতো মানবিক অনুভূতিগুলো মানুষকে ইতিবাচকতার দিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। জীবন হয়ে ওঠে অর্থপূর্ণ।

অন্যদিকে, সামাজিক বিচ্ছেদ বা একাকীত্ব মানুষকে নেতিবাচক ও বিষণ্ন করে তোলে। হৃদরোগের আশঙ্কা বাড়ায়। মনোবিদ লেসলি মার্টিন বলেন, যারা সহজেই অন্যের সাথে মিশতে পারেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন তারা তুলনামূলক দীর্ঘজীবী হন।

আশাবাদী হোন, সুস্থ থাকবেন

পৃথিবীজুড়ে বহু শতবর্ষী মানুষের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মিল খুঁজে পেয়েছেন মনোবিজ্ঞানীরা–সেটি হলো, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তারা বেশ আশাবাদী ছিলেন। আর আশাবাদী মানুষেরা জীবনের প্রতি উৎসাহী হন। তাই দেখা যায়, রীতিমতো স্ব-উদ্যোগেই তারা স্বাস্থ্যকর জীবন-অভ্যাসগুলো মেনে চলতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন, সেইসাথে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখেন ধূমপানসহ নানারকম স্বাস্থ্যঘাতী আচরণ-অভ্যাস থেকে ।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হচ্ছে, এরা স্ট্রেস-এ ভোগেন কম, তাই স্বভাবতই অন্যদের সাথে তাদের পার্থক্যটাও হয় উল্লেখযোগ্য এবং স্ট্রেসজনিত স্বাস্থ্য-জটিলতা থেকে তারা প্রায়শই মুক্ত থাকেন।

মনোবিদরা বলছেন, একজন মানুষ জীবনের শুরু থেকেই এরকম না হলে যে কখনোই তিনি এসব অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারবেন না, তা নয়। বরং এমনও দেখা গেছে, সত্তরোর্ধ্বদের মধ্যেও অনেকেই সচেতন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নিজেকে আশাবাদী করে তুলেছেন, হয়ে উঠেছেন একজন আপাদমস্তক ইতিবাচক মানুষ।

নিঃস্বার্থ সেবা দিন, অন্যের জন্যে কিছু করুন

দীর্ঘায়ু হওয়ার উপায় নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে যারা গবেষণা করেছেন, তাদেরই একজন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশাল সাইকোলজিস্ট সারা কনরাথ। তার মতে, কেবল নিজের জন্যে নয় বরং অন্যের জন্যে, বিশেষত নিঃস্বার্থভাবে যারা অন্যকে সহযোগিতার কথা ভাবেন, এমনকি অচেনা-অপরিচিত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে যান, কাজে নেমে পড়েন তাদের দীর্ঘজীবী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

গবেষণার এমনতর ফলাফলে কনরাথ নিজেই বিস্মিত। কারণ, দেখা গেছে, এই শ্রেণীর মানুষেরা অন্যদের চেয়ে তুলনামূলক চার বছর অবধি বেশি বাঁচতে পারেন। তিনি বলেন, এর কারণ বুঝি এটাই যে, অন্যের জন্যে নিঃস্বার্থ সেবায় মনে যে আনন্দ-অনুভূতির সঞ্চার হয়, তার ফলে শরীরে অক্সিটোসিন হরমোনের প্রবাহ বাড়ে। আর এ হরমোনটি শরীরের স্ট্রেস-হরমোনগুলোর কার্যকারিতা কমিয়ে দেয় এবং শরীরকে রাখে টেনশন ও অস্থিরতার প্রভাবমুক্ত।

চাই সুখী দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন

দীর্ঘায়ুর পথে বিয়ে, বিশেষত সুখী দাম্পত্য জীবনও হতে পারে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক। মনোবিজ্ঞানী মার্টিন বলেন, সুস্থ সুখী দাম্পত্য জীবনযাপন করেন যারা, তাদের জীবন অনেকাংশেই শান্তিপূর্ণ হয়। দীর্ঘায়ু অর্জনে এটি সহায়ক বটে।

তাই দাম্পত্য সম্পর্ক এবং সুখী পারিবারিক জীবনের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন প্রফেসর হাওয়ার্ড ফ্রেডম্যান। মমতাময়

পারিবারিক পরিবেশে প্রত্যেকের মানসিক যোগাযোগ, ভাব-বিনিময় আর পারস্পরিক সহযোগিতার একটি চমৎকার আবহ থাকে, টেনশনমুক্ত স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্যে যা দারুণ কার্যকর।

শ্রমসহিষ্ণুতা ও সফল কর্মজীবন

কাজে আনন্দ পান যারা, তাদের জন্যে সুসংবাদ–তাদের রয়েছে তুলনামূলক বেশিদিন বাঁচার সম্ভাবনা। বিজ্ঞানীদের মতে, আলস্যপূর্ণ দিনযাপনের মধ্যে নয়, বরং যারা নিজেদের কাজ, কর্মক্ষেত্র আর বিভিন্ন ধরনের শ্রমনির্ভর কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে জীবনের অর্থ খুঁজে পান এবং কোনোরকম অবসর যাপনের কথা ভাবেন না, তারা সত্যিই দীর্ঘায়ু হতে পারেন।

নিজের ক্যারিয়ার আর সামগ্রিক কর্মজীবন নিয়ে আত্মতৃপ্তিতে ভুগছেন যারা, তারাও হাসতে পারেন আনন্দের হাসি। কোমর বেঁধে এবার লেগে যেতে পারেন দীর্ঘ জীবনযাপনের প্রস্তুতি নেয়ার কাজে। কর্মক্ষেত্রে নানারকম সাফল্য আর অর্জনের ফলে মনে যে তৃপ্তি আসে, তা জীবনে বাড়তি আয়ু যোগ করতে পারে বলে গবেষকরা জানান।

জীবনযাপনে সচেতন হোন

জাপানের বার্ধক্য বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান টোকিও মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট অব জেরোন্টোলজি। এর অন্যতম গবেষক ইউকি মুসাই। টোকিওর ৭০ জন অধিবাসীকে (যাদের সবার বয়স ১০০ থেকে ১০৬ বছরের মধ্যে) নিয়ে তিনি একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

তাতে দেখা যায়, যারা প্রায়শই তাদের বয়স-বৃদ্ধি নিয়ে ভীত ও চিন্তিত ছিলেন এবং কোনো না কোনোকিছু নিয়ে খুঁতখুঁতে বা ক্ষ্যাপাটে আচরণ করেছেন তারা বিষণ্নতাসহ নানাবিধ মানসিক জটিলতায় আক্রান্ত হয়েছেন বা স্নায়ুবৈকল্যে ভুগেছেন, যা তাদের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে।

গবেষকরা তাই বলছেন, বয়স নিয়ে অযথা ভীত হবেন না, একে জীবনের আর দশটা বিষয়ের মতো সহজ ও ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করুন। এটি যারা পারেন–দেখা গেছে, তাদের জীবনযাপন বেশ নিয়মতান্ত্রিক আর পরিমিত।

তাই ভয় নয়, বরং সচেতন হোন। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা, ধীরেসুস্থে সব কাজকর্ম করা ইত্যাদি জীবনাচার অনুসরণে উৎসাহী হোন। আর দীর্ঘায়ুর জন্যে এটিই দরকার বলে মনে করছেন আধুনিক ধারার চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞানীরা।

তথ্যসূত্র : এমএসএন হেলদি লিভিং ডট কম

সুস্বাস্থ্য ॥ প্রাচুর্যের অন্যতম ভিত্তি

ভবিষ্যতের কথা ভেবে সঞ্চয়ের প্রবণতা মানুষের বহু প্রাচীন অভ্যেস। গ্রামে ঘরের বাঁশের খুঁটিতে ফুটো করে, টিনের কৌটায়, মাটির ব্যাংকে কিংবা কমার্শিয়াল ব্যাংকে টাকা জমানোর অভ্যেস কমবেশি সবারই আছে। কিন্তু চাইলেও সবাই পারে না কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করতে। পারে কেবল বুদ্ধিমান ও হিসেবিরাই।

আধুনিককালে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তিরাই হলেন সেই হিসেবি বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী। তারা জানেন, সুষম প্রাকৃতিক খাবার, ব্যায়াম আর নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের মাধ্যমে তারা অর্জন করেছেন যে সুস্বাস্থ্য, তা-ই হতে পারে তাদের অর্থ সঞ্চয়ের মূল হাতিয়ার। কীভাবে?

'সুস্বাস্থ্য প্রাচুর্যের অন্যতম ভিত্তি'–বলেছেন ব্রুস পিয়েনসন, তিনি আমেরিকার স্বাস্থ্যসেবা-দানকারী একটি প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তার ভাষায়, ক্রনিক রোগীদের ক্ষেত্রে ওষুধ, ডাক্তার ও হাসপাতালের পেছনে খরচের পরিমাণটা কিন্তু আদতে কম নয়। একটি জনস্বাস্থ্য বীমা প্রতিষ্ঠানের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, অসুস্থ মানুষদের চিকিৎসাখাতে বাৎসরিক মোট ব্যয়ের পরিমাণ সুস্থদের তুলনায় চারগুণ বেশি, অথচ যা হতে পারতো তাদের অবসর জীবনের একটি বড় সঞ্চয়।

হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সারসহ অনেক জটিল রোগের একটি বড় কারণ মেদস্থূলতা। গবেষণায় দেখা গেছে, ওষুধ কেনার ক্ষেত্রে মেদস্থূলদের খরচের পরিমাণ অন্যান্যদের তুলনায় তিনগুণ বেশি। আমেরিকান সরকার কর্তৃক পরিচালিত সাম্প্রতিক এক জরিপ অনুসারে, সে দেশে প্রতিজন ডায়াবেটিক রোগীর বাৎসরিক অতিরিক্ত খরচের পরিমাণ ৫৫০ ডলারের বেশি, কারো কারো ক্ষেত্রে এটি ১২০০ ডলার পর্যন্ত। উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগীদের ক্ষেত্রে এ খরচ ৬০০ ডলারেরও বেশি। এ রিপোর্টের শেষে উল্লেখ করা হয়েছিলো, ওজন কমিয়ে এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে এসব রোগ এড়ানোর মাধ্যমে গড়ে তুলুন ভবিষ্যতের বড় সঞ্চয়।

শুধু তা-ই নয়, ধূমপান বর্জনের মাধ্যমে সিগারেট খরচ বাঁচিয়েও প্রতিবছর সঞ্চয়ের পরিমাণ বহুগুণ বাড়াতে পারেন আপনি। এভাবে ধূমপান থেকে সৃষ্ট শ্বাসতন্ত্রের রোগ এজমা ও জীবনঘাতী ক্যান্সারসহ ফুসফুসের বিভিন্ন দুরারোগ্য রোগের সম্ভাবনা আপনি ঠেকিয়ে রাখতে পারেন, ভবিষ্যতের সঞ্চয়কে করতে পারেন অধিকতর মজবুত।

এ সংক্রান্ত যাবতীয় গবেষণার উপসংহারে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হলো, বর্জন করুন ভাজাপোড়া ও তেল-চর্বিযুক্ত খাবার, ধূমপান, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, টেনশন। এর পরিবর্তে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও বিজ্ঞানসম্মত সুস্থ জীবন-অভ্যাস গড়ে তুলুন। আর এর সাথে জীবনে সঙ্গী হোক মেডিটেশনের প্রশান্তি, যা আপনাকে দেবে সার্বিক সুস্থতা ও কর্মময় দীর্ঘজীবন। সেইসাথে নিশ্চিত করবে আপনার ভবিষ্যত সঞ্চয়।

তথ্যসূত্র : টাইম ম্যাগাজিন (২২ সেপ্টেম্বর ২০০৮)

সকাল শোয় সকাল ওঠে তার কড়ি বৈদ্য না লুটে

'সকাল শোয় সকাল ওঠে/ তার কড়ি বৈদ্য না লুটে।' হাজার বছরেরও বেশি সময় আগে বিদূষী জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিক খনা এ কথাটি বলে গেছেন। যদিও রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যাওয়া আর ভোরে জেগে ওঠার ব্যাপারে উদ্দীপনা জোগাতে আমরা প্রায়ই আওড়াই বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের উক্তিটি– আর্লি টু বেড এন্ড আর্লি টু রাইজ, মেক্স এ ম্যান হেলদি ওয়েলদি এন্ড ওয়াইজ। অথচ খনা সুস্বাস্থ্যের এ গুরুত্বপূর্ণ ধারণাটি দিয়েছিলেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের জন্মের কয়েকশ বছর আগেই।

বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির নিত্যনূতন আবিষ্কার আমাদের জীবনকে বিভিন্নভাবে অনেক সহজ করে তুলেছে। সেইসাথে একটু একটু করে বদলে দিয়েছে আমাদের জীবনযাপনের ধারাকেও। ফলে সময়ের সাথে সাথে অনেক অযাচিত জীবনাচারেও অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি আমরা।

পূব-আকাশে ভোরের আলো ফুটতেই জেগে ওঠা–এটি ছিলো আমাদের পূর্বপুরুষদের চিরায়ত জীবন-অভ্যাসের একটি সাধারণ অনুষঙ্গ। কিন্তু আমাদের অনেকের জীবনেই এটি আজ আর তেমন গুরুত্ব বহন করে না। কিন্তু এ অভ্যাসটি যে আমাদের জন্যে উপকারী!

রাত জেগে বাড়িয়ে চলেছেন স্বাস্থ্যঝুঁকি

জরুরি কাজ শেষ করতে দেরি হওয়া কিংবা রাত জাগা–কদাচিৎ এমনটা হতেই পারে। কিন্তু দিনের পর দিন যারা রাত জাগেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা ঘটে থাকে অকারণে।

টিভিতে একের পর এক বিভিন্ন চ্যানেল ঘুরিয়ে, ফেসবুক-ইন্টারনেটে 'সামাজিক যোগাযোগ' রক্ষা করে আর মোবাইল ফোনে সারারাত ধরে প্রায় বিনামূল্যে কথা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ (!) কাজে লাগিয়ে রাত পার করে দিচ্ছেন যারা, তারা নিজেদের স্বাস্থ্যঝুঁকিই কেবল বাড়িয়ে চলেছেন। আপনি

রাত জেগে বিনোদনে মগ্ন আর এদিকে বাড়ছে আপনার হার্ট অ্যাটাক, ডায়াবেটিস, মেদস্থূলতা এমনকি ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি।

আমেরিকান কলেজ অব কার্ডিওলজির ৫৮ তম বার্ষিক সম্মেলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। এতে বলা হয়েছে, রাত জাগেন বা প্রায়ই মধ্যরাত পার করে ঘুমোতে যান যারা, তাদের হৃৎপিণ্ডের রক্তনালীর প্রসারণ-ক্ষমতা কমে যায় এবং তারা অকালে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিতে থাকেন। 'Night owls may face higher heart risk' শিরোনামে ২০০৯ সালের মার্চ-এ রিপোর্টটি এবিসি নিউজে প্রকাশিত হয়।

এছাড়াও প্রায়ই রাত জেগে টিভি দেখা কিংবা রাত ভোর করে নতুন নতুন সিনেমা দেখার অভ্যাস যাদের, দেখা যায় ক্ষিধে মেটাতে সে সময়টাতে তারা বিভিন্ন রকম মুখরোচক স্ন্যাক্স খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। আর এতে দেহে বাড়তি ওজন এবং রক্তে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল বাড়ার ঝুঁকি থাকে।

রাত জাগার সাথে ক্যান্সার-ঝুঁকির প্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ডেনিশ ক্যান্সার সোসাইটির ইনস্টিটিউট অব ক্যান্সার এপিডেমিওলজির গবেষক জনি হ্যানসেন ১৮,৫০০ জন মহিলার ওপর একটি গবেষণা চালান, যাদের সবাই ১৯৯৪ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ডেনিশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। গবেষণার ফলাফলে হ্যানসেন বলেন, এদেরকে প্রায়ই নাইট শিফ্টে কাজ করতে হতো। পরবর্তীতে দেখা গেছে, অন্যান্যদের তুলনায় এদের স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়েছে চারগুণ।

রাত জাগার ফলে বিভিন্ন রকম স্বাস্থ্যঝুঁকির অন্যতম কারণ হলো, এতে শরীরের স্বাভাবিক জৈবছন্দটি ব্যাহত হয় এবং মেলাটোনিন ও কর্টিসোলসহ কিছু হরমোন প্রবাহে ছন্দপতন ঘটে।

দেরিতে দিন শুরু হলে...

দেরিতে দিন শুরু হয় আপনার? প্রায়ই ভাবেন ভোরে উঠবেন, কিন্তু এলার্ম বন্ধ করে আবার অলস গড়াগড়ির অভ্যেস? তারপর স্কুল-কলেজ কিংবা অফিস যাওয়ার টায় টায় একটুক্ষণ আগে উঠে নাকে-মুখে কিছু গুঁজে দিয়ে পড়িমরি করে 'দে ছুট', তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে ক্লাস বা অফিসে ঢোকেন? এ কি আপনার নিত্যদিনের ঘটনা?

বিজ্ঞানীরা বলছেন, আপনার দিনটা কিন্তু শুরুই হলো 'ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স'-এর মধ্য দিয়ে। ঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌঁছানোর এই হুড়োহুড়ি আপনার সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের উদ্দীপনা বাড়িয়ে তোলে। ফলে

দিনের শুরুতেই আপনার মধ্যে সৃষ্টি হয় স্ট্রেস। আর নিশ্চিতভাবেই এর প্রভাব পড়ে আপনার কাজেকর্মে। দেরিতে দিন শুরু হয় যাদের, এ স্ট্রেসের কারণেই হয়তো তারা আবেগের চাপ আর ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তুলনামূলক কম। জুন ২০১৩-এর অনলাইন চিকিৎসা-সাময়িকী 'হেলথ টুডে'-তে একটি গবেষণা-প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়–Life extremes : Early birds vs night owls.

এ গবেষণায় ১৭ থেকে ৩৮ বছর বয়সী ও ৫৯ থেকে ৭৯ বছর বয়সী দু-দল মানুষকে পরীক্ষা করা হয়, যাদের মধ্যে ভোরে জেগে ওঠেন এবং দেরিতে জাগেন এমন দু-ধরনের স্বেচ্ছাসেবীই ছিলেন। রিপোর্টে বলা হয়, এ দুয়ের মধ্যে ভোরে ঘুম থেকে ওঠেন যারা, যেকোনো আবেগীয় প্রতিক্রিয়ায় তারা অধিকতর ভারসাম্যপূর্ণ এবং তুলনামূলক সুখীও বটে।

দিন শুরু হোক ভোরের আলোয়

ইউনিভার্সিটি অব অ্যারিজোনার সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিনের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক প্রফেসর ডা. এন্ড্রু ওয়েল্স। ২০১২ সালে তিনি ১,০৬৮ জন নারী-পুরুষের ওপর একটি গবেষণা-কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ব্রিটিশ সাইকোলজিক্যাল সোসাইটির একটি সেমিনারে তিনি এ গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন।

সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে, রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যান আর ভোরে জেগে ওঠেন যারা, তারা অন্যদের চেয়ে তুলনামূলক সুখী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। তাদের ওজনও থাকে নিয়ন্ত্রণে।

শুধু তা-ই নয়, ২০০৮ সালে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যারা ভোরে ওঠেন তাদের কর্মদক্ষতা অন্যদের চেয়ে বেশি। আর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এ অভ্যেসটি যাদের আছে, পরীক্ষার ফলাফলেও তারা তুলনামূলক ভালো গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এবং এদের মনও সবসময় আনন্দ আর আশাবাদে পূর্ণ। অন্যদিকে রাত জেগে দেরিতে দিন শুরু করা লোকেরা প্রায়ই হতাশা বিষণ্নতা নৈরাশ্যবাদ এবং কখনো কখনো স্নায়বিক দুর্বলতায় আক্রান্ত হন।

ওহাইও-র হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োলজিস্ট ক্রিস্তফ র‍্যান্ডলার বলেন, ভোরের নীরবতার মধ্য দিয়ে যারা দিন শুরু করেন, জীবনের সমস্যাগুলোকে তারা তুলনামূলক দ্রুত সমাধানের পথে নিয়ে যেতে পারেন। তারা বেশ প্রো-একটিভ, আশাবাদী ও ধীশক্তিসম্পন্ন।

আপনিও পারবেন

কর্মব্যস্ত দিনের শেষে অকারণে রাত না জেগে সকাল সকাল শুয়ে পড়ুন। ভালো একটা ঘুম হোক। ভোরে জেগে ওঠা সহজ হবে তাতে।

ভোরের প্রথম আলো দেখে দিন শুরু হোক আপনার। ভোরে জেগে ওঠা সহজ হবে যখন জানবেন ঘুম থেকে কেন উঠবেন, উঠেই-বা কী করবেন। তাই ঠিক করুন দিনের কর্মপরিকল্পনা, আর তা মনকে শোনান বার বার। আপনিও পারবেন তাহলে।

ভোরে ঘুম থেকে ওঠেন যারা, মেডিটেশন প্রাণায়াম হাঁটা ও ব্যায়ামের জন্যে তারা পর্যাপ্ত সময় পান। সারাদিন একটা চনমনে সুখানুভূতি হয় তাদের নিত্যসঙ্গী। স্বাভাবিকভাবেই তারা হয়ে ওঠেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী।

দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে সকালের খাবারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দেরিতে ঘুম ভাঙে যাদের, তাড়াহুড়োতে তারা এ থেকে মোটামুটি বঞ্চিতই হন বলা চলে। অথচ সকালের একটি ভালো ও ভরপেট নাশতা আপনাকে সারাদিনের কাজের শক্তি যোগাবে।

ভোরে দিন শুরু করায় অনেকটা সময় পাবেন, কাজগুলো করতে পারবেন গুছিয়ে। কাজের মানও হবে ভালো। কাজের গুরুত্ব অনুসারে কর্মপরিকল্পনার জন্যে পাবেন বাড়তি সময়। দিনের শেষে দেখবেন, আপনার কাজের পরিমাণও ছিলো অনেক। আর সব কাজ ধীরে-সুস্থে গুছিয়ে করতে পারবেন বলে স্ট্রেসের আগ্রাসন থেকে থাকবেন মুক্ত।

জানা তো হলো সবই, আর দেরি কেন? কাল থেকেই ভোরের আলোয় দিন শুরু হোক আপনার। হাসি আনন্দ আর স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ততার জয়ানুরণনে ভরে থাকুক সারাটা দিন।

তথ্যসূত্র : জার্নাল অব দি আমেরিকান কলেজ অব কার্ডিওলজি
হেলথ টুডে (জুন ২০১৩)

দম ॥ জীবনের মূল ছন্দ

সুস্বাস্থ্য একজন মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আর এ সুস্বাস্থ্যের অন্যতম প্রধান ভিত্তি দম। আমরা বলতে পারি, দম হচ্ছে জীবনের মূল ছন্দ। খাবার ছাড়া আপনি বেশ কিছুদিন বাঁচতে পারবেন, পানি ছাড়াও দিন কয়েক বাঁচা সম্ভব। কিন্তু দম ছাড়া অর্থাৎ অক্সিজেন ছাড়া আপনি বড়জোর পাঁচ মিনিট বাঁচতে পারেন, এর বেশি নয়।

দমের মূল অনুষঙ্গ অক্সিজেন। এই অক্সিজেন আমাদের দেহের জৈব-তড়িৎ ভারসাম্য (Bio-Electrical Balance) নিয়ন্ত্রণ করে, আর খাবারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় দেহের জৈব-রাসায়নিক ভারসাম্য (Bio-Chemical Balance)। অর্থাৎ শরীরের সার্বিক অবস্থা স্বাভাবিক রাখার জন্যে খাবারের পাশাপশি দমও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণত আমরা দুভাবে দম নিয়ে থাকি :

□ ওপর পেটে দম (Abdominal breathing) : স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের দম নেয়ার সহজাত পদ্ধতিটি হলো এই এবডোমিনাল ব্রিদিং। কিন্তু এভাবে দম নিলে ফুসফুস পূর্ণমাত্রায় প্রসারিত হতে পারে না। ফুসফুস বঞ্চিত হয় পর্যাপ্ত অক্সিজেন থেকে। যার ফলে অধিকাংশ মানুষই আমরা পূর্ণ কর্মশক্তি ও প্রাণ-চঞ্চলতা নিয়ে কাজ করতে পারি না।

□ বুক ফুলিয়ে দম (Thoracic breathing) : এভাবে দম নিলে ফুসফুস পূর্ণমাত্রায় প্রসারিত হতে পারে। প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফুসফুস কাজ করতে পারে তার পুরো কর্মক্ষমতা নিয়ে। ফলে ক্লান্তি দূর হয় নিমেষেই এবং শরীর-মন সারাদিন প্রফুল্ল থাকে। এটাই দম নেয়ার সবচেয়ে সঠিক পদ্ধতি।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, শ্বসনতন্ত্রের অনেক অসুখের কারণ হলো সঠিকভাবে দম নিতে না পারা। দুঃখজনক হলেও সত্যি, আমরা অধিকাংশ মানুষই এ ব্যাপারে উদাসীন। সঠিকভাবে দম নেয়া তখনই হবে–যখন আপনি নাক দিয়ে দম নেবেন, আপনার বুক ফুলবে এবং ফুসফুস প্রসারিত হবে

পূর্ণমাত্রায়। এভাবে দম নিলে সারাদিন আপনি থাকবেন কর্মোদ্যমী ও প্রাণবন্ত। তাই যখনই পারেন, সচেতনভাবে বুক ফুলিয়ে দম নিন।

দমের মধ্য দিয়ে শরীরে শুধু অক্সিজেনই প্রবেশ করে না, এক ধরনের প্রাণশক্তিও প্রবেশ করে। সাধকরা এটিকে বলতেন 'প্রাণা'। তাই দম চর্চার এই পদ্ধতিকে প্রাচীন যোগব্যায়ামের ভাষায় সাধকরা অভিহিত করেছেন 'প্রাণায়াম' নামে। প্রাণশক্তি বৃদ্ধি পায় ও দেহকে জরা-ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখে বলেই এর নাম প্রাণায়াম।

প্রাণায়াম আপনার দেহ ও মনের মধ্যে ব্রিজ বা সেতু হিসেবে কাজ করে। স্ট্রেসের কারণে যখন সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম উদ্দীপ্ত হয়, দেহ-মনে চলতে থাকে ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স, তৈরি হয় অস্থিরতা অশান্তি এবং করোনারি ধমনীতে অযাচিত সংকোচন ইত্যাদি। আর এ অবস্থায় নিয়মিত প্রাণায়াম বা দম চর্চা আপনার দেহ-মনকে টেনশনমুক্ত করে। ভেতরে সৃষ্টি হয় এক অনাবিল প্রশান্তি। সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের উদ্দীপনা কমে আসে। ফলে করোনারি ধমনীতে যে ক্ষতিকর সংকোচন সৃষ্টি হয়েছিলো সেটি দূর হয়।

যোগ সাধনায় বহু ধরনের প্রাণায়াম রয়েছে। এর মধ্যে হৃৎপিণ্ডের সুস্থতার জন্যে উপকারী দুটি প্রাণায়াম হচ্ছে সহজ উজ্জীবন ও নাসায়ন। দিনের যেকোনো সময় যেকোনো পরিবেশে আপনি খুব সহজেই এ দুটি প্রাণায়াম অনুশীলন করতে পারেন। মুহূর্তেই হয়ে উঠতে পারেন টেনশনমুক্ত ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর।

সহজ উজ্জীবন

পদ্ধতি : মেরুদণ্ড পুরোপুরি সোজা রেখে দাঁড়ান অথবা বসুন। দুই হাত কোমরের দুই পাশে রাখুন। তাতে ফুসফুস পূর্ণমাত্রায় প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পাবে। এবার সময় নিয়ে ধীরে ধীরে বুক ফুলিয়ে দম নিন। দম নেবেন নাক দিয়ে, মুখ বন্ধ থাকবে। দম নেয়ার সাথে সাথে বুক ফুলবে, ওপরের পেট নয়। ফুসফুস সর্বোচ্চ প্রসারিত হওয়ার পর কয়েক সেকেন্ড দম ধরে রাখুন, ফুস্ করে ছেড়ে দেবেন না।

এবার ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে দম ছাড়ুন। দম নেয়ার চেয়ে দম ছাড়তে একটু বেশি সময় নিন। একবার দম নেয়া হলো। এভাবে ১৯ বার দম নিলে এক দফা সহজ উজ্জীবন হবে। সারাদিনে পাঁচ/ ছয় দফা চর্চা করুন।

নাসায়ন বা একনাসা প্রাণায়াম

পদ্ধতি : মেরুদণ্ড সোজা রেখে প্রথমে এক পা ওপরে তুলে আর এক পা ভাঁজ করে নিচে রেখে (ছবির মতো করে) বসুন। এবার ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে নাকের ডানপাশের ছিদ্র চেপে ধরুন (ছবির মতো করে)। এমনভাবে ধরুন যেন বাতাস বেরিয়ে যেতে না পারে। এবার বামপাশের ছিদ্র দিয়ে দম নিয়ে অনামিকা দিয়ে বামপাশের ছিদ্রটিও বন্ধ করে দিন। তারপর বাম ছিদ্র বন্ধ রেখেই ডান ছিদ্র থেকে বুড়ো আঙুল তুলে ডান ছিদ্র দিয়ে দম ছাড়ুন। বাম ছিদ্র বন্ধ রাখা অবস্থায়ই নাকের ডান ছিদ্র দিয়ে পুনরায় দম নিন। দম নেয়া হলে বুড়ো আঙুল দিয়ে ডান ছিদ্র বন্ধ করে পুনরায় বাম ছিদ্র দিয়ে দম ছাড়ুন। এভাবে একবার ডান নাক বন্ধ রেখে বাম নাক দিয়ে ছাড়া আবার বাম নাক বন্ধ রেখে ডান নাক দিয়ে ছাড়া–এই মিলে এক প্রস্থ হবে। এভাবে আপনি ছয় থেকে ১০ প্রস্থ করতে পারেন। নাসায়ন আপনি পদ্মাসনে বসেও করতে পারেন।

নাসায়ন : ছবি– ১

হাত ও আঙুলের ভঙ্গি

মায়ের দুধ হোক শিশুর প্রথম খাবার

মায়ের দুধ হওয়া চাই শিশুর প্রথম খাবার। এ ব্যাপারে একবাক্যে রায় দিয়েছেন চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা। কারণ, এটি সবচেয়ে আদর্শ ও প্রাকৃতিক শিশুখাদ্য। শিশুর মস্তিষ্কের গঠন ও সুসংহত রোগ প্রতিরোধ শক্তির জন্যে মাতৃদুগ্ধের প্রয়োজনীয়তা এখন বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো শুধু শিশুর জন্যেই যে উপকারী তা নয়, বরং স্তন্যদানকারী মা-ও এ থেকে উপকৃত হন।

শাল দুধ ॥ জীবনের প্রথম টিকা

জন্মের পর প্রথম দিনগুলোতে শিশুর শরীরে নানারকম জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। এ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় খাবারটি হলো মায়ের দুধ, বিশেষত শাল দুধ। বিশেষজ্ঞরা বলেন, জন্মের পর পরই যত দ্রুত সম্ভব শিশুকে শাল দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ, এতে থাকা বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক উপাদান রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি ও সুদৃঢ় করে, যা নবজাত শিশুর ডায়রিয়া ও শ্বাসনালীর সংক্রমণ ঠেকাতে সক্ষম।

তাই, এই শাল দুধ (Colostrum) হওয়া উচিত শিশুর জীবনের প্রথম খাবার। হলুদাভ আঠালো এই পদার্থটি পুষ্টিবিজ্ঞানীদের ভাষায় 'তরল সোনা'। কেউ কেউ একে অভিহিত করেছেন এক অতুলনীয় প্রাকৃতিক মহৌষধ হিসেবে। কারণ, এতে রয়েছে বিভিন্ন রকম রোগ প্রতিরোধী এন্টিবডি, ক্যারোটিন, প্রোটিন, ভিটামিন এ, ডি, ই, বি-১২ এবং রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় শ্বেতকণিকা, রয়েছে পর্যাপ্ত পানি ও খনিজ উপাদান।

পুষ্টিবিজ্ঞানীদের কাছে তাই শাল দুধ এক বিস্ময়কর খাদ্য উপাদান। আর রোগ ও সংক্রমণের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে বলে চিকিৎসকরা বলছেন, শাল দুধ হলো জীবনের প্রথম টিকা।

এছাড়াও মাতৃদুগ্ধ পানের মাধ্যমে শিশু মায়ের কাছ থেকে জন্মগতভাবে লাভ করে রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জিনগত স্মৃতি। তাই বিজ্ঞানীরা বলছেন, শিশুকে নিয়মিত মায়ের দুধ খাওয়ান আর প্রতিদিনই তাকে করে তুলুন রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে আরো শক্তিশালী।

শিশুস্বাস্থ্যের জন্যে সর্বতোভাবে জরুরি

ইংল্যান্ডে একটি গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত মায়ের দুধ পান করে এমন নবজাতকরা তুলনামূলক বেশি কাঁদে, যা নবজাত শিশুর ফুসফুসের সুষম গঠন ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করে। এছাড়াও মস্তিষ্কের গঠন আর বিকাশেও মাতৃদুগ্ধের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এতে রয়েছে টরিন, লাইসিন, লিনোলেয়িক এসিড ইত্যাদি এমাইনো এসিড, যা শিশুর মস্তিষ্কের টিস্যু গঠন ও পরিপক্কতায় বিশেষভাবে জরুরি।

মাতৃদুগ্ধ পানে শিশুর আইকিউ বাড়ে। কুইন্সল্যান্ডে চার হাজার শিশুর ওপর পরিচালিত একটি গবেষণায় বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মায়ের দুধ পানে অভ্যস্ত শিশুদের বুদ্ধিমত্তা তুলনামূলক বেশি হয়ে থাকে। যেসব শিশু পূর্ণ সময় (দুই বছর) স্তন্যপান করে, তারা বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডেও থাকে এগিয়ে। এবং এদের সাথে মাতৃদুগ্ধ বঞ্চিত শিশুদের আইকিউ-এর পার্থক্য হতে পারে ৮.৫ পয়েন্ট পর্যন্ত।

মাতৃদুগ্ধ শিশুকে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সাইবেরিয়ান মেডিকেল ইনস্টিটিউটের একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, মাতৃদুগ্ধে 'ল্যাকটোপিন' নামে যে প্রোটিনটি রয়েছে তা ক্যান্সার সেল ধ্বংস করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে এবং সেটি দেহের সুস্থ কোষগুলোর কোনো ক্ষতি না করেই।

মায়ের জন্যেও উপকারী

স্তন্যদানে দ্বিমুখী উপকারিতা। সন্তানের জন্যে তো বটেই, স্তন্যদানকারী মায়ের জন্যেও এটি শারীরিক-মানসিক নানাভাবে উপকারী। জন্মের পর পরই শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পান করালে মায়ের রক্তক্ষরণ দ্রুত বন্ধ হয়, গর্ভফুল তাড়াতাড়ি পড়ে যায়। মায়ের জরায়ু ও দৈহিক গঠন দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

সন্তানকে স্তন্যদানের ফলে মায়ের ক্যান্সার-ঝুঁকি কমে। কানাডার অন্টারিও ইনস্টিটিউটের গবেষকরা ছয় হাজার নারীর ওপর গবেষণা চালান। তারা বলেন, এদের মধ্যে যারা সন্তানকে পূর্ণ সময় ধরে বুকের দুধ

খাইয়েছেন, তাদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমেছে ৩২ শতাংশ পর্যন্ত। তাদের মতে, মহিলাদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে এটি সবচেয়ে সহজ আর প্রাকৃতিক পন্থা। এটি প্রকাশিত হয়েছে বায়োমেড সেন্ট্রাল জার্নালে। আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, স্তন্যদানের ফলে ডিম্বাশয় ও জরায়ুমুখের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে। এছাড়াও কমে বার্ধক্যজনিত হাড়ক্ষয়ের ঝুঁকি।

উপকার আছে আরো। শরীরের পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে উৎপাদিত হয় অক্সিটোসিন নামক একটি হরমোন। মূলত এর প্রভাবেই মাতৃস্তন থেকে দুধ নিঃসৃত হয়। গবেষকরা বলেন, এ হরমোনটি মায়ের শরীর-মনে প্রশান্তিময় অবস্থার সৃষ্টি করে, যা তাকে টেনশন-উদ্বেগ ইত্যাদি মানসিক চাপ থেকে মুক্ত থাকতে সাহায্য করে। এবং নানাভাবে মায়ের শরীরকে পুষ্টিসমৃদ্ধ করে।

এছাড়াও স্তন্যদানের সাথে মাতৃদেহের আরো একটি হরমোনের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। বিটা এন্ডোরফিন। এটি স্তন্যদায়ী মায়ের দেহ-মনে এক ধরনের আনন্দ-অনুভূতির জন্ম দেয় এবং ব্রেনে আলফা ওয়েভ সৃষ্টির মাধ্যমে মনকে করে প্রশান্ত। এ হরমোনের প্রভাবে মা ও শিশুর পারস্পরিক সম্পর্ক হয়ে ওঠে আরো গভীর ও মমতাপূর্ণ। দুজনের মধ্যকার আত্মিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মা তাদের নবজাত সন্তানদের টানা সাত সপ্তাহ ধরে স্তন্যদান করেছেন, তারা ছিলেন অন্যান্য মায়েদের তুলনায় অনেক বেশি প্রশান্ত, স্থির ও টেনশনমুক্ত। অথচ মায়ের দুধের পরিবর্তে সন্তানকে অন্য কোনো খাবার বা বিকল্প শিশুখাদ্য দিলে এ সবগুলো উপকার থেকে বঞ্চিত করা হয় মা ও শিশু দুজনকেই।

বিকল্প শিশুখাদ্য শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়

স্থূল বিজ্ঞাপন আর লোভনীয় প্রচারের ফাঁদে পড়ে পৃথিবীব্যাপী দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত শিশুখাদ্য। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা সাবধান করে দিয়ে বলছেন, মায়ের দুধের পরিবর্তে বিকল্প শিশুখাদ্য বেছে নেয়া আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। এতে বিভিন্ন রকম দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক-মানসিক ক্ষতি আর মৃত্যুর ঝুঁকিই কেবল বাড়ে। তাই উন্নত বিশ্বের অনেক দেশেই এসব খাবারের বিপণন ও বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পশ্চিমা বিশ্বে বিজ্ঞাপনে কড়াকড়ি আর জন্মহার কমে যাওয়ার ফলে ওখানে এসব খাবারের বাজার সংকুচিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। প্রক্রিয়াজাত শিশুখাদ্য প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ীরা তাই মুনাফার জন্যে এখন ঝুঁকেছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর দিকে। আর প্রলুব্ধ

করার উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছে বিজ্ঞাপন, পেতেছে কোটি কোটি ডলারের বিজ্ঞাপন-ফাঁদ। এসব মিথ্যা প্রচারণার ফাঁদে পড়ে কেউ কেউ অধিকতর পুষ্টির আশায় মায়ের দুধের পরিবর্তে শিশুর জন্যে প্রক্রিয়াজাত খাবারকে বেছেও নিচ্ছেন। কিন্তু এগুলো প্রকৃতপক্ষে শিশুর বেড়ে ওঠা ও সুস্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর। প্রক্রিয়াজাত শিশুখাদ্য গ্রহণের ফলে পৃথিবীজুড়ে শিশুরা যেসব রোগে আক্রান্ত হচ্ছে বিজ্ঞানীরা তার নামকরণ করেছেন 'বটল বেবি ডিজিজ'।

এ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞরা বলেন, বাজারে প্রচলিত বিকল্প শিশুখাদ্যগুলোর যথেচ্ছ ও অকারণ ব্যবহার শিশুদের বিভিন্ন রকম স্বাস্থ্য-জটিলতা, রোগঝুঁকি এমনকি শিশুমৃত্যুর ঝুঁকিও বাড়িয়ে চলেছে। তাদের মতে, আমরা যদি শুধু প্রক্রিয়াজাত খাবারের বদলে মায়ের দুধের উপকারিতার বিষয়টি পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিতে পারি, তাহলে প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে নবজাতক মৃত্যুর সংখ্যা কমে যাবে এক মিলিয়ন।

গুঁড়ো দুধে রোগঝুঁকি বাড়ে

সুদৃশ্য কৌটায় দেশি-বিদেশি একাধিক ব্র্যান্ডের গুঁড়ো দুধ বাজারজাত হচ্ছে দেদারসে। উচ্চ দামে কিনছেনও প্রায় সবাই। শিশুদেরও খাওয়ানো হচ্ছে বাছবিচারহীনভাবে। কিন্তু গুঁড়ো দুধ যেভাবে প্রক্রিয়াজাত করা হয় তাতে ব্যাকটেরিয়া অক্ষত থেকে যেতে পারে। ফলে টাইফয়েড, ম্যানিনজাইটিসসহ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে ঘটতে পারে শিশুর মৃত্যু পর্যন্ত।

১ নভেম্বর ২০০৮-এ ঢাকায় 'নিরাপদ পুষ্টিকর খাদ্য রক্ষা করে শিশুদের জীবন' শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকে ও এমিন্যান্স-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ সেমিনারে বাংলাদেশ ব্রেস্ট ফিডিং ফাউন্ডেশনের মহাসচিব ও প্রখ্যাত শিশু-বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডা. সুফিয়া খাতুন বলেন, ২০০৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গুঁড়ো দুধ ও অন্যান্য শিশু খাদ্য নিয়ে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক গবেষণা চালিয়েছে।

দেখা গেছে, গুঁড়ো দুধ যেভাবে প্রক্রিয়াজাত করা হয় তাতে 'ই কলাই' ও 'সালমোনেলা' ব্যাকটেরিয়া থাকার প্রমাণ পায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। তাই গুঁড়ো দুধ শিশুদের জন্যে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে এবং এটি পান করার ফলে টাইফয়েড, ম্যানিনজাইটিস, নিউমোনিয়া এবং পুষ্টিহীনতাসহ বিভিন্ন প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। তিনি জানান, সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে যেমন লেখা থাকে 'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর', তেমনি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও শিশুদের জীবন রক্ষার্থে গুঁড়ো দুধ উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুধের কৌটার গায়ে 'এই দুধ জীবাণুমুক্ত নয়' কথাটি লেখার সুপারিশ করেছিলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কোনো দেশ আজও তা বাস্তবায়ন করতে পারে নি।

সেমিনারে জানানো হয়, দক্ষিণ আফ্রিকার কোনো কোনো অঞ্চলে বেশিরভাগ নারী-পুরুষ মরণব্যাধি এইডসের জীবাণু বাহক এবং অধিকাংশই এইডস রোগী। তাই সে দেশে শিশুদের মায়ের দুধের বদলে গুঁড়ো দুধ খাওয়ানোর জন্যে সরকারিভাবে ঘোষণা দেয়া হয়। পরবর্তীতে দেখা যায়, অপুষ্টির কারণে ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, টাইফয়েডসহ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে শিশুমৃত্যুর হার সেখানে ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে।

পরে দেশটির সরকার বাধ্য হয়ে শিশুদের গুঁড়ো দুধের বদলে মায়ের দুধ খাওয়ানোর নির্দেশ জারি করে। ফলে ওখানে বর্তমানে শিশুমৃত্যুর হার নেই বললেই চলে এবং শতকরা একজন শিশুও এইডস আক্রান্ত হয় নি। কারণ, মাতৃদুগ্ধ পানে শিশুর এইডস-আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে উল্লেখযোগ্য হারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এইডস আক্রান্ত মায়ের দুধও শিশুর জন্যে নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত। এছাড়াও মা হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসসহ যেকোনো সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকলেও মায়ের দুধ শিশুর জন্যে সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং তাতে শিশুর সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে না বলে বিশেষজ্ঞরা জানান।

বিভ্রান্তি নয়, চাই সত্যটা জানা ॥ মায়ের দুধই শিশুর শ্রেষ্ঠ খাবার

বিশেষজ্ঞদের মতে, স্তন্যদানকারী মায়েরা স্বাভাবিক সব ধরনের খাবারই গ্রহণ করতে পারেন। স্তনে পর্যাপ্ত দুধ তৈরি হওয়ার জন্যে দৈনন্দিন সুষম পুষ্টিকর খাবারই যথেষ্ট। এর জন্যে বিশেষ কোনো খাবারের প্রয়োজন নেই।

আবার অনেক মায়ের ধারণা যে, একবার স্তন্যদানের পর মাতৃদুগ্ধ তৈরি হতে সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু সত্য হলো, স্তন্যদানকারী মায়ের ক্ষেত্রে দুধ তৈরির প্রক্রিয়াটি একটি চলমান ও স্বয়ংক্রিয় শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়া। আর শিশুকে স্তন্যদানের বিষয়টিও একটি স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক ঘটনা। কারণ, প্রকৃতিগতভাবেই স্তনের গঠন আর আকৃতিটা এমন–যাতে শিশু সবচেয়ে আরামদায়কভাবে মাতৃদুগ্ধ পান করতে পারে।

সন্তানকে স্তন্যদানের ব্যাপারে ধর্মীয়ভাবেও রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা। এ প্রসঙ্গে দেশের বিশিষ্ট শিশু-বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডা. এম কিউ কে তালুকদার

বলেন, শিশুকে দু-বছর পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়ানো পবিত্র কোরআনে ওয়াজিব করে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ।

শিশুকে কতদিন মায়ের দুধ খাওয়ানো যাবে? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, শিশুকে দুই বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়ানো উচিত। আর জন্মের পর থেকে প্রথম ছয় মাস শুধুই বুকের দুধ (এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং), এসময় এক ফোঁটা পানিরও প্রয়োজন নেই। শিশুর সব ধরনের প্রয়োজন পূরণে তখন মায়ের দুধটুকুই যথেষ্ট। তারপর ছয় মাস বয়স থেকে ধীরে ধীরে মায়ের দুধের পাশাপাশি ঘরে তৈরি অন্যান্য স্বাভাবিক খাবার শুরু করতে হবে।

মাতৃদুগ্ধই শিশুর শ্রেষ্ঠ খাবার, কারণ–

- ☐ জন্মের পরপরই যেকোনো ধরনের অসুস্থতা ও সংক্রমণের হার কমায়।
- ☐ অকালমৃত্যুর ঝুঁকি হ্রাস করে।
- ☐ ডায়রিয়া ও পরিপাকতন্ত্রের অসুস্থতা প্রতিরোধ করে।
- ☐ মূত্রনালীর সংক্রমণ রোধ করে।
- ☐ নবজাতকের কানের প্রদাহের হার কমায়।
- ☐ মেদস্থূলতার হার কমায়।
- ☐ সুষম মানসিক বিকাশের জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদানে সমৃদ্ধ।
- ☐ শারীরিক বৃদ্ধি ও স্নায়ুতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়।
- ☐ নিউমোনিয়াসহ যাবতীয় প্রাণঘাতী সংক্রমণের হার কমে।
- ☐ পরবর্তী জীবনে হৃদরোগ ও ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে।
- ☐ মায়ের দুধে থাকা ১১টি রোগ প্রতিরোধী উপাদান শিশুর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে করে তোলে সুদৃঢ়।
- ☐ শিশুর দাঁত ও মাড়ির গঠন সুন্দর হয়।
- ☐ শিশুর শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।
- ☐ নির্ধারিত সময়ের আগে জন্ম নেয়া অপরিণত ও কম ওজনের শিশুর জন্যে মায়ের দুধ সবচেয়ে নিরাপদ খাবার।
- ☐ মা ও শিশুর মধ্যে সৃষ্টি করে এক অনুভূতিময় আত্মিক বন্ধন।

তথ্যসূত্র : রিডার্স ডাইজেস্ট (ডিসেম্বর ২০১০), দি জার্নাল অব বায়োমেড সেন্ট্রাল

পানিই সেরা পানীয়

সুস্থ জীবনের জন্যেই পানি

নিজেকে সুস্থ আর তারুণ্যদীপ্ত দেখতে চান সবসময়? দৈনন্দিন জীবনের ক্লান্তি জয় করে হয়ে উঠতে চান সতেজ? পর্যাপ্ত পানি পান করুন। সারাদিন আপনি থাকবেন ঝরঝরে, জীবন-উদ্যমে ভরপুর এমনকি মানসিক চাপমুক্ত।

আমাদের শরীরের শতকরা ৬০ ভাগ অর্থাৎ প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই পানি। মানবদেহের সমস্ত কোষ, কলা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মূল গাঠনিক উপাদান পানি। যেমন, পেশির শতকরা ৭৫ ভাগ, হাড়ের ২২ ভাগ, রক্তের ৮৩ ভাগই হলো পানি। এছাড়াও মাথা থেকে পা অবধি শরীরের প্রতিটি কোষের দৈনন্দিন স্বাভাবিক শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়া চলমান রাখার জন্যে পানি এক অপরিহার্য উপাদান। তাই কেবল তৃষ্ণা মেটাতেই নয় বরং সুস্থ জীবনের জন্যেই পর্যাপ্ত পানি পান জরুরি।

পানি পানে সজীব ত্বক, উজ্জ্বল তারুণ্য

চুমুকে চুমুকে পানি পান করুন সারাদিন। আপনার ত্বক হয়ে উঠবে দিন দিন আরো সজীব আর প্রাণদীপ্ত। ত্বকের সুস্থতার জন্যে নামিদামি ব্র্যান্ডের প্রসাধনীর চেয়েও পানি পানের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। আর ত্বকের শুষ্কতা নিয়ে চিন্তিত যারা, শীত কিংবা গ্রীষ্ম যখনই হোক, তাদের জন্যে দিনের পুরোটা সময় জুড়ে পানি পান হতে পারে মোক্ষম দাওয়াই। এতে ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা চমৎকারভাবে বজায় থাকে।

ত্বকের বিভিন্ন রকম রোগ যেমন : একজিমা, সোরিয়াসিস নিরাময়ে সহায়তার পাশাপাশি ত্বকে বয়সজনিত ভাঁজ পড়া ও অনাকাঙ্ক্ষিত দাগ দূর করার ক্ষেত্রেও পর্যাপ্ত পানি পান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এছাড়াও পানি ত্বকের স্বাভাবিক কমনীয়তা ও স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

প্রতিদিন নিয়ম করে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি পান করুন। এর ফলে রক্তের মাধ্যমে আপনার প্রতিটি দেহকোষে অক্সিজেন ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি

পৌঁছে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি আরো ত্বরান্বিত ও সক্রিয় হয়ে উঠবে। আপনি হবেন সতেজ আর উজ্জ্বল তারুণ্যের অধিকারী।

ক্লান্তি জুড়ায়, উদ্দীপ্ত হয় মস্তিষ্ক

পানি পানে ক্লান্তি জুড়ায়। পরিশ্রমজনিত অবসাদ ও শ্রান্তি দূর হয়। অনেকক্ষণ ধরে ভারী পরিশ্রমের কোনো কাজ করতে থাকলে শরীরে যে পানিশূন্যতার সৃষ্টি হয়, তার ফলে কেউ কেউ মাস্‌ল ক্র্যাম্প বা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক পেশি-সংকোচনের শিকার হন। গবেষকরা বলছেন, ভারী পরিশ্রম ও ব্যায়ামের আগে-পরে যথেষ্ট পানি পান করলে ক্লান্তি দূর হওয়ার পাশাপাশি অযাচিত পেশি-সংকোচনের ঝুঁকি কমে।

আমাদের মস্তিষ্কের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগই পানি। শরীরে পানিশূন্যতা দেখা দিলে ব্যাহত হয় মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কর্মপ্রক্রিয়া। মাথাঘোরা বা এ জাতীয় অস্বস্তিতে ভুগতে পারেন কেউ কেউ, কেউ-বা আবার আক্রান্ত হতে পারেন মনোযোগহীনতায়। অন্যদিকে শত ব্যস্ততা আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে অল্প অল্প পানি পান মস্তিষ্ককে রাখে উদ্দীপ্ত ও কর্মচঞ্চল। অটুট থাকে মনোযোগ ও কাজের গতি।

পানি পান মাথাব্যথার প্রাকৃতিক চিকিৎসা। মাথাব্যথা হতে পারে অনেক কারণেই, যার মধ্যে পানিশূন্যতা অন্যতম। তাই নিয়মিত ও পর্যাপ্ত পানি পান করে আপনি মুক্তি পেতে পারেন যন্ত্রণাদায়ক মাথাব্যথা থেকে। সাধারণ মাথাব্যথাই কেবল নয়, মাইগ্রেনজনিত মাথাব্যথা উপশমেও প্রচুর পানি পানে উৎসাহ যুগিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

ওজন থাকে নিয়ন্ত্রণে, বাড়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা

পর্যাপ্ত পানি পানে অভ্যস্ত যারা, তাদের ওজন থাকে নিয়ন্ত্রণে। কারণ, প্রয়োজনীয় পানির অভাবে বিপাকক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়, ফলে শরীরে ফ্যাট জমে। এছাড়াও পানি ক্ষুধার অনুভূতি কমায়। তাতে অতিভোজনের সুযোগ কমে, খাদ্যগ্রহণ হয় পরিমিত। আবার ক্ষুধামন্দাতেও পানি পান কার্যকরী।

পানি দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। পেশি ও কোষে প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায়। ফুসফুসের স্বাভাবিক আর্দ্রতা বজায় রাখে। শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পৌঁছে দিয়ে নিশ্চিত করে সার্বিক সুস্থতা। এছাড়াও দেহের ছোট-বড় সব অস্থিসন্ধির স্বাভাবিক আর্দ্রতা ও নমনীয়তা অটুট রাখতেও পানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই বাতব্যথা এবং

আর্থ্রাইটিস নিরাময়েও পর্যাপ্ত পানি পানের পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা।

শরীরে পানির পরিমাণ কমে গেলে হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয়। হৃৎপিণ্ডের সুস্থতার জন্যেও পানি পান তাই বেশ জরুরি। এর পাশাপাশি হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধের সাথেও পানি পানের যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ক্যালিফোর্নিয়ার লোমা লিন্ডা ইউনিভার্সিটিতে একদল পূর্ণবয়স্ক নারী-পুরুষের ওপর পরিচালিত একটি গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সারাদিনে পর্যাপ্ত পানি পান করেছেন যারা, তাদের হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমে গেছে ৪১ থেকে ৫৪ শতাংশ পর্যন্ত।

পর্যাপ্ত পানি পান শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলে। ঋতু পরিবর্তনজনিত ফ্লু এবং ভ্রমণজনিত অসুস্থতা প্রতিরোধেও পানি পানের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

কিডনি ও পরিপাকতন্ত্রের সুস্থতা এবং স্বাভাবিক রেচন

কিডনির সুস্থতার জন্যে পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিডনির সুস্থতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি এটি কিডনিতে পাথর জমার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে এবং দেহ থেকে সকল প্রকার ক্ষতিকর টক্সিন বা বিষাণুকে বের করে দেয়।

পর্যাপ্ত পানি পান পরিপাকতন্ত্রের সুস্থতা নিশ্চিত করে। পরিপাকতন্ত্রকে করে সংহত। ফলে হজম ভালো হয়। শুধু তা-ই নয়, এসিডিটির সমস্যায় অহোরাত্র অস্বস্তিতে ভোগেন যারা, তাদের জন্যে এটি বেশ কার্যকরী। সবমিলিয়ে বলা যায়, শরীরের স্বাভাবিক বিপাকক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্যেই পর্যাপ্ত পানি প্রয়োজন।

কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভোগেন অনেকেই। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, এদের অধিকাংশেরই সারাদিনে যে পানি খাওয়া হয় তার পরিমাণ এক/দেড় লিটারের বেশি নয়। অথচ যথেষ্ট পরিমাণ পানির অভাবে কোলনের ভেতরটা শুষ্ক হয়ে যায়, ফলে বর্জ্য ঠিকমতো নির্গত হতে পারে না। দিনের পর দিন এভাবে চলতে থাকলে কোষ্ঠবদ্ধতা একসময় পরিণত হয় স্থায়ী সমস্যায়। আর এর সহজ সমাধান কিন্তু আপনার হাতের নাগালেই–সারাদিনে পর্যাপ্ত পানি পান করুন। এছাড়াও প্রচুর পানি পানের ফলে কোলন ও মূত্রথলির ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে।

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চার থেকে ছয় গ্লাস পানি পানের অভ্যাস করুন। প্রথমদিন দুই গ্লাস দিয়ে শুরু করুন। ধীরে ধীরে পরিমাণ বাড়ান। দিনের শুরুতেই খালি পেটে পানি পান নানা কারণে দারুণ উপকারী।

পানি পানে স্ট্রেস কমে

পানি পানে স্ট্রেস কমে। রীতিমতো গবেষণায় প্রমাণিত সত্য এটি। যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতিমান এথলেট প্রশিক্ষক ও পুষ্টিবিদ আমান্ডা কার্লসন বলেন, মাত্র আধা লিটার পানির ঘাটতি হলেই আমাদের শরীরে স্ট্রেস হরমোন কর্টিসোলের প্রবাহ বেড়ে যায়। দেহ-মন স্ট্রেস আক্রান্ত হয়ে উঠতে পারে।

অন্যদিকে, শরীরের সব কোষ-কলা-পেশিতে পানির পরিমাণ প্রয়োজন অনুপাতে থাকলে কর্টিসোল হরমোনের প্রবাহ থাকে সহনীয় মাত্রায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেহে পানিশূন্যতা দেখা দিলে যেমন স্ট্রেস সৃষ্টি হয়, তেমনি স্ট্রেসের কারণেও দেহে পানিশূন্যতা দেখা দিতে পারে। এ এক দুষ্টচক্র। আর পানি পান হতে পারে এ দুষ্টচক্র ভাঙার সহজ উপায়।

পানিশূন্যতা হওয়ার আগেই পানি পান করুন দেড় থেকে তিন লিটার প্রতিদিন

তৃষ্ণার্ত বোধ করছেন? তবে জেনে নিন, আপনার শরীর ইতোমধ্যেই পানিশূন্যতায় ভুগছে। তাই তৃষ্ণার্ত হওয়ার আগেই পানি পান করুন। কারণ, শরীরে পানির পরিমাণ ২০ শতাংশ কমে গেলে তা অনেক সময় মৃত্যুরও কারণ হতে পারে।

স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও আবহাওয়ায় প্রতিদিন দেড় থেকে তিন লিটার পানি পান করুন। ভারী পরিশ্রম কিংবা অতিরিক্ত উষ্ণ আবহাওয়ায় প্রয়োজন বুঝে একটু বেশি পানি পান করুন। এছাড়াও জ্বরের সময় শরীর পানিশূন্যতায় আক্রান্ত হয়। তাই এ সময় প্রচুর পানি পান করা জরুরি।

তৃষ্ণা পেলে পানিই পান করুন। কারণ, পানিই সেরা পানীয়। সেইসাথে খেয়াল রাখুন, পানিটা যেন হয় বিশুদ্ধ। আর জেনে রাখা ভালো–ঠান্ডা পানি নয়, বরং স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানিই স্বাস্থ্যকর।

উল্লেখ্য, হার্ট ফেইলিউর, কিডনি ও লিভারের সমস্যা, পেট কিংবা পা ফোলা ইত্যাদি স্বাস্থ্য-জটিলতায় ভুগছেন যারা, তারা অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পানি পান করবেন।

তথ্যসূত্র : এমএসএন হেলদি লিভিং ডটকম

সুস্থ খাদ্যাভ্যাস সুস্থ জীবন

ডা. মেহমেদ ওয্ তুর্কি বংশোদ্ভূত আমেরিকান কার্ডিওথোরাসিক সার্জন। সফল চিকিৎসক-জীবনে পাঁচ হাজারেরও বেশি ওপেন হার্ট সার্জারি করেছেন তিনি। হৃদরোগীদের জীবনকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে। বিপুল এ অভিজ্ঞতার আলোকে গত প্রায় এক দশক ধরে হৃৎপিণ্ডের সুস্থতা ও সর্বোপরি সুস্থ জীবনের জন্যে বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভ্যাসের ধারণাকে তিনি তুলে ধরেছেন তার লেখা একাধিক বই ও টিভি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। আমেরিকার জনপ্রিয় স্বাস্থ্য-বিষয়ক টিভি অনুষ্ঠান 'ডা. ওয্ শো'-এর সঞ্চালক খ্যাতিমান এ চিকিৎসক বছর কয়েক আগে টাইম ম্যাগাজিনে 'What to eat now' শীর্ষক একটি নিবন্ধ লেখেন, যা মূলত কোয়ান্টাম খাদ্যাভ্যাসের ধারণাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে–

একসময় বলা হতো, সার্জনের দিন ভালো হলে অপারেশনের পর রোগী সুস্থ হয়ে উঠবেন; আর দিন খারাপ হলে দুর্ভাগ্যই বটে, হতে পারে তা রোগীর মৃত্যুও। কিন্তু হৃদযন্ত্রের ব্লকেজ-আক্রান্ত অসংখ্য রোগীকে অপারেশনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি ও আমার সহকর্মীরা দেখেছি, করোনারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সার্জনের ছুরির নিচে যারা বুক পেতে দিতে বাধ্য হন এবং বাইপাসের পরও যন্ত্রণাকাতর দিন কাটান তাদের ভোগান্তির অন্যতম প্রধান কারণ একটাই। ভুল খাদ্যাভ্যাস।

মজার ব্যাপার হলো, খাদ্যের সহজলভ্যতা ও অতিভোজন আমেরিকার মতো দেশগুলোতে স্বাস্থ্যবান জাতির বদলে উপহার (!) দিয়েছে মেদস্থূলতা হৃদরোগ ডায়াবেটিস ইত্যাদি প্রাণসংহারী রোগে আক্রান্ত একটি অসুস্থ জাতি। এ রোগগুলো ইতোমধ্যেই সেখানে প্রায় মহামারিতে রূপ নিয়েছে। আমেরিকানদের মধ্যে বর্তমানে দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণবয়স্ক ও এক-তৃতীয়াংশ শিশু-কিশোর হাঁসফাঁস করছে মেদস্থূলতা ও অতিরিক্ত ওজনের ভারে।

বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, আমি আজ পর্যন্ত এমন কাউকে পাই নি, যিনি স্বেচ্ছায় আমার ছুরির নিচে এসেছেন কিংবা আসতে পেরে আনন্দিত হয়েছেন। আসলে নিজের বুকে ছুরি-কাঁচি চালাতে কেউই চান না, কিন্তু প্রাণ

ডা. ওয-এর দৈনন্দিন খাদ্যতালিকা : ব্রকোলি, পালংশাক, মিষ্টি আলু, নানারকম ফলমূল, মাছ, টক দই ও বিভিন্ন ধরনের বাদাম

বাঁচাতে বাইপাস সার্জারির দ্বারস্থ হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণটি হলো বিজ্ঞানসম্মত ও সঠিক খাদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে অধিকাংশ মানুষের অজ্ঞতা।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রভাবে বর্তমানে আমরা স্বাস্থ্যকর খাবারটি বেছে নেয়ার বদলে স্বাস্থ্যঘাতী খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু এখন সময় এসেছে সুস্থতার জন্যে প্রয়োজনীয় ও উপকারী খাবারটি বেছে নেয়ার। এজন্যে দুর্লভ কোনো খাবারের সন্ধান করার প্রয়োজন নেই বরং পর্যাপ্ত তাজা ফলমূল, সালাদ, আঁশযুক্ত শাক-সব্জি এবং কম চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ করে একজন মানুষ অনায়াসে সুস্থ থাকতে পারেন। আর শত সহস্র বছর ধরে আমাদের শরীরও এসব খাবারেই সুস্থ থাকতে অভ্যস্ত। এর ফলে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস-এর মতো জীবনঘাতী রোগগুলো থেকে মুক্ত থাকাসহ শরীরের ওজনও থাকে পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও হয়ে ওঠে কার্যকরী ও পূর্ণ কর্মক্ষম।

খাবারে অতিরিক্ত লবণ এবং পাতে লবণ বর্জনীয়–এটুকু আমরা সকলেই জানি। কিন্তু আরো একটু সচেতনতা এক্ষেত্রে জরুরি। বাজারে প্রক্রিয়াজাত যেসব খাবার পাওয়া যায় সেগুলোকে আকর্ষণীয়, স্বাদযুক্ত ও মুখরোচক করে তোলার জন্যে তাতে মেশানো হয় অতিরিক্ত পরিমাণ লবণ, যা উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্যে ভীষণ স্বাস্থ্যহানিকর। আর দিনের পর দিন অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন যারা, তাদের খাবারে শুধু লবণ নিয়ন্ত্রণ করেও অনেক ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে।

মুটিয়ে যাওয়ার ভয়ে অনেকে দুধ খেতে চান না। কেউ-বা আবার বেছে নেন ফ্যাটমুক্ত স্কিম্ড মিল্ক। কিন্তু ওজন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এ দুয়ের মধ্যে আসলে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। বরং দুধের ক্যালসিয়াম পরিপাকতন্ত্রে থাকা অন্যান্য খাবারের সাথে বিক্রিয়া করে বলে শরীর কর্তৃক তুলনামূলক কম ফ্যাট শোষিত হয়। অবশ্য সব খাবারই হওয়া চাই পরিমিত। অনেকে আছেন যারা কফির প্রতি অনুরক্ত কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত কফি আপনাকে স্নায়বিকভাবে দুর্বল করে তুলতে পারে।

যথাসম্ভব প্রাকৃতিক খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হোন। এগুলো একদিকে যেমন সহজলভ্য, তেমনি আপনার চারপাশে সহজেই এদের দেখা মেলে। উপকারী তো বটেই। আর বর্জন করুন সব ধরনের প্রক্রিয়াজাত খাবার ও ফাস্টফুড। স্ন্যাক্স হিসেবে বিভিন্ন ধরনের বাদাম খান। বাদাম ও ফ্রেঞ্চফ্রাই-এর মধ্যে একটি তুলনামূলক গবেষণায় দেখা গেছে, বাদাম খেলে শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে আর ফ্রেঞ্চফ্রাই ওজন বাড়ায়। নিয়মিত বাদাম খেলে শরীরের জন্যে উপকারী কোলেস্টেরল এইচডিএল-এর পরিমাণ বাড়ে ও ক্ষতিকর এলডিএল কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমে।

আপনার খাদ্যতালিকায় যতদূর সম্ভব কমিয়ে দিন রেড মিট অর্থাৎ গরু ছাগল মহিষ ভেড়া ইত্যাদির গোশত। এর বদলে খান সামুদ্রিক মাছ। ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড সমৃদ্ধ বলে এটি আপনার মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ডের জন্যে উপকারী। এন্টি-অক্সিডেন্টযুক্ত পর্যাপ্ত খাবার যেন থাকে দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায়। তাতে আপনার বার্ধক্যের গতি হবে ধীর। সেইসাথে বার্ধক্যজনিত স্মৃতিভ্রষ্টতা, পার্কিনসন্স এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি থেকে আপনি বেঁচে যাবেন।

বেশ কয়েক বছর ধরে পাশ্চাত্যসহ সারা বিশ্বেই প্রক্রিয়াজাত খাবার বিপণনের ক্ষেত্রে শুরু হয়েছে এক নতুন হুজুগ–'ফ্যাট ফ্রি'। যারা এসব কিনছেন তারা কি আদৌ জানেন যে, তারা আসলে কী খাচ্ছেন? এসব খাবারের ফ্যাট সরিয়ে তা স্বাদযুক্ত করতে এতে ব্যবহার করা হয় অতিরিক্ত চিনি, লবণ (সোডিয়াম) ও আরো অনেক কিছু, যা ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই 'ফ্যাট ফ্রি' মানেই যে খুব উত্তম খাদ্য তা মনে করার কোনো কারণ নেই, বরং এসব খাবার আপনাকে অসুস্থ ও মেদস্থূল করে তুলতে পারে।

নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন-এর একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে আপনি কতটা খাচ্ছেন তার চেয়েও কী খাচ্ছেন তা ঢের গুরুত্বপূর্ণ। চার বছর ধরে সোয়া লক্ষ মানুষের ওপর পরিচালিত

একটি গবেষণার ফলাফলে বলা হয়েছে–ফ্রেঞ্চফ্রাই, চিপ্‌স, বিভিন্ন রকম পানীয়, মিষ্টি ও প্রক্রিয়াজাত খাবার ওজন বাড়ায়। অন্যদিকে বাদাম, টক দই, তাজা ফলমূল, আঁশ-জাতীয় শাক-সব্জি এবং পূর্ণ শস্যদানা জাতীয় খাবার ওজন কমায়। খাদ্যতালিকায় এ খাবারগুলো থাকলে প্রতি গ্রাসেই আপনি পাবেন শরীরের জন্যে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও সব ধরনের খাদ্য-উপাদান। আর আঁশসমৃদ্ধ খাবার পাকস্থলীতে দীর্ঘক্ষণ থাকে বলে এটি তুলনামূলক ধীরে হজম হয়। তাই ক্ষিদেও লাগে একটু দেরিতে। এ কারণে মূল খাবারের কিছুটা আগে কোনো একটি ফল ও মুঠোভর্তি বাদাম খেয়ে নিন। ক্যালরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন খুব সহজেই।

ওজন নিয়ন্ত্রণ ও সর্বোপরি সুস্থতার জন্যে ব্যায়ামের ভূমিকা নিয়ে আর নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। যুক্তরাষ্ট্রের 'সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন'-এর মতে, সপ্তাহে নিদেনপক্ষে ১৫০ মিনিট ব্যায়াম সুস্থতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। যেমন, প্রতিদিন অন্তত ২০ মিনিট করে হাঁটা। কিংবা জগিংও চলতে পারে। ওজন নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি এটি পরিপাকতন্ত্রকেও শক্তিশালী করে তুলবে।

আসলে সুস্থ দেহ, পরিমিত ওজন ও রোগমুক্ত সুন্দর জীবনের জন্যে আমাদের অনেক কঠিন কিছু করার প্রয়োজন নেই বরং ছোট ছোট কিছু পদক্ষেপ নিলেই আমাদের জীবন হয়ে উঠতে পারে চমৎকার ছন্দময় ও কর্মমুখর; তা হলো–প্রাকৃতিক খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হোন, পরিমিত খান এবং নিয়মিত ব্যায়াম করুন।

তথ্যসূত্র : টাইম ম্যাগাজিন (১২ সেপ্টেম্বর ২০১১)

বিস্ময়কর সব্জি-রাজ্য

'মানবস্বাস্থ্যের জন্যে এবং পৃথিবীতে মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে নিরামিষাশী হওয়ার থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না।' কালজয়ী বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের কথা এটি। বলেছিলেন তা-ও প্রায় দেড়শ বছরেরও বেশি সময় আগে। কিন্তু কেন? বিজ্ঞানীর দর্শন-চেতনায় খাবারদাবার ঢুকে পড়ার রহস্যটাই-বা কী? বোধ করি, একবিংশ শতাব্দীর ভুল খাদ্যাভ্যাসজনিত স্বাস্থ্য-দুর্যোগ তিনি কিছুটা আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন।

গবেষণায় দেখা গেছে, উন্নত অনুন্নত দেশ নির্বিশেষে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ ফলমূল ও সব্জির পুষ্টিগুণের উপযোগিতা সম্পর্কিত তথ্যের বাস্তব প্রয়োগ তাদের জীবনে ঘটাতে পারছেন না, ফলে সারা পৃথিবীতে প্রায় ১০০ কোটি মানুষের ওজন এখন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে পুষ্টিবিজ্ঞানীদের পরামর্শ হলো, প্রচুর শাক-সব্জি ও ফলমূল খান। বেছে নিন প্রক্রিয়াজাত ও প্যাকেটজাত খাবারের তুলনায় তাজা খাবার। আর যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলুন 'রেড মিট' বা গরু খাসি মহিষ ভেড়া ইত্যাদি প্রাণীর মাংস।

তবে শুধু শাক-সব্জি ফলমূল খেলেই হবে না, কোন ফল বা সব্জি খেতে হবে বা কতটুকু খাবো সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, একটি কলায় মোট ১২০ ক্যালরি আছে, যা দুটো রুটির মোট ক্যালরির সমপরিমাণ। পেঁপে পেয়ারা কামরাঙা আমলকিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন এ, বি ও সি এবং সেইসাথে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম।

ঢেঁড়সে আছে প্রচুর আঁশ, যা হজমে সহায়ক। মরিচে আছে ভিটামিন সি। গাজর ও অন্যান্য হলুদ সব্জি যেমন : মিষ্টি কুমড়ায় রয়েছে ভিটামিন এ, যা চুলের কোষের পূর্ণতা আনে আর ত্বক ও চোখ ভালো রাখে। কাঁচা পেঁপে হজমে সহায়ক এবং এসিডিটি নিয়ন্ত্রণে তুলনাহীন। এতে আছে ভিটামিন এ, সি ও বি কমপ্লেক্স, এমাইনো এসিড, ক্যালসিয়াম ও আয়রন। এতে আরো আছে এন্টি-অক্সিডেন্ট, যা ত্বক ও স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী। আর সবুজ শাক হলো প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন, আঁশ এবং মিনারেলের উৎস।

দেহকোষের ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করে রোগের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ করে চলা এই ফুড-সোলজারগুলো ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা, স্ট্রোক ও ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়।

এই যে এত সব পুষ্টি, অতিরিক্ত তাপে রান্না করলে বা বেশি সেদ্ধ করলে অবশ্য সবই পণ্ড। কারণ, সব ধরনের শাক-সব্জিতেই রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু এনজাইম বা পাচক রস, যা হজমে সহায়তা করে। কিন্তু কোনো সব্জি পুরোপুরি বা অতিরিক্ত সেদ্ধ করলে সেই বিশেষ এনজাইমের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই শাক-সব্জি যতটা সম্ভব কম সেদ্ধ করুন, পারলে আধা সেদ্ধ করে খাওয়ার অভ্যাস করুন। এছাড়াও সব্জি ধুয়ে নিতে হবে কাটার আগে। কাটতে হবে বড় বড় টুকরো করে। আর খোসার সাথে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন। যেমন, আলুর খোসায় রয়েছে ভিটামিন বি, সি, পটাশিয়াম, আয়রন ও জিংক। ফুলকপির সবুজ পাতাগুলোয় রয়েছে ক্যালসিয়াম, আয়রন, আঁশ ও বিটা ক্যারোটিন। সুতরাং খোসা বা আবরণ এবং পাতাসহ সব্জি রান্না আপনার খাবারে যোগ করে বাড়তি পুষ্টি। আর অবশ্যই খাবারে তেল-মশলা এড়িয়ে চলুন, যতটা সম্ভব।

সমীক্ষায় দেখা যায়, ভুল খাদ্যাভ্যাস শতকরা ৮০ ভাগ হৃদরোগ ও ৯০ ভাগ ডায়াবেটিসের জন্যে দায়ী। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলেন, দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় ফল ও শাক-সব্জির প্রাচুর্য রক্তচাপ এবং কোলেস্টেরল কমাতে ওষুধের মতো একইরকম কার্যকরী। খাদ্যাভ্যাসে আঁশযুক্ত খাবার যোগ এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার বর্জন টাইপ ২ ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করে। এর সপক্ষে প্রমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে।

সবমিলিয়ে বলা যায়, আমাদের 'সব্জি রাজ্য' স্রষ্টার এমন অপূর্ব সব নেয়ামতে পরিপূর্ণ, যা দীর্ঘমেয়াদি রোগগুলোর বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ করতে যথেষ্ট। পেঁয়াজ, রসুন থেকে শুরু করে বাঁধাকপি, বরবটি এমনকি ধনেপাতা পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। প্রকৃতির এমন সব অসাধারণ উপহারগুলো অবহেলা করবেন না। চেষ্টা করুন ঘুরেফিরে সব ধরনের শাক-সব্জি খাওয়ার। পুষ্টি থাকবে অটুট।

ইংরেজ নাট্যকার ও লেখক জর্জ বার্নার্ড শ বলেছিলেন, 'খাদ্যের প্রতি যে প্রেম, এর চেয়ে বিশ্বস্ত প্রেম আর হয় না'। বটে। কিন্তু ওটা 'বিশ্বস্ত' থাকে কেবল তখনই, প্রেমটা যখন হয় শাক-সব্জি ফলমূলসহ সব ধরনের প্রাকৃতিক ও স্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতি। সে প্রেম আপনাকে দেবে সুস্থতা ও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর এক আনন্দময় দীর্ঘজীবন।

ডিম ॥ প্রতিদিনের দরকারি খাবার

ডিম খাওয়ার ব্যাপারে এক অহেতুক ভীতি কাজ করে অনেকের মধ্যেই। কোলেস্টেরল বেড়ে যেতে পারে, ওজন বাড়তে পারে ইত্যাদি নানা শঙ্কা। হৃদরোগীদের ভয়টা এক্ষেত্রে আরো বেশি। কিন্তু ইদানীংকালের কিছু গবেষণার ফলাফল ডিম সম্পর্কে পুষ্টিবিজ্ঞানীদের এতদিনের ধারণাকে পাল্টে দিতে শুরু করেছে। ফলে ডিম যে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকার একটি অপরিহার্য অংশ হতে পারে, তা-ই আবার প্রমাণিত হলো।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বার্কলে ওয়েলনেস লেটার'-এর (মার্চ ২০০৮) একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, ডিম বেশিরভাগ লোকের ক্ষেত্রেই কোলেস্টেরল বৃদ্ধির কারণ নয়। কোনো কোনো দিক থেকে এটি বরং হৃৎপিণ্ডের জন্যে উপকারী। কারণ, আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট বা অসম্পৃক্ত চর্বির পাশাপাশি এতে রয়েছে ভিটামিন বি ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান। নিয়মিত ডিম খাওয়া চোখের জন্যেও বিশেষ উপকারী।

১৯৯৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত একটি স্বাস্থ্য-গবেষণায় অংশ নেন ১,২০,০০০ মানুষ। তাতে দেখা যায়, যারা সুস্থ অর্থাৎ যাদের রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ স্বাভাবিক পর্যায়ে রয়েছে তারা প্রতিদিন একটি করে ডিম খেতে পারেন। এতে করোনারি হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে না। কানেকটিকাট বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণায়ও একই ফল পাওয়া গেছে।

২০০৬-এ জার্নাল অব নিউট্রিশন সাময়িকীতে বলা হয়েছে, যারা সপ্তাহে ছয়টি করে মোট ১২ সপ্তাহ নিয়মিত ডিম খেয়েছেন, তাদের চোখে ম্যাক্যুলার পিগমেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, যা চোখকে সূর্যরশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে। এছাড়াও ডিমের হলুদ অংশে রয়েছে স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী কোলিন (choline), গর্ভস্থ শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশে যার রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। গবেষকরা বলছেন, ডিমে রয়েছে আরো কিছু প্রয়োজনীয় উপাদান, যা ক্যান্সার ও উচ্চ রক্তচাপ রোধে সহায়ক এবং তার পাশাপাশি সেগুলো শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে উদ্দীপ্ত করে ও এন্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবেও কাজ করে।

আমেরিকান হার্ট এসোসিয়েশনের হিসাব অনুযায়ী, খাবার থেকে প্রতিদিন আপনার মোট কোলেস্টেরল গ্রহণের সীমা হচ্ছে ৩০০ মিগ্রা। তবে, করোনারি হৃদরোগ থাকলে কিংবা এর অন্য কোনো ঝুঁকি (যেমন : ডায়াবেটিস, উচ্চ কোলেস্টেরল, হৃদরোগের পারিবারিক ইতিহাস, ধূমপান ইত্যাদি) থাকলে দৈনিক কোলেস্টেরল গ্রহণের মাত্রা ২০০ মিগ্রা-এর মধ্যেই সীমিত রাখা চাই। এসব ক্ষেত্রে ডিম খাওয়া উচিত চিকিৎসকের পরামর্শে।

উল্লেখ্য, একটি ডিমে কোলেস্টেরলের পরিমাণ ১৮৬ মিগ্রা যার প্রায় পুরোটাই থাকে ডিমের হলুদ অংশে। আর এর সাদা অংশটি মূলত প্রোটিন। তাই দিনে একটি ডিমের পুরোটা খেলে আপনার অন্যান্য খাবারের প্রতি মনোযোগী হোন। খেয়াল করুন, অন্য কোনো খাবারের মধ্য দিয়ে অতিরিক্ত কোলেস্টেরল গ্রহণ করছেন কি না।

ডিমের হলুদ অংশটি যে কেবল কোলেস্টেরল দিয়েই ভরপুর তা নয়, বরং ওতে রয়েছে বিটা-ক্যারোটিনের গুণাবলি সমৃদ্ধ ল্যুটিন ও জিয়্যাক্সানথিন, যা চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এ উপাদান দুটি বার্ধক্যজনিত চক্ষুরোগ ম্যাক্যুলার ডিজেনারেশন প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে।

ডিমের হলুদ অংশ, বিভিন্ন প্রাণীর মাংস ও লিভার, ননীযুক্ত দুগ্ধজাত খাদ্য এবং লাল মাংস (গরু মহিষ খাসি ভেড়া ইত্যাদি) কোলেস্টেরলের প্রধানতম উৎস। অনেকে আছেন যারা মেদস্থূলতার ভয়ে ডিম এড়িয়ে চলেন ঠিকই, কিন্তু ক্রিম-পনির, পেস্ট্রি ইত্যাদি ফাস্টফুড খেয়ে থাকেন হরদম। এসব খাবার ক্ষতিকর স্যাচুরেটেড ফ্যাট বা সম্পৃক্ত চর্বিতে ভরা, যার পরিমাণ ডিমে

বিদ্যমান কোলেস্টেরল ও সম্পৃক্ত চর্বির (১.৫ গ্রাম) তুলনায় অনেক বেশি। শুধু তা-ই নয়, ম্যাকডোনাল্ডস উৎপাদিত ডিম ও পনির মিশ্রিত বিস্কুটে কেবল সম্পৃক্ত চর্বির পরিমাণই ১১ গ্রাম। অন্যদিকে ডিমের অসম্পৃক্ত চর্বি শরীরের জন্য উপকারী।

আবার সচেতনতার অভাবে ডিম খাওয়ার ধরন নিয়েও আছে নানা বিপত্তি। অনেকেই বাটার অয়েল, মাখন বা অতিরিক্ত তেলে ভেজে কিংবা সসেজ দিয়ে ডিম খেয়ে থাকেন। কিন্তু এগুলোতে থাকা সম্পৃক্ত চর্বি রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। তাই একটা বয়সের পর ডিম সেদ্ধ করে খাওয়াটাই শরীরের জন্যে উপকারী ও নিরাপদ বলে মনে করছেন গবেষকরা। কারণ, তাতে রক্তে অতিরিক্ত কোলেস্টেরল বাড়ার ভয় থাকে না। সেক্ষেত্রে অবশ্যই তা হতে হবে পূর্ণ সেদ্ধ। আধা সেদ্ধ বা হালকা সেদ্ধ নয়।

একটি বড় আকারের ডিমে প্রোটিন রয়েছে ছয় গ্রাম। ডিমের হলুদ অংশ জিংক ও ভিটামিন বি-এর একটি বড় উৎস। আর ভিটামিনের পরিমাণ ডিমের সাদা অংশের তুলনায় হলুদ অংশে অনেক বেশি। যেমন, ডিমে ভিটামিন এ, ডি ও ই-এর প্রায় সমস্তটাই রয়েছে হলুদ অংশে। সাথে আছে আয়রন ফসফরাস ম্যাঙ্গানিজ আয়োডিন কপার ক্যালসিয়াম পটাসিয়াম সোডিয়াম ও সালফার। আর প্রকৃতিগতভাবেই ভিটামিন ডি রয়েছে, এমন অল্প কিছু খাদ্যের মধ্যে ডিমের হলুদ অংশ অন্যতম।

'ডিম স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো, না মন্দ'–এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা পুষ্টিবিজ্ঞানী ড. ওয়াল্টার উইলেটকে। তিনি বলেন, ডিমে কোলেস্টেরল-জাতীয় উপাদান থাকলেও এর অন্যান্য স্বাস্থ্যকর গুণ অনেক বেশি। তার মতে, সুস্থ একজন মানুষের ক্ষেত্রে পরিমিত মাত্রায় অর্থাৎ দিনে একটি ডিম খেতে কোনো অসুবিধা নেই।

ডিম সংরক্ষণটাও গুরুত্বপূর্ণ। ডিম ফ্রিজে সংরক্ষণ করাই ভালো। কারণ, ফ্রিজে এক সপ্তাহ রাখলে ডিম যতটা না বুড়িয়ে যায়, স্বাভাবিক তাপমাত্রায় একদিন রাখলে বুড়িয়ে যায় তার চেয়ে বেশি।

তথ্যসূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া (২৭ ডিসেম্বর, ২০১৩)
হাফিংটন পোস্ট (৩০ মার্চ, ২০১৩)
মাসিক গণস্বাস্থ্য (আগস্ট ২০০৮)
ডিসকভারি হেলথ (১৭ এপ্রিল, ২০০৬)

আলু খান ভালো থাকুন
ভাতের পাশে আলু রাখুন

স্থূলতার আশঙ্কা কমিয়ে, রক্তচাপের ঝুঁকি এড়িয়ে সজীব সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে চান? কিছু অর্থ সাশ্রয় হলে কি এই দুর্মূল্যের বাজারে আপনার সুবিধা হয়? একইসাথে আপনি কি জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে আগ্রহী? আপনি কিন্তু কেবল একটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই এ সবগুলো কাজ করতে পারেন। সেটি হলো, ভাত বা আটার পাশাপাশি প্রধান খাদ্য হিসেবে আলুকে আপনার দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় স্থান দেয়া।

আর এ কাজটা আপনি করতে পারেন আপনার পছন্দমতো যেকোনো পন্থায়। যেমন, দিনের যেকোনো এক বেলায় ভাত/ রুটির বদলে আলু খেয়ে অথবা প্রতিবেলায় ভাত/ রুটির পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে সেখানে আলুকে জায়গা করে দিয়ে।

সুস্বাস্থ্য আনে আলু

স্থূলতা রোধ : আলুতে স্নেহজাতীয় উপাদান (ফ্যাট), শর্করা এবং খাদ্যবল (ক্যালরি) চাল ও গমের চেয়ে অনেক কম। তাই যারা স্থূলদেহী কিংবা মুটিয়ে যাওয়ার ভয়ে ভীত অথবা কায়িক শ্রম খুব কম করেন এবং সে কারণে কম ক্যালরি গ্রহণ করতে চান, তাদের জন্যে ভাত বা আটার বদলে আলু খাওয়া ভালো। কারণ, সমপরিমাণ আলুতে শর্করার পরিমাণ চাল/ গমের এক-তৃতীয়াংশ। এছাড়াও চাল ও গমের তুলনায় আলুতে ফ্যাটের পরিমাণ অনেক কম। আলু থেকে উৎপন্ন ক্যালরি চাল/ গম থেকে উৎপন্ন ক্যালরির প্রায় তিনভাগের একভাগ।

বিভিন্ন রোগ ও ক্যান্সার প্রতিরোধক : প্রায় ৬০ ধরনের ফাইটোকেমিক্যাল ও ভিটামিনের সন্ধান পাওয়া গেছে আলুতে, যা হৃদরোগ, শ্বাসতন্ত্রের রোগ এবং দু-এক ধরনের ক্যান্সারের প্রতিরোধক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

রক্তচাপ কমায় : যুক্তরাজ্যের ইনস্টিটিউট অব ফুড রিসার্চ-এর বিজ্ঞানীরা কোকোয়ামিনস নামের এক ধরনের উপাদানের সন্ধান পেয়েছেন আলুতে। এটি রক্তচাপ কমাতে সক্ষম। এক ধরনের চীনা ভেষজ গাছ ছাড়া এ উপাদান আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিজ্ঞানীদের জানা ছিলো না।

তারুণ্য ধরে রাখে : আলুতে আছে নানা ধরনের ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট, যা এন্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবেও কাজ করতে পারে। এন্টি-অক্সিডেন্ট হলো এমন একটি রাসায়নিক উপাদান যা মুখের বলিরেখা কমায়, বয়সের ছাপ পড়তে বাধা দেয় সর্বোপরি তারুণ্যকে দীর্ঘস্থায়ী করে। দেহকোষকে কর্মক্ষম রাখতে পারে দীর্ঘদিন। শরীর থাকে সজীব ও তরুণ। এন্টি-অক্সিডেন্ট ক্যান্সার প্রতিরোধেও ভূমিকা রাখে।

এছাড়া আলুতে রয়েছে ভিটামিন সি। সাধারণত, রান্না করা হলে ভিটামিন সি গুণাগুণ হারিয়ে ফেলে। তবে পুষ্টিবিদদের মতে, ঢাকনা দিয়ে ঢেকে খোসাসহ সেদ্ধ করলে আলুর ভিটামিন সি প্রায় অক্ষত থাকে। ভিটামিন বি ৬ও পাওয়া যায় আলুতে। মস্তিষ্ক ও দেহকোষ তৈরিতে এবং স্নায়ুতন্ত্রের সক্ষমতায় ভিটামিন বি ৬-এর ভূমিকা রয়েছে। উল্লেখ্য, ভিটামিন সি চাল বা গমে নেই।

আলু সহজপাচ্য, হজমে কোনো অসুবিধা হয় না। খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে আলুকে প্রধান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করলে তাই কোনো সমস্যা নেই– এমনই অভিমত পুষ্টিবিদদের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, মেদস্থূল মানুষদের স্বল্প ক্যালরিযুক্ত খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। সেদিক থেকে আলু বেশ ভালো আর উপযোগী একটি খাদ্য। ডায়াবেটিক রোগী ছাড়া আর কারো ক্ষেত্রে ভাতের বিকল্প হিসেবে আলু খাওয়ায় কোনো সমস্যা নেই। ভাত বা রুটির পাশাপাশি যিনি যেভাবে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন সেভাবে আলু খাওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

সমৃদ্ধ হবে আমাদের জাতীয় অর্থনীতি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ হোসেন জানান, সাধারণভাবে আলুর হেক্টর প্রতি উৎপাদন প্রায় ২৫ টন। উৎপাদন খরচ প্রায় এক লাখ টাকা আর এর বিক্রয় মূল্য সোয়া দুই লাখ থেকে আড়াই লাখ টাকা। অর্থাৎ হেক্টর প্রতি মুনাফা সোয়া এক লাখ থেকে দেড় লাখ টাকা। অন্যদিকে ধানে

হেক্টর প্রতি উৎপাদন প্রায় চার টন। খরচ ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা ও বিক্রয়মূল্য ৮০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা। অর্থাৎ মুনাফা ৫০ থেকে ৭০ হাজার টাকা। এর মানে আলু চাষে ধানের তুলনায় দ্বিগুণ-তিনগুণ মুনাফা।

নিয়মিত আলু খেয়ে আপনি বাজারে যে চাহিদার সৃষ্টি করবেন তা কৃষককে উৎসাহিত করবে আলু চাষে। আর কৃষকের আর্থিক সমৃদ্ধির মাধ্যমে সমৃদ্ধ হবে জাতীয় অর্থনীতি।

অর্থ সাশ্রয় : যারা স্থূলদেহী বা স্থূলতার আশঙ্কায় ভুগছেন কিংবা প্রতিদিন যে পরিমাণ ক্যালরি গ্রহণ করা উচিত তার চেয়ে বেশি গ্রহণ করে ফেলছেন, রসনা-সংযমের অভাবে নয়তো দৈহিক পরিশ্রম স্বল্পতার কারণে চাইছেন খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করতে, তারা অবলীলায় আলুকে বেছে নিতে পারেন চাল বা আটার বিকল্প হিসেবে। আবার এর মাধ্যমে আপনি অর্থ সাশ্রয়ও করতে পারেন।

যেমন, আপনি যদি আপনার পরিবারের সবাইকে নিয়ে মাসে ১৫ কেজি চালের পরিবর্তে ১৫ কেজি আলু খান (দৈনিক আধা কেজি হিসেবে) তাহলে যে অর্থ আপনি সাশ্রয় করতে পারবেন সেটি পরিবারের জন্যে সঞ্চয় করতে পারেন অথবা এ অর্থ দিয়ে মাসে চার-পাঁচ ডজন ডিম নয়তো ছয়-সাত লিটার দুধ বেশি খেতে পারেন। অর্থাৎ আরো পুষ্টিসমৃদ্ধ করতে পারেন নিজেকে, নিজের পরিবারকে। কিংবা দান করতে পারেন আপনার মাটির ব্যাংকে, যা সঙ্ঘবদ্ধভাবে ব্যয় হবে বঞ্চিতের সেবায়।

গত কয়েক বছরে একাধিকবার বন্যা ও সিডরের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ধানের পাতার রোগ, আন্তর্জাতিক বাজারে চাল ও খাদ্য সংকট, চাল নিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার যন্ত্রণা, সর্বোপরি চালের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি নানা ঘটনা আমাদের যে বার্তাটি দিতে চাইছে সেটি হলো– শুধু ধান/ গমের ওপর নির্ভর করে থাকার মতো নির্বুদ্ধিতার দিন শেষ। চাই বিকল্প সন্ধান।

তাছাড়া আলু চাষে অল্প জমিতে অধিক ফলন এবং অধিক মুনাফা, যা আমাদের মতো উন্নয়নশীল, ঘনবসতিপূর্ণ এবং ক্রম-হ্রাসমান কৃষি জমিসম্পন্ন দেশের জন্যে অত্যন্ত উপযোগী।

তাই সুস্বাস্থ্যের জন্যে, অর্থ সাশ্রয় করতে, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতিতে পরিণত হতে এবং সর্বোপরি জাতীয় অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি আনতে ভাত/ আটার পাশাপাশি প্রধান খাদ্য হিসেবে আলুকে স্থান দেয়ার বিকল্প নেই। আর দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় এ সামান্য রদবদলটুকু করে অনেকগুলো অর্জনকে আমরা আনতে পারি আমাদের হাতের মুঠোয়।

মিষ্টি আলু : বহুমুখী পুষ্টির অনন্য উৎস

ভাবুন তো, জনমানবহীন বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে আটকে পড়েছেন আপনি একা। কখন উদ্ধার পাবেন, তা-ও জানা নেই। উদ্ধারকারী দল এসে পৌঁছাতে যত দেরিই হোক–একটি খাবার কিন্তু আপনাকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ড. স্ট্যানলি কেস বলেন, সে খাবারটি হলো মিষ্টি আলু, যা একাই আপনাকে সর্বোচ্চ সময় বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম। বহুমুখী পুষ্টিবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এ খাদ্যটি তার স্বাস্থ্যপ্রদ গুণের কারণে পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই প্রধান খাদ্য হিসেবে বিবেচিত।

মিষ্টি আলু স্বাস্থ্যের জন্যে অনেক দিক থেকেই উপকারী। প্রতি গ্রাম মিষ্টি আলুতে রয়েছে গোল আলু বা অন্যান্য আলুর চেয়ে বেশি পরিমাণ আয়রন। ভিটামিন এ, ভিটামিন ই, সেইসাথে আঁশ এবং বিটা-ক্যারোটিনের মতো এন্টি-অক্সিডেন্টের এক দারুণ উৎস এ মিষ্টি আলু। উল্লেখ্য, বিটা-ক্যারোটিনের সাহায্যে শরীর নিজেই ভিটামিন তৈরি করতে পারে।

পুষ্টিমান নিশ্চিত করতে শুষ্ক ও শীতল স্থানে মিষ্টি আলু সংরক্ষণ করুন। আর কাঁচা মিষ্টি আলু কখনোই ফ্রিজে রাখবেন না। তাতে এর ফ্লেভার নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

আলু চাল ও গমের খাদ্য উপাদানের তুলনা

খাদ্য উপাদান (২৫০ গ্রাম)	আলু	চাল	গম
খাদ্যবল (কিলোক্যালরি)	২৪২.৫	৮৬৫	৯০০
কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা (গ্রাম)	৫৬.৫	১৯৮	১৭৪
ফ্যাট বা স্নেহ (গ্রাম)	০.২২৫	১.০	৪.৩
প্রোটিন বা আমিষ (গ্রাম)	৪	১৬	৩০
ফাইবার বা আঁশ (গ্রাম)	১.০৭৫	০.৫	৪.৮
ক্যালসিয়াম (মিলিগ্রাম)	২৫	২৩	১২০
ফসফরাস (মিলিগ্রাম)	১০০	৩৫৮	১০৬৫
আয়রন বা লৌহ (মিলিগ্রাম)	২	৮	৮
ভিটামিন এ (মাইক্রোগ্রাম)	৬০	০	৭৩
ভিটামিন সি	১৪৩	০	০

তথ্যসূত্র : হেলথ এন্ড নিউট্রিশন, ডেইলি মেইল অনলাইন (১৬ আগস্ট, ২০০৯)

মাশরুম ॥
হতে পারে প্রাণীজ আমিষের বিকল্প

ইদানীংকালে যে খাবারটি জীববিজ্ঞানী ও পুষ্টিবিদদের আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছে, সেটি হলো মাশরুম। কারণ, একাধিক উপকারী ভূমিকার পাশাপাশি এটি মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিতে পারে বহুগুণ। বিজ্ঞানীরা বলছেন–মাংস, পনির ইত্যাদি প্রাণীজ খাবারের সমান প্রোটিন রয়েছে মাশরুমে। উচ্চ প্রোটিন ছাড়াও এতে রয়েছে প্রয়োজনীয় কিছু খনিজ উপাদান, ভিটামিন ও বার্ধক্য প্রতিরোধী এন্টি-অক্সিডেন্ট।

যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা মেডিকেল স্কুলের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, মাশরুমে রয়েছে এসপিরিন-সদৃশ কিছু বৈশিষ্ট্য, যা হৃদরোগ ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমায়। শীতকালীন ফ্লু প্রতিরোধেও মাশরুমের ভূমিকা রয়েছে। এটি কমায় গেঁটেবাতের ঝুঁকি।

শুধু তা-ই নয়, চীনের ঐতিহ্যবাহী কিছু প্রচলিত চিকিৎসাপদ্ধতিতে ফুসফুসের ক্যান্সার নিরাময়ে অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয় মাশরুম। চীনের এই ধারার চিকিৎসকদের মতে, মাশরুম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারে, পারে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মহিলার সাপ্তাহিক খাদ্যতালিকায় মাশরুম ছিলো তাদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি নেমে এসেছে তুলনামূলক অর্ধেকে।

ক্যান্সার চিকিৎসার একটি অন্যতম অনুষঙ্গ কেমোথেরাপি। এর অবধারিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া। কেমোথেরাপির কারণে রোগ প্রতিরোধ শক্তি কমে যাওয়া ঠেকাতে মাশরুমকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয় চীনে।

গবেষকদের পরামর্শ হলো, সম্পূরক বা বিকল্প খাদ্য হিসেবে নয়, মাশরুম খেতে পারেন মূল খাদ্য হিসেবে। স্বাদ ও গুণগত মান বজায় রাখতে রান্নার সময় বেছে নিন তাজা মাশরুম, যেগুলোতে কোনো দাগ কিংবা স্যাঁতসেঁতে ভাব নেই। রান্নার আগে মাশরুম ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন।

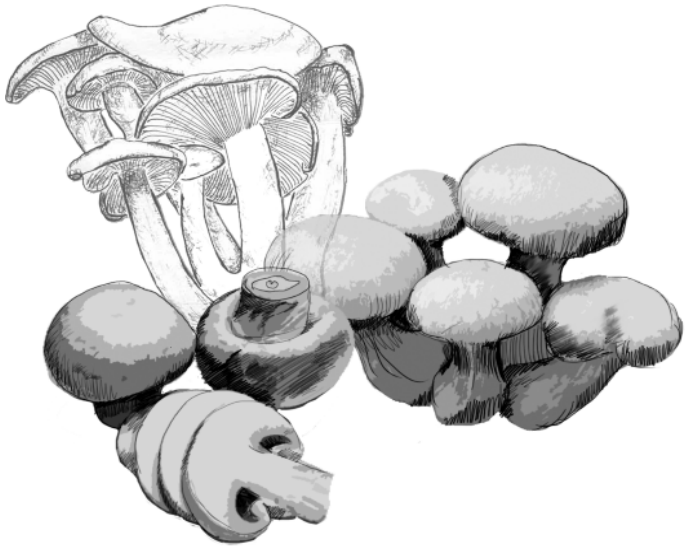

কাঁচা মাশরুম খাবেন না কখনোই। কারণ, মাশরুমের আবরণ সহজপাচ্য নয়। এছাড়াও কাঁচা মাশরুমে এমন কিছু উপাদান আছে, যা পরিপাকতন্ত্রের এনজাইম বা পাচকরসকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। তাই কাঁচা মাশরুম খেয়ে এর পুষ্টিগুণের প্রায় কিছুই আপনি পাবেন না। এছাড়া প্রচলিত পদ্ধতিতে উৎপাদিত মাশরুমে কিছু ক্ষতিকর উপাদানও থাকতে পারে। তাই মাশরুম রান্না করে খাওয়াটা সবদিক থেকেই নিরাপদ ও পুষ্টিমানসম্পন্ন।

তবে ওষুধ হিসেবে নিজের ইচ্ছেমতো মাশরুম খাওয়া আর প্রক্রিয়াজাত মাশরুম খাওয়ার ব্যাপারে সচেতনতা অপরিহার্য। কারণ, ওষুধ হিসেবে যা আপনি খাচ্ছেন, সেটি উপকারী নাকি বিষাক্ত ও ক্ষতিকর মাশরুম থেকে প্রস্তুতকৃত তার নিশ্চয়তা জরুরি। এছাড়াও মাশরুমজাত ওষুধের ডোজ ও খাওয়ার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের সুস্পষ্ট নির্দেশনা নিয়ে খাওয়াই ভালো।

তথ্যসূত্র : হেলথ এন্ড নিউট্রিশন

সয়াবিন ॥
প্রকৃতির এক অমূল্য খাদ্য-উপাদান

সাম্প্রতিক সময়ে যে কয়েকটি খাদ্য-উপাদান নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে, সয়াবিন তার মধ্যে অন্যতম। সয়াবিন আমাদের কাছে ভোজ্য তেলের উৎস হিসেবে পরিচিত হলেও, নানা গবেষণা ও তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা একে একটি পুষ্টিকর খাদ্য-উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

সয়াবিন হতে পারে দৈনন্দিন পুষ্টির চমৎকার উৎস। বিজ্ঞানীরা বলছেন– এটি হৃদরোগ, স্তন ক্যান্সার, প্রোস্টেট ক্যান্সার, বার্ধক্যজনিত হাড়ক্ষয় বা অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধ করতে সক্ষম। মস্তিষ্কের ক্ষমতা এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতেও সয়াবিনের ভূমিকা খুঁজে পেয়েছেন গবেষকরা। শুধু তাই নয়, গুঁড়োদুধে মেলামিন সংক্রান্ত জটিলতার পর সয়াদুধকে গরুর দুধের অন্যতম বিকল্প হিসেবে রায় দিয়েছেন দেশি-বিদেশি চিকিৎসকরা।

হরেক উপকারিতা সয়াবিনে

গবেষণায় দেখা গেছে, সয়াবিন প্রোটিনের একটি সমৃদ্ধ উৎস। শরীরের জন্যে প্রয়োজনীয় আটটি এমাইনো এসিড রয়েছে এতে। এছাড়া সয়াবিন থেকে তৈরি খাবার ও সয়াদুধে রয়েছে কোলেস্টেরলমুক্ত অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড এবং হৃৎস্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী ওমেগা-৩।

সয়াতে বার্ধক্য ও রোগ-প্রতিরোধী বিভিন্ন এন্টি-অক্সিডেন্ট ছাড়াও ভিটামিন বি, ফলেট ও আয়রনের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন পুষ্টিবিজ্ঞানীরা। এতে আরো আছে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান। সাথে প্রচুর ফাইবার বা আঁশ তো আছেই।

উচ্চ কোলেস্টেরল, হৃদরোগ আর স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়

রক্তের মাত্রাতিরিক্ত কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমানোর ক্ষেত্রে সয়াবিনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার প্রমাণ পেয়েছেন গবেষকরা। নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন-এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধে বলা হয়েছে, শরীরের জন্যে ক্ষতিকর

অতিরিক্ত এলডিএল কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের পরিমাণ কমাতে সয়া প্রোটিন বেশ কার্যকরী–অন্য যেকোনো প্রাণীজ প্রোটিনের চেয়ে। আর এটি বাড়ায় হিতকরী কোলেস্টেরল এইচডিএল-এর পরিমাণ।

কোলেস্টেরল সংক্রান্ত সয়া প্রোটিনের এ ভূমিকা এখন স্বীকৃত এবং বেশ কয়েকটি স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রমাণিত। আর এভাবে করোনারি হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে সয়াবিন।

কমায় ক্যান্সারের ঝুঁকি

এশিয়ার দেশগুলোতে মহিলাদের স্তন ক্যান্সার ও পুরুষদের প্রোস্টেট ক্যান্সারের হার তুলনামূলক কম। এর সাথেও রয়েছে সয়াবিনের যোগসূত্র। চীনে চৌদ্দশ স্তন ক্যান্সার রোগীর কেস-স্টাডি পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, বয়ঃসন্ধিকালে যারা সপ্তাহে অন্তত একবার সয়াজাত খাবার খেয়েছেন, পরবর্তীতে তাদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে গেছে উল্লেখযোগ্য হারে।

পূর্ণবয়স্কদের মধ্যেও যারা সয়াজাত খাবারে অভ্যস্ত তাদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে ৪৭ শতাংশ। স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রে সয়াজাত খাদ্যের ভূমিকা নিয়ে ১৯৭৮ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত পরিচালিত মোট ১৮টি গবেষণা রিপোর্টের ভিত্তিতে এ তথ্য দিয়েছেন গবেষকরা।

উন্নত দেশগুলোতে দিন দিন বেড়ে চলেছে প্রোস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্তের পরিমাণ। এর মধ্যে ব্যতিক্রম জাপান। জাপানে প্রোস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্তের হার অন্যান্য ধনী দেশগুলোর তুলনায় বিস্ময়করভাবে কম। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে, এর পেছনে সয়াবিনের ভূমিকাই মুখ্য। কারণ, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের তুলনায় জাপানে সয়াজাত খাবারের প্রচলন বেশি।

এছাড়াও অতিভোজন এবং অতিরিক্ত আমিষ সমৃদ্ধ খাবারকে প্রোস্টেট ক্যান্সারের কারণ হিসেবে উল্লেখ করে গবেষকরা এটি প্রতিরোধে সয়াবিনের পাশাপাশি পূর্ণ-শস্যদানা জাতীয় খাবার, বিভিন্ন ধরনের বীজ থেকে আহরিত তেল ও বাদাম খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

স্মৃতিশক্তি বাড়ে

সয়াবিন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতিশক্তি বাড়ায়। শুধু তা-ই নয়, সুবিন্যস্ত কর্মপরিকল্পনার জন্যে প্রয়োজনীয় মানসিক দক্ষতা ও উদ্যম বৃদ্ধিতেও সয়াবিন সহায়ক। লন্ডন কিংস কলেজের সেন্টার ফর নিউরোসায়েন্স-এ ছাত্রদের ওপর পরিচালিত এক গবেষণায় বিজ্ঞানীরা এর প্রমাণ পেয়েছেন। তাদেরকে

প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণ সয়াজাত খাবার দিয়ে দেখা গেছে, ১০ সপ্তাহ পর তাদের স্মৃতিশক্তি বেড়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে। তাদের কর্মপরিকল্পনার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা গেছে তুলনামূলক বেশি দক্ষতা।

হাড়ক্ষয় রোধ করে

বার্ধক্যজনিত কিছু সমস্যা সমাধানেও রয়েছে সয়াবিনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। এর মধ্যে একটি হলো অস্টিওপোরোসিস বা হাড়ক্ষয়। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন ৪০ গ্রাম সয়া প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার হাড়ক্ষয় প্রতিরোধের পাশাপাশি কোমরের হাড়ের ঘনত্ব বাড়ায়। ইউরোপিয়ান জার্নাল অব নিউট্রিশন-এ প্রকাশিত একটি গবেষণা রিপোর্টে এ তথ্য পাওয়া যায়। এতে দেখা যায়, খাবারে সয়া প্রোটিনের পরিমাণ যত বেড়েছে, কোমর ও উরুর হাড়ক্ষয় তত কমেছে।

মেনোপজ পরবর্তী জটিলতা রোধ করে সয়াবিন

মেনোপজ বা রজঃনিবৃত্তির পর মহিলারা সাধারণত যে সমস্যাগুলো অনুভব করেন, এর হার পশ্চিমা দেশগুলোর তুলনায় জাপানে অনেক কম। দৈনন্দিন খাবারে পর্যাপ্ত সয়া প্রোটিনের উপস্থিতিই এর অন্যতম কারণ। এসময় বিব্রতকর হটফ্লাশসহ মেনোপজ-পরবর্তী অন্যান্য জটিলতাগুলোও তাদের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম।

শুধু তা-ই নয়, মেনোপজ হয়ে যাওয়া মহিলাদের ক্ষেত্রে সয়া প্রোটিনকে এখন হরমোন প্রতিস্থাপন চিকিৎসার (এইচআরটি) বিকল্প হিসেবেও ভাবা হচ্ছে। কারণ সয়াবিনে থাকা ফাইটোইস্ট্রোজেন-এ মহিলাদের প্রজনন হরমোন ইস্ট্রোজেন-সদৃশ কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছেন গবেষকরা।

পুষ্টিকর শিশুখাদ্যের উৎস সয়াবিন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, জন্মের পর প্রথম ছয় মাস শিশুর একমাত্র খাবার মায়ের দুধ। কিন্তু মায়ের অসুস্থতা কিংবা চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনো কারণে মাতৃদুগ্ধের বিকল্প কোনো শিশুখাদ্যের প্রয়োজন হলে সয়াবিন থেকে উৎপাদিত শিশুখাদ্যকে নিশ্চিন্তে বেছে নিতে পারেন মায়েরা।

শিশুখাদ্যের নামে বাজার ছেয়ে যাওয়া প্রক্রিয়াজাত খাবারের জঞ্জাল এড়িয়ে এসব ক্ষেত্রে সন্তানদের সয়াজাত শিশুখাদ্য খাওয়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন পুষ্টিবিজ্ঞানীরা। কারণ, একাধিক গবেষণায় তারা দেখেছেন, শিশুর শারীরিক গঠনে মায়ের দুধের কাছাকাছি বিকল্প হতে পারে সয়াদুধ ও সয়াজাত শিশুখাদ্য। শিশুর শারীরিক বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সব খাদ্য-উপাদানই রয়েছে এতে। জানা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে নবজাত শিশুর চর্মরোগ চিকিৎসায় সয়াবিন ছিলো একটি বহুল ব্যবহৃত পথ্য।

সয়াদুধ : হতে পারে গরুর দুধের বিকল্প

গুঁড়োদুধে মেলামিন আতঙ্কের পর সচেতন মা-বাবারা তাদের সন্তানদের জন্যে নিশ্চিন্তে বেছে নিতে পারেন সয়াবিন থেকে প্রস্তুতকৃত সয়াদুধ। জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগে. (অব.) ডা. আব্দুল মালিক একটি সেমিনারে সয়াদুধকে অত্যন্ত পুষ্টিকর ও গরুর দুধের বিকল্প হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, শিশুদের পাশাপাশি সব বয়সী মানুষ সয়াদুধ নিশ্চিন্তে পান করতে পারেন। সয়াদুধে রয়েছে কার্বোহাইড্রেট, ক্যালরি, প্রোটিন ও ফাইবার। আর এতে ফ্যাট নেই বলে কোলেস্টেরল বাড়ারও ভয় থাকে না।

বাজার থেকে সয়াবিন কিনে ঘরে বসে নিজেই বানিয়ে নিতে পারেন সয়াদুধ। এক কেজি সয়াবিন থেকে তৈরি করা যায় চার লিটার সয়াদুধ। এটি তাই সাশ্রয়ীও। দুধ তৈরির প্রক্রিয়াটাও খুব সহজ। সয়াদুধ থেকে তৈরি করতে পারেন পুডিং পনির সেমাই পায়েস ইত্যাদি।

সয়াদুধ তৈরির নিয়ম

২৫০ গ্রাম সয়াবিন ১২ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। এরপর তাতে এক লিটার পানি মিশিয়ে ব্লেন্ডারে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিন। ব্লেন্ডার না থাকলে পাটায় পিষে নিতে পারেন। দুধ তৈরি হলে পাতলা কাপড়ের সাহায্যে ছেঁকে নিন। এরপর জ্বাল দিয়ে নিন। সয়াদুধ গরম কিংবা ঠান্ডা যেকোনোভাবে খেতে পারেন। সয়াদুধের নিজস্ব কোনো ফ্লেভার নেই। তাই বাচ্চাদের পছন্দমতো ফল কিংবা বাদাম মিশিয়ে তৈরি করে দিতে পারেন মজাদার পানীয়।

তথ্যসূত্র : ফ্যামিলি হেলথ গাইড, হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল
নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন
ইউরোপিয়ান জার্নাল অব নিউট্রিশন

বাদাম খান প্রতিদিন আপনি ভালো থাকবেন

বাদাম। খুব সহজলভ্য একটি খাবার। বলতে গেলে, চাওয়া মাত্র আমাদের হাতের নাগালেই মেলে। শহর-বন্দর-গ্রামের প্রায় সব বাজার রাস্তাঘাট পার্কে কেউ না কেউ বাদাম চিবুচ্ছে–এটি খুব পরিচিত একটি দৃশ্য বটে, কিন্তু আমরা কজনই-বা নিয়ম করে প্রতিদিন বাদাম খাই?

অনেকে আবার আছেন, যাদের বাদাম খেতে ভয়। তাদের কথা হলো, বাদামে ফ্যাট রয়েছে প্রচুর, কীভাবে খাই? কিন্তু জানা চাই, অপকারী তো নয়ই, বরং শরীরের জন্যে দারুণ উপকারী বাদামের ফ্যাট। শুধু তা-ই নয়, বাদামে রয়েছে প্রচুর উদ্ভিজ্জ প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেল, ফাইবার এবং এন্টি-অক্সিডেন্টের মতো প্রয়োজনীয় খাদ্য-উপাদান।

পুষ্টিবিজ্ঞানীরা তাই বেশ জোরের সাথেই বলছেন, নিয়মিত বাদাম খান। স্বাস্থ্যকর আর আপাত সাধারণ এ খাবারটিই আপনার দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে যোগ করতে পারে নতুন মাত্রা, সেইসাথে হতে পারে আপনার সুস্থতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।

বাদামের ফ্যাট হৃৎবান্ধব

একটি বাদামের শতকরা ৮০ ভাগই ফ্যাট, কিন্তু এ ফ্যাটের প্রায় পুরোটাই হলো শরীরের জন্যে হিতকরী অসম্পৃক্ত চর্বি। সে তুলনায় সম্পৃক্ত চর্বির পরিমাণ এতে বেশ নগণ্য। যেমন, একটি শুকনো ভাজা চীনাবাদামে সম্পৃক্ত চর্বির পরিমাণ মাত্র দুই গ্রাম, আর অসম্পৃক্ত চর্বির পরিমাণ ১১.৪ গ্রাম।

সবাই জানেন, এইচডিএল শরীরের জন্যে উপকারী একটি কোলেস্টেরল। বাদামের অসম্পৃক্ত চর্বি একদিকে সুস্থ হৃদযন্ত্রের জন্যে প্রয়োজনীয় এই এইচডিএল-এর পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়, আবার অন্যদিকে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল এলডিএল-এর মাত্রা দেয় কমিয়ে।

বাদামে রয়েছে এল-আরজিনিন। এই এমাইনো এসিডটি আমাদের ধমনীর দেয়ালকে সবল ও নমনীয় হয়ে উঠতে সাহায্য করে। এছাড়াও এটি

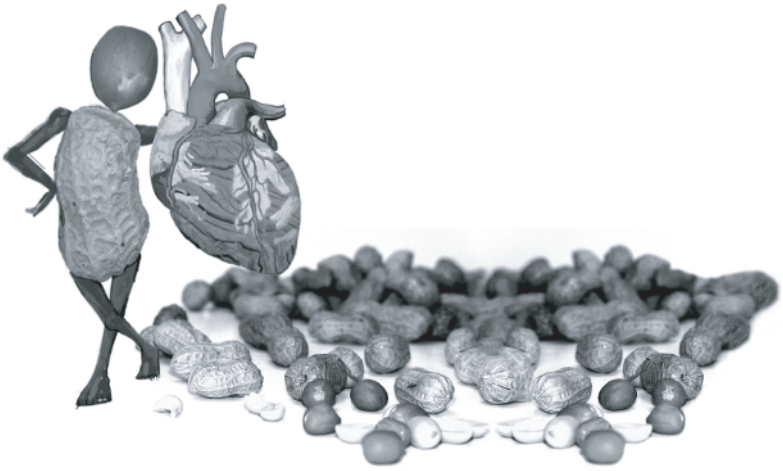

ধমনীর অভ্যন্তরে অযাচিত রক্ত জমাটবদ্ধতা (Blood Clot) রোধ করে। ফলে ধমনী-পথে স্বাভাবিক রক্ত চলাচল অব্যাহত থাকে এবং সেইসাথে কমে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি।

১৯৯৬ সালে আমেরিকার আইওয়া-য় একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যারা সপ্তাহে অন্তত চার বার বাদাম খেয়েছেন, তাদের হৃদরোগজনিত মৃত্যুঝুঁকি শতকরা ৪০ ভাগ কমে গেছে। এর দু-বছর পর হার্ভার্ডের স্কুল অব পাবলিক হেলথ-এর উদ্যোগে পরিচালিত একটি গবেষণায়ও পাওয়া যায় একই রকম ফলাফল। বাদাম তাই সত্যিই হৃৎবান্ধব।

উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় করে

বাদামের মধ্যে সবচেয়ে সহজলভ্য যেটি, সেই চীনাবাদামে আছে 'রেসভেরাট্রোল', যা একটি এন্টি-অক্সিডেন্ট। এর গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হচ্ছে, এটি দেহের রক্তনালীর ওপর এনজিওটেনসিন-এর কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। এতে একদিকে দেহে যেমন স্বাভাবিক রক্তচাপ বজায় থাকে, তেমনি হঠাৎ করে রক্তচাপ বেড়ে গিয়ে স্ট্রোকের ঝুঁকিও থাকে না। উল্লেখ্য, এনজিওটেনসিন হরমোনটি রক্তনালীকে সংকুচিত করার মাধ্যমে রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়।

কো-এনজাইম কিউ ১০ (Co-Q10)। এটি-ও একটি শক্তিশালী এন্টি-

অক্সিডেন্ট। হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক ও পেশির স্বাভাবিক কাজ পরিচালনা এবং খাদ্য থেকে দেহে প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদনের জন্যে এটি দরকারি। শরীর নিজেই এটি নির্দিষ্ট মাত্রায় তৈরি করে। এছাড়াও আমাদের দৈনন্দিন খাবার থেকে আমরা কো-এনজাইম কিউ ১০ পেয়ে থাকি। তারুণ্যকে দীর্ঘায়িত করার পাশাপাশি হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্তন ক্যান্সার, মাড়ির রোগ, গুরুতর পেশি সমস্যা, বন্ধ্যাত্ব, পাকস্থলীর আলসার, মাইগ্রেন ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে এর কার্যকর ভূমিকা রয়েছে বলে জানান চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা। আর বাদাম, বিশেষত চীনাবাদাম কো-এনজাইম কিউ ১০-এর একটি ভালো উৎস।

ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে বিশ্বজুড়ে এখন 'লো গ্লাইসেমিক ইনডেক্স' খাদ্যের জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর বৈশিষ্ট্য হলো, এ ধরনের খাবারগুলো খাওয়ার সাথে সাথে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা হঠাৎ করেই অনেক বেশি বেড়ে যায় না, ফলে তা বিপাকের জন্যে প্রয়োজন হয় না অতিরিক্ত ইনসুলিনের। স্বাভাবিকভাবেই তখন অগ্ন্যাশয়ের ওপর চাপ কম পড়ে, তাই অগ্ন্যাশয়ও থাকে বিকল হওয়ার ঝুঁকিমুক্ত। এতে কমে ডায়াবেটিসের আশঙ্কা। সুখের বিষয়, বাদাম এমনই একটি লো গ্লাইসেমিক ইনডেক্স সমৃদ্ধ খাবার।

তাই ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, দুক্ষেত্রেই এটি ভূমিকা রাখতে পারে। পুষ্টিবিজ্ঞনীরা সে কারণেই দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় বাদাম যোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

ওমেগা-৩ ও উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের প্রাকৃতিক উৎস

ফিস অয়েল ক্যাপসুল বা ওমেগা-৩ ক্যাপসুল নিয়ে গত কয়েক দশক থেকেই বিশ্বজুড়ে বেশ হইচই। হৃদরোগীরা তো বটেই, আরো অনেকেই হরেক রকম উপকারের আশায় এটি নিয়মিত সেবন করছেন। এটি নিয়ে ওষুধ কোম্পানিগুলোর ধুন্ধুমার ব্যবসার কথা নতুন করে আর নাই-বা বলা হলো।

কিন্তু জেনে রাখুন, ওমেগা-৩ বা ফিস অয়েল ক্যাপসুল হিসেবে আপনি যা খাচ্ছেন, আপনার হৃৎপিণ্ডের সুস্থতার সাথে এর কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। সম্প্রতি জার্নাল অব আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন (JAMA) এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে (১২ সেপ্টেম্বর, ২০১২)। তাতে খুব স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, ২০টি গবেষণা কার্যক্রমের অধীনে ৭০ হাজার মানুষের ওপর নিরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, করোনারি

হৃদরোগ, বয়সজনিত স্মৃতিভ্রম রোগ আলঝেইমার কিংবা স্ট্রোকের ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রে এর কোনোরকম ভূমিকা নেই।

পুষ্টিবিজ্ঞানীরা তাই ওমেগা-৩'র জন্যে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন প্রাকৃতিক খাবারকেই। বাদাম হলো তেমনই একটি খাদ্য। এছাড়াও বাদামে রয়েছে ডোকোসাহেক্সেনোয়িক এসিড। এটি একটি ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড যা মানব মস্তিষ্কের সেরিব্রাল কর্টেক্স, শুক্রাণু, শুক্রাশয় ও চোখের রেটিনার প্রাথমিক গঠন-উপাদান হিসেবেও কাজে লাগে। বাদামে আরো আছে ইকোসাপেন্টিনোয়িক এসিড, এটি মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী।

উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের একটি সমৃদ্ধ উৎস বাদাম। বাদামে রয়েছে শরীরের জন্যে প্রয়োজনীয় কিছু এমাইনো এসিড যেমন : লিনোলেয়িক এসিড ও লিনোলেনিক এসিড।

বাদামে আছে আঁশ, ফাইটোস্টেরল, ভিটামিন ও মিনারেল

ফাইবার বা আঁশ একটি আদর্শ খাদ্যতালিকার অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ। পরিপাকতন্ত্রের সুস্থতা, স্বাভাবিক রেচনক্রিয়া এবং কোলন ক্যান্সারসহ বিভিন্ন রকম ক্যান্সার ও ডায়াবেটিস প্রতিরোধে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাদামে রয়েছে এই আঁশ।

ফাইটোস্টেরল হলো এক ধরনের উদ্ভিদজাত কোলেস্টেরল, যা দেহে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এর উপকারিতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার পর এখন অনেক প্রক্রিয়াজাত খাবারেই এটি কৃত্রিম উপায়ে যোগ করা হচ্ছে। কিন্তু এর সবচেয়ে ভালো প্রাকৃতিক উৎস হিসেবে বিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করেছেন বাদামকে। বলা হচ্ছে, ফাইটোস্টেরল ক্যান্সার-ঝুঁকিও কমাতে পারে।

বাদামে আছে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ও ভিটামিন ই, যা দেহের সার্বিক সুস্থতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিশেষভাবে ত্বক, চুল ও পেশির স্বাস্থ্য ভালো রাখে। ভিটামিন বি ৯ বা ফলিক এসিড আছে বলে গর্ভবতী মা এবং গর্ভস্থ শিশুর জন্যেও বাদাম উপকারী।

দেহের জন্যে প্রয়োজনীয় হরেক রকম খনিজ বা মিনারেল-এ পূর্ণ একেকটি বাদাম। এতে আছে আয়রন ম্যাগনেসিয়াম পটাসিয়াম ক্যালসিয়াম জিংক কপার সেলেনিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ। খনিজের সমৃদ্ধ উৎস বটে।

সুস্থতার জন্যে নিয়মিত বাদাম খান

নিয়মিত বাদাম খাওয়ার সাথে সুস্থ ও দীর্ঘজীবনের একটি যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এর কারণ হিসেবে তারা ধারণা করছেন, নিয়ম করে প্রতিদিন বাদাম খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে যাদের, ফাস্টফুড ও অন্যান্য স্বাস্থ্যঘাতী খাবারের প্রতি তারা তুলনামূলক কম আগ্রহী এবং তাদের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসও অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর।

তাই প্রতিদিন বাদাম খান। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের পরামর্শ হলো, বিকেলের স্ন্যাক্স হিসেবে ভাজাপোড়া মুখরোচক খাবারের প্লেটটা নীরবে সরিয়ে রাখুন। মুঠোভর্তি বাদাম তুলে নিন। বেড়াতে বের হলে বাচ্চাদের হাতে চকলেট, কুকিজ, প্রিংগ্যাল্‌স-এর বদলে বাদামের কৌটাটাই বরং ধরিয়ে দিন। তাতে প্রথম থেকেই ওরা অভ্যস্ত হয়ে উঠবে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসে।

বাদাম আছে বিচিত্র ধরন আর রকমের। পেস্তা কাজু আখরোট আর হাতের কাছেই চীনাবাদাম। উপকারিতা কমবেশি সব বাদামেই সমান। তাই দরকার কী অত ঝক্কির? চীনাবাদামই খান। খুব সহজলভ্য, আর দামেও সস্তা। ভেজে বা সেদ্ধ করে খেতে পারেন। সেদ্ধ করে খেলে চীনাবাদামের পুষ্টিমান আর এন্টি-অক্সিডেন্টের কার্যকারিতা আরো বাড়ে, বলেন পুষ্টিবিদরা। আর সাধ্যে কুলোলে অন্যান্য বাদামও মাঝেমধ্যে খেয়ে স্বাদ পরখ করে দেখা যেতে পারে। তবে লবণ মেশানো প্রক্রিয়াজাত বাদাম অবশ্যই নয়।

কতটুকু খাবেন? সবকিছুই ভালো তবে পরিমাণটাও গুরুত্বপূর্ণ। পুষ্টিবিদরা বলছেন, এক থেকে দেড় আউন্স প্রতিদিন। অর্থাৎ প্রায় ৫০ গ্রাম।

তথ্যসূত্র : জার্নাল অব আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন (১২ সেপ্টেম্বর, ২০১২)
মেয়ো ক্লিনিক অনলাইন জার্নাল
বিবিসি অনলাইন

ওমেগা-৩ ॥ হৃৎবান্ধব বটে, তবে...

ওমেগা-৩। স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের কাছে এটি এখন আর অপরিচিত কোনো শব্দ নয়। ওমেগা-৩ শরীরের জন্যে প্রয়োজনীয় একটি অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এটি n-3 নামেও পরিচিত। এই ওমেগা-৩ নিয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিজ্ঞানীদের ব্যাপক আগ্রহ ও গবেষণার অন্যতম কারণ হলো, হৃদযন্ত্রের করোনারি ধমনীর ওপর এর রয়েছে উপকারী প্রভাব। সেইসাথে আরো নানান উপকারিতা তো রয়েছেই।

ওমেগা-৩ দেয় কার্যকর হৃৎসুরক্ষা

ওমেগা-৩ হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমায়। কারণ, এটি হৃৎপিণ্ডের জন্যে উপকারী এইচডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কমিয়ে দেয় ক্ষতিকর ট্রাইগ্লিসারাইড এবং এলডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা। শুধু তা-ই নয়, ওমেগা-৩ হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনীকে এলডিএল কোলেস্টেরলের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে। কীভাবে?

আপাত নির্দোষ এলডিএল কোলেস্টেরল যখন আমাদের শরীরে থাকা অক্সিজেন অণুর সংস্পর্শে আসে মূলত তখনই এটি জারণ প্রক্রিয়ায় অক্সিডাইজ্ড হয়ে বিধ্বংসী রূপ ধারণ করে। আর ওমেগা-৩ এই অক্সিডেশন প্রতিরোধ করার মাধ্যমে হৃদযন্ত্রের ক্ষতি রোধ করে।

করোনারি হৃদরোগে যে ব্যাপারটি ঘটে তা হলো–শরীরের অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত কোলেস্টেরল হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনীতে ক্রমশ জমে জমে একটি কোলেস্টেরল-প্লাক্ তৈরি হয়, যা হৃৎপিণ্ডে স্বাভাবিক রক্ত সরবরাহে বাধার সৃষ্টি করে। যার পরিণতি হার্ট অ্যাটাক। আর ধমনীতে একটু একটু করে কোলেস্টেরল জমে প্লাক্ বা পিণ্ড তৈরির এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় এথেরোস্ক্লেরোসিস।

ওমেগা-৩ এই প্রাণধ্বংসী এথেরোস্ক্লেরোসিস প্রক্রিয়াটির জন্যে দায়ী রাসায়নিক উপাদান যেমন : লিউকোট্রায়েন্স, ফিব্রিনোজেন, প্লাটিলেট এক্টিভেটিং ফ্যাক্টর, পিডিজিএফ, ইন্টারলিউকিন-১, টিএনএফ ইত্যাদির মাত্রা

কমায়। ফলে ধমনীতে এথেরোস্ক্লেরোসিসের ঝুঁকি কমে এবং হৃদযন্ত্র থাকে করোনারি হৃদরোগের সম্ভাবনামুক্ত।

এছাড়াও করোনারি হৃদরোগের আরেকটি কারণ হলো করোনারি ধমনীর মাত্রাতিরিক্ত সংকোচন। ওমেগা-৩ করোনারি ধমনীর এ অযাচিত সংকোচন রোধ করে এবং শরীরের যেকোনো স্থানে ব্লাড ক্লট বা রক্ত জমাটবদ্ধতা সৃষ্টিতে বাধা দেয়।

উপকার আছে আরো

হৃদযন্ত্রের পাশাপাশি বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ শারীরবৃত্তিয় কর্ম-প্রক্রিয়াতেও রয়েছে ওমেগা-৩'র হিতকরী ভূমিকা। মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের কোষ আবরণীর গঠন ও এর স্বাভাবিক কার্যকারিতার ক্ষেত্রে ওমেগা-৩ একটি অপরিহার্য উপাদান। এছাড়া আমাদের শরীরের জন্যে প্রয়োজনীয় কিছু হরমোন-সদৃশ উপাদান তৈরিতেও এর ভূমিকা রয়েছে বলে প্রমাণ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডে রয়েছে ডিএইচএ বা ডোকোসাহেক্সেনয়িক এসিড, শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশে যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি উপাদান। আর যেসব শিশুরা গর্ভাবস্থায় মায়ের খাদ্যতালিকা থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ওমেগা-৩ পায় না, পরবর্তীতে তারা বিভিন্ন মনোদৈহিক জটিলতা যেমন : ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি, স্নায়বিক সমস্যা ও দুর্বল স্মৃতিশক্তিতে আক্রান্ত হতে পারে।

ওমেগা-৩ সুষম মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যেও গুরুত্বপূর্ণ। গবেষকরা বলেন, এটি মনোযোগহীনতা ও বিষণ্নতা দূর করে। এছাড়াও ওমেগা-৩ হাড়ের ঘনত্ব বাড়ানোর পাশাপাশি আর্থ্রাইটিসের ঝুঁকি কমায়।

কোথায় পাবো তারে

ওমেগা-৩ শরীরের স্বাভাবিক কর্মপ্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় একটি উপাদান হলেও, শরীর নিজে কিন্তু এটি তৈরি করে না। মূলত আমাদের প্রতিদিনকার খাবারই এর একমাত্র উৎস। তাই এর হদিস পেতে হন্যে হয়ে খুঁজতে হবে না দুর্লভ কোনো খাদ্য বা খাদ্য-উপাদান। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকার দিকে একটু মনোযোগী হলেই আমরা পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ ওমেগা-৩ খুব সহজেই পেতে পারি।

উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ–এ দুটি উৎস থেকেই ওমেগা-৩ পাওয়া যায়। উদ্ভিদজাত যেসব খাবারে ওমেগা-৩ পাওয়া যায় সেগুলো হলো : বাঁধাকপি ও ব্রকোলিসহ সবুজ শাক-সব্জি, শিম, মটরশুঁটি, মুগডাল, তাজা ফলমূল, রসুন, তিসির তেল, অলিভ অয়েল, চীনাবাদাম, আখরোট এবং স্পিরুলিনা।

আর মাছ, বিশেষত সামুদ্রিক মাছ ও মাছের তেল, ডিম ও টক দই হলো সেসব প্রাণীজ উৎসজাত খাবার, যা থেকে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ ওমেগা-৩ পেতে পারি অনায়াসে।

উদ্ভিজ্জ উৎস যখন নিরাপদ

দৈনন্দিন বিভিন্ন খাবার থেকে ওমেগা-৩ আমরা পাই বটে, কিন্তু এর সবচেয়ে নিরাপদ উৎসটি হলো উদ্ভিদজাত খাদ্য উপাদান। কারণ, ১০০ গ্রাম মাছের তেলে ৩৫ গ্রাম ওমেগা-৩ আছে সত্যি। কিন্তু এতে সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড আছে প্রায় ৪০ গ্রাম, যা শরীরে প্রবেশের পর নিশ্চিতভাবেই বাড়িয়ে দেবে ক্ষতিকর এলডিএল কোলেস্টেরলের পরিমাণ।

জীবনাচার পরিবর্তনের মাধ্যমে করোনারি হৃদরোগীদের সুস্থ জীবনের পথ দেখানোর ক্ষেত্রে প্রথম সফল প্রবর্তক আমেরিকার ডা. ডিন অরনিশ। তিনি তার 'রিভার্সিং হার্ট ডিজিজ' বইয়ে হৃদরোগীদের পরামর্শ দিয়েছেন ওমেগা-৩'র জন্যে উদ্ভিদজাত খাদ্যের দ্বারস্থ হওয়ার।

ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে ওমেগা-৩ গ্রহণের ব্যাপারে প্রয়োজন বিশেষ সতর্কতা। কারণ, প্রাণীজ উৎস অর্থাৎ মাছ ও মাছের তেলে থাকা সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড শরীরে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স বা ইনসুলিন প্রতিরোধিতা সৃষ্টির মাধ্যমে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এছাড়াও মাছের তেলে থাকা সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড শরীরের অক্সিডেশন প্রক্রিয়াকে বেগবান করে তোলে, যার ফলে মূলত বার্ধক্য প্রক্রিয়াই ত্বরান্বিত হয়।

তবে, ডা. ডিন অরনিশ এবং আমেরিকান হার্ট এসোসিয়েশনের মতে, সপ্তাহে দুই/ তিন বেলার খাবারে মাছ খেতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু করোনারি হৃদরোগ থাকলে কিংবা কোলেস্টেরলের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হলে ওমেগা-৩'র জন্যে প্রাণীজ উৎসের দ্বারস্থ না হলেই ভালো। কারণ, স্বাস্থ্যসম্মত ও সুষম খাদ্যতালিকা বলতে আমরা যা বুঝি তা থেকেই পর্যাপ্ত পরিমাণ ওমেগা-৩ পাওয়া সম্ভব।

ওমেগা-৩ ক্যাপসুল কখনোই নয়

দেশি-বিদেশি কিছু ওষুধ কোম্পানি ইদানীং ওমেগা-৩ ক্যাপসুল বাজারজাত করে বেশ জাঁকিয়ে ব্যবসা করছে। অথচ সত্য হলো, নিয়মিত ওমেগা-৩ ক্যাপসুল গ্রহণের ধারণাটা অপ্রয়োজনীয় শুধু নয়, বরং ক্ষতিকরও। জার্নাল অব আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন-এর একটি গবেষণা-প্রতিবেদনে এটি উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়াও উত্তর মেরুর অধিবাসী এস্কিমোদের জীবন থেকে এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক কারণে বছরের ১২ মাস জুড়েই এস্কিমোদের প্রধানতম খাবার সামুদ্রিক মাছ। গবেষণায় দেখা গেছে, এ কারণে এস্কিমোদের মধ্যে হৃদরোগ ও হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হওয়ার হার তুলনামূলক কম। কিন্তু অন্যদিকে তাদের স্ট্রোকে মৃত্যুর হার ঢের বেশি।

দীর্ঘ অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে যে, দৈনন্দিন খাবার অর্থাৎ সামুদ্রিক মাছ থেকে প্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিমাণ ওমেগা-৩ নীরবে এদের জীবনে স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়িয়ে চলেছে। তাই ওমেগা-৩'র জন্যে ক্যাপসুল কিংবা অন্য যেকোনো কৃত্রিম খাবারের দ্বারস্থ হওয়া মানেই স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ানো। শুধু তা-ই নয়, মাত্রাতিরিক্ত ওমেগা-৩ পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রোস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায় ও ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়ায় শর্করার মাত্রা।

এছাড়াও যেসব হৃদরোগী চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত এসপিরিন জাতীয় ওষুধ খান, তাদের ক্ষেত্রে ওমেগা-৩ ক্যাপসুলের মারাত্মক ও বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

তথ্যসূত্র : ডা. ডিন অরনিশের 'প্রোগ্রাম ফর রিভার্সিং হার্ট ডিজিজ'
জার্নাল অব ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ড মেডিকেল সেন্টার
ওয়েব-এমডি ডটকম
হার্ভার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথ অনলাইন জার্নাল
মেয়ো ক্লিনিক অনলাইন জার্নাল

রোজা পালন করুন, রোগ থেকে বাঁচুন অটুট রাখুন অনন্ত যৌবন

রোজা বা উপবাস স্বাস্থ্যহানি তো ঘটায়ই না, উল্টো তারুণ্যকে ধরে রাখে, ব্যায়ামের চেয়েও বেশি কাজ দেয় এবং সেইসাথে কমায় ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি। গবেষণায় জানা গেছে এসব তথ্য। দীর্ঘদিন ধরে মানুষের ধারণা ছিলো, কম ক্যালরি খেতে থাকলে মানুষ বোধহয় অসুস্থ হয়ে পড়বে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, নিয়মিত ভরপেট খাওয়ার চেয়ে মাঝে মাঝে না খেয়ে থাকাটা বরং সুস্বাস্থ্যের জন্যে বেশি সহায়ক।

বছর দুয়েক আগে আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এজিং-এর নিউরোসায়েন্টিস্ট ড. মার্ক ম্যাটসন ও তার সহকর্মীদের প্রকাশিত একটি গবেষণা-প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, মাঝে মাঝে না খেয়ে থাকলে মস্তিষ্কের বয়সজনিত রোগ যেমন : আলঝেইমার, হান্টিংটন, পার্কিনসন্স ইত্যাদি রোগের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তারা বলেন, উপবাসের ফলে দেহে এমন কিছু প্রোটিন উৎপন্ন হয়, যা মস্তিষ্কের কোষগুলোকে অক্সিডেশনজনিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। উপরন্তু বাড়িয়ে দেয় স্নায়ুকোষের কার্যকারিতা। ফলে মস্তিষ্কের ক্ষয় হয় অনেক কম।

রোজা রাখলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমে। ম্যাটসন বলেন, নিয়মিত খাওয়াদাওয়া মানে দেহকোষগুলোতে ইনসুলিনের নিরন্তর সরবরাহ। এভাবে চলতে থাকলে দেহকোষগুলোর সক্রিয়তা ও কাজের প্রয়োজন কমতে থাকে। একসময় তৃপ্ত ও অলস এই দেহকোষগুলো হয়ে ওঠে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্ট বা ইনসুলিন প্রতিরোধী। অর্থাৎ এদের ওপর ইনসুলিনের প্রভাব কমে আসে ধীরে ধীরে। আর এটাই ডায়াবেটিসের লক্ষণ। কিন্তু মাঝে মাঝে কিংবা নিয়মিত বিরতিতে খাওয়া বন্ধ থাকলে শরীরের সর্বত্রই দেহকোষগুলো আরো ইনসুলিন সংবেদনশীল হয়ে ওঠে, ইনসুলিনের প্রভাবে ভালোভাবে সাড়া দিতে পারে। এবং বিপাক করতে পারে দক্ষভাবে। এর ফলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমার সাথে সাথে কমে উচ্চ রক্তচাপ এবং হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কাও।

তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ওজন হ্রাসের ক্ষেত্রে প্রতিদিনই কঠোরভাবে ক্যালরি নিয়ন্ত্রণের চেয়েও অনেক ভালো ফল দিতে পারে যে অভ্যাসটি সেটি হলো, স্বাভাবিক খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত বিরতিতে নির্দিষ্ট সময়ের উপবাস। আসলে শরীরের জন্যে কিছু সময়ের এই ক্ষুধাবোধের উপকারিতার মূল সূত্রটি নিহিত রয়েছে আমাদের ডিএনএ-র মধ্যেই।

প্রাচীনকালে আমাদের পূর্বপুরুষরা পশু শিকার করে খাবার যোগাড় করতো। এভাবে একবেলা খাওয়ার পর পরবর্তী শিকার না পাওয়া পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করতে হতো। আর এই ক্ষুধা-অনাহারের মতো পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে টিকে থাকার একটি সহজাত ক্ষমতা আমাদের দেহে সঞ্চারিত হয়েছে বিবর্তন-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে।

কিন্তু আধুনিক মানুষকে তো খাবারের জন্যে না করতে হয় শিকার, না করতে হয় কোনোরকম অপেক্ষা। এখন ঘরে খাবার, ফ্রিজে খাবার, তা-ও না থাকলে হোটেল-রেস্তোরাঁ-দোকানপাট তো আছেই। ফলে অনাহারের কষ্ট থেকে আমরা বেঁচেছি বটে, কিন্তু সঙ্গী করেছি অন্য ঝুঁকিকে। পুষ্টিবিজ্ঞানীরা দেখেছেন, কয়েক ঘণ্টা পর পর নিয়মিত খাওয়াদাওয়ার ফলে রক্তে শর্করার মান দীর্ঘসময় ধরে উঁচু থাকে। দেহে বিভিন্ন কাজের জন্যে দরকার নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যালরি বা শক্তি আর সেই শক্তি উৎপাদনের জন্যে দৈনন্দিন খাবার থেকে প্রাপ্ত শর্করাকে বিপাক হতে হয়। এই বিপাকের একটি উপজাত হলো অক্সিডেশন বা জারণ, যার ফলে দেহে সৃষ্টি হয় অস্থিতিশীল অক্সিজেন অণু। এবং এর সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক পরিণতি হলো–এটি বার্ধক্য প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে, শরীরকে বুড়িয়ে দেয়।

ড. ম্যাটসন বলেছেন, উপবাস এই প্রক্রিয়াকেই পাল্টে দেয়। অনাহারের ফলে দেহে যে সাময়িক শক্তি-সংকট হয় তা মস্তিষ্কের কোষগুলোকে প্রোটিন উৎপাদনে উৎসাহ দেয়, যা উদ্বেগকর পরিস্থিতি সামাল দেয়ার শক্তি যোগায়, এমনকি তখন নতুন ব্রেন সেল বা নিউরোনও জন্মাতে পারে। আর পুরো দেহেই ইনসুলিন ছড়িয়ে পড়ে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায়।

এজন্যেই হয়তো বলা হয় যে, মানুষ না খেয়ে মরে না বরং কখনো কখনো অতি পুষ্টিই বিপদ ডেকে আনে। তাই নিজ নিজ ধর্মমতে রোজা বা উপবাস পালন করুন। আর ইফতারে খান পরিমিত ও সহজপাচ্য খাবার। আপনার সুস্থ কর্মময় দীর্ঘজীবনের সম্ভাবনা তাতে বাড়বে।

তথ্যসূত্র : হেলথ এন্ড নিউট্রিশন
টাইম ম্যাগাজিন

ফাস্টফুড ॥
ধেয়ে আসছে স্বাস্থ্য-বিপর্যয়

স্বাস্থ্যঘাতী ফাস্টফুড

গত কয়েক দশকেরও বেশি সময় ধরে পাশ্চাত্যে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে বেড়ে চলেছে খাদ্য-সংশ্লিষ্ট রোগের প্রকোপ। বিস্তার ঘটেছে জানা-অজানা খাদ্যবাহিত জীবাণুর। মাত্রাতিরিক্ত ওজনের হার বেড়েছে আশঙ্কাজনকভাবে। স্থূলতা থেকে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে ব্যয় হচ্ছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসবের নেপথ্যে রয়েছে রসনা তৃপ্তিদায়ক ফাস্টফুড-এর উত্থান। বিশ্বজুড়ে যার আরেক নাম 'জাংক ফুড'।

যুক্তরাষ্ট্রে দিনে প্রায় দুই লাখ মানুষ বিভিন্ন ধরনের খাদ্যবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়। সে দেশের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)-এর হিসাব মতে, প্রতিবছর এক-চতুর্থাংশেরও বেশি আমেরিকান ফুড পয়জনিং-এর শিকার হন, যার অধিকাংশই কর্তৃপক্ষের গোচরে আসে না এবং যথাযথভাবে রোগনির্ণয়ও হয় না প্রায়শই। দু-একটা যা-ও হয়, সেটি প্রকৃত সংখ্যার নগণ্য অংশ মাত্র।

গত কয়েক দশকে যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্য-সংশ্লিষ্ট রোগের প্রকোপই শুধু বাড়ে নি, এ রোগগুলো শরীরে মারাত্মক ও দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিও করছে। খাদ্যে বিষক্রিয়ার প্রাথমিক অবস্থায় ডায়রিয়া ও পেটের পীড়া দেখা দেয় কিন্তু চরম পর্যায়ে এটি গুরুতর সংক্রামক ব্যাধিও ডেকে আনতে পারে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, অনেক খাদ্যবাহিত জীবাণু হৃদরোগ, কিডনি-বৈকল্য, স্নায়বিক জটিলতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করাসহ নানারকম দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

পুরো বিষয়টি আমাদের জন্যেও বয়ে আনছে সতর্কবার্তা। কারণ, পশ্চিমা ফাস্টফুড সংস্কৃতি এখন দেশের শুধু উচ্চবিত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, দ্রুত গতিতে এর বিস্তার ঘটেছে পুরো সমাজেই।

বার্গার ॥ খাবেন কিনা নিজেই সিদ্ধান্ত নিন

ফাস্টফুড বলতেই সবার আগে যে খাবারটি মনের চোখে ভেসে ওঠে, সেটি বার্গার। প্রতিদিন বেশ মজা করে বার্গার কিংবা মাংসের কিমা দিয়ে তৈরি মজাদার ফাস্টফুড খাচ্ছেন অনেকেই। কিন্তু বার্গারের মাঝখানে থাকা 'নির্দোষ' মাংসের চপটিতে যদি গবাদি পশুর কিছু কাঁচা বিষ্ঠাও থাকে, তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই। শুনুন তাহলে–

আমেরিকার সবচেয়ে নামী ব্র্যান্ডের ফাস্টফুডের কথাই ধরা যাক। সেখানে একটি বিফ বার্গারে যে মাংসের কিমা থাকে, তা কমপক্ষে এক ডজন গরু এবং কখনো কখনো শ-খানেক গরুর মেশানো মাংস থেকে বানানো। এসব গরু আবার একাধিক দেশ থেকে সংগৃহীত। এই কিমার সামান্য কণামাত্রও যদি 'ই কলাই' জীবাণু দ্বারা দূষিত হয় তাহলে আপনি অসুস্থ তো হবেনই, তা আপনার মৃত্যুরও কারণ হতে পারে।

'ই কলাই' হলো রোগ-সৃষ্টিকারী মারাত্মক একটি জীবাণু। যুক্তরাষ্ট্রে এটি ছড়ানোর প্রধান উৎস তাদের বড় বড় কসাইখানাগুলো, যেখানে শ্রমিকেরা যান্ত্রিক ছুরি ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মাধ্যমে পশু জবাই থেকে শুরু করে মাংস প্যাকেট করার কাজগুলো করে থাকে। আর মাংস প্রক্রিয়াজাত করার সময় এর সাথে মিশে যায় গবাদি পশুর বর্জ্যে বা গোবরে থাকা জীবাণুও!

যে গবাদি পশুর মাংস থেকে কিমা বানানো হচ্ছে, তারা কী খায় জানেন? ইউরোপ-আমেরিকাতে গবাদি পশু মাত্রই অন্য মৃত পশুর (শূকর কুকুর বেড়াল ইত্যাদি) প্রক্রিয়াজাত বর্জ্য ও অন্যান্য পশুভিত্তিক উপদ্রব্য (বাই প্রোডাক্ট) খেয়ে বাঁচে। এছাড়া করাতগুঁড়ো ও পুরনো কাগজের মণ্ডও এদের খেতে দেয়া হয়। শুধু তা-ই নয়, ১৯৯৭ সালের আগপর্যন্ত সে দেশে সরাসরি মৃত গবাদি পশুই খেতে দেয়া হতো নিয়মিতভাবে। বৃটেনে এ কারণেই 'ম্যাড কাউ ডিজিজ' মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এর পর থেকে পশুখাদ্য হিসেবে মৃত গবাদি খাওয়ানো নিষিদ্ধ হয়। তারপরও ওখানকার বড় বড় কসাইখানাগুলোতে যত গবাদি পশু দৈনিক জবাই করা হচ্ছে, তার অনেকগুলোই হাম ও ফিতাকৃমি রোগে আক্রান্ত। আর যে বিশাল মিশ্রণযন্ত্রে এসব মাংস পেষণ করা হয়, তাতে হরহামেশাই মাংসের সঙ্গে পোকামাকড়, আবর্জনা, মানুষের ঘাম এমনকি কখনো কখনো বমি পর্যন্ত গুলে একসঙ্গে বেরিয়ে আসে!

কোনো হরর সিনেমার চিত্রনাট্য নয় কিন্তু এগুলো। রীতিমতো ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত সত্য। মার্কিন সাংবাদিক এরিক শ্লোজার টানা তিন বছর

গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়ে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখেছেন–'ফাস্টফুড নেশন'। ২০০২ সালে প্রকাশিত এ বইটিতে তিনি এসব তথ্য তাবৎ সূত্রসহ সবিস্তারে তুলে ধরেছেন, যা সবার সামনে উন্মোচন করে দিয়েছে আমেরিকার খাদ্যব্যবসার এক আশ্চর্য অন্ধকার দিক।

যুক্তরাষ্ট্রের ডজনখানেক কসাইখানা ঘুরে শ্লোজারের অভিমত হলো, গবাদি পশু জবাইয়ের পর তার চামড়া ছাড়ানো হয় যন্ত্র দিয়ে, কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই সে চামড়া নিখুঁতভাবে ছাড়ানো হয় না বলে কিমার জন্যে প্রস্তুতকৃত মাংসের ভেতর চামড়া, কাদামাটি ও কাঁচা বিষ্ঠা (!) নিয়মিতভাবেই ঢুকে পড়ে। আর পশুর পেট ও নাড়িভুঁড়ি পরিষ্কার করা হয় হাত দিয়ে।

মজার ব্যাপার হলো, যেসব শ্রমিক এসব কসাইখানায় কাজ করে তাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত অতি নিম্ন বেতনভোগী ইমিগ্র্যান্ট। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বালাই তাদের অধিকাংশেরই নেই। হাত দিয়ে ছাড়াতে গিয়ে তারা অনেক সময়ই পশুর নাড়িভুঁড়ি এবং বিষ্ঠা মাংসের সঙ্গে গ্রাইন্ডারে ছুঁড়ে দেয়। কারণ, প্রত্যেক শ্রমিককেই অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ঘণ্টায় গড়ে ৬০টি পশুর মাংস কেটেছেঁটে গ্রাইন্ডারে ফেলতে হয়। এসময় মাংসের সঙ্গে আর কী কী ঢুকে পড়ছে, তার হিসাব রাখছে কে?

শ্লোজারের হিসাবে, যদি শুধু একটি মাত্র পশু থেকে দূষিত পদার্থ গ্রাইন্ডারে ঢুকে পড়ে, তাতেও বিপুল পরিমাণ কিমা দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দলাইমলাই হয়ে সেই মাংস যখন বার্গারের কিমা হয়ে দোকানে হাজির হয়, তখন এর কোন্‌টা দূষিত আর কোন্‌টা স্বাভাবিক, সেটি বোঝার ক্ষমতা ওই শ্রমিকেরও নেই। কারণ, ততক্ষণে ওই বস্তুটি উচ্চ তাপে ভাজা (ডিপ ফ্রাই) ও সুগন্ধি ফ্লেভার দ্বারা 'ধন্য' হওয়ার মতো বেশ কয়েকটি পর্ব পেরিয়ে এসেছে। তখন এর ভেতরে 'অন্যরকম কিছু'-র অস্তিত্ব টের পাওয়ার সাধ্যি আছে কার?

আমেরিকাতে বড় আকারের একেকটি মিট প্রসেসিং প্ল্যান্টে দৈনিক কমপক্ষে আট লাখ পাউন্ড কিমা তৈরি হয়। যদি একটি 'ই কলাই' জীবাণু আক্রান্ত পশুর মাংসও সেই কিমায় থাকে, তাহলে এর দ্বারা অন্ততপক্ষে ৩২ হাজার পাউন্ড কিমা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সংশ্লিষ্টদের মতে, হ্যামবার্গার কিংবা মাংস দিয়ে তৈরি ফাস্টফুড খেয়ে গুরুতর অসুস্থ হওয়ার প্রধানতম কারণ হলো মাংসে লেগে থাকা জীবাণুবাহী গোবর বা বর্জ্য, যাতে থাকে এই 'ই কলাই' নামক জীবাণুটি। এটি ছাড়াও গত দুই দশকে

চিকিৎসকরা আরো প্রায় ডজনখানেক খাদ্যবাহিত জীবাণুর সন্ধান পেয়েছেন। সিডিসি অনুমান করছে, তিন-চতুর্থাংশ খাদ্যবাহিত বা খাদ্য-সংশ্লিষ্ট অসুস্থতা ও মৃত্যুর কারণই হচ্ছে এসব সংক্রামক জীবাণু, যেগুলোকে এখনো পুরোপুরি চিহ্নিত করা যায় নি।

বিপদটা যে শুধু ফাস্টফুড-শপে বার্গার খেতে গিয়েই ঘটতে পারে, তা নয়। কেতাদুরস্ত সুপার মার্কেট থেকে সুদৃশ্য প্যাকেটে মোড়া গরু বা মুরগির কিমা ঘরে আনলেও ঘটতে পারে একই বিপদ। দুটোই দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা সমান। আর এসব দূষিত খাবার খেয়ে আমেরিকায় প্রতিদিন দুই লাখেরও বেশি মানুষ রোগগ্রস্ত হচ্ছে। হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে নয় হাজার রোগী। এদের মধ্যে দৈনিক মারা যাচ্ছে ১৪ জন। যারা অসুস্থ হচ্ছে বা মারা যাচ্ছে তাদের একটা বড় অংশ হচ্ছে স্কুলের ছাত্রছাত্রী অর্থাৎ শিশু-কিশোর।

ফাস্টফুড নিয়ে এমন আশ্চর্য সব খবর আর এর পরিণতি জানা সত্ত্বেও আমেরিকায় সরকারিভাবে তা নিয়ন্ত্রণের কোনো উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। কিংবা বলা যেতে পারে, নেয়া যাচ্ছে না। কেননা, আমেরিকাতে ফাস্টফুড ইন্ডাস্ট্রি এখন এক বিশাল সাম্রাজ্য। মোট এক ডজন বহুজাতিক করপোরেশন এ সাম্রাজ্যের নেপথ্য নিয়ন্ত্রক। আসল খবর হলো, এ শিল্পের সাথে নানাভাবে অতি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ (নাকি স্বার্থযোগ?) রয়েছে সে দেশের রাজনৈতিক ও সরকারি ব্যবস্থাপনার। এ যেন ফাস্টফুড সাম্রাজ্যবাদ!

এসব কিন্তু আমেরিকার নামীদামী ব্র্যান্ডের ফাস্টফুডের কেচ্ছাকাহিনী, তা-ও কেবল এখন পর্যন্ত যেটুকু জানা গেছে। এর বাইরে যে আরো কী ঘটে চলেছে, তাই-বা কে জানে! খোদ আমেরিকার মতো দেশ–যেখানে সবকিছুর মান নিয়ন্ত্রণে এত কড়াকড়ি আর বিধিনিষেধ–সেখানেই যদি ঘটে চলে এমনতর সব কাণ্ডকীর্তি, তখন আমাদের দেশে কী হচ্ছে... থাক্।

আর এর সাথে ইদানীং যুক্ত হয়েছে কিছু বহুজাতিক চেইন ফাস্টফুড রেস্টুরেন্টের মনোহরী চিত্তজয়ী বিজ্ঞাপন। যেমন, আমাদের তৈরি সুস্বাদু খাবারে ব্যবহার করা হয়েছে কিছু 'হিডেন স্পাইসেস'। অর্থাৎ গোপন মশলাপাতি। কিন্তু কেন এ গোপনীয়তা? ওসবের নাম জানলে স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়াতে আপনি খাবারগুলো না-ও খেতে পারেন, তাই? এ কারণেই কি এমন নাটকীয় প্রলোভন?

বার্গারের আছে আরো বিস্ময়কর 'গুণ'। বোস্টনের প্রখ্যাত ডানা-ফার্বার ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্র যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের অন্যতম

সহযোগী প্রতিষ্ঠান। গত দশকের শুরুর দিকে দীর্ঘ গবেষণার পর তারা মানবদেহে একটি আণবিক উপাদানের সন্ধান পান। পিজিসি-১ বিটা। লিভারে সংঘটিত শরীরের স্বাভাবিক বিপাকক্রিয়ায় এর ভূমিকা রয়েছে। সবচেয়ে উদ্বেগের কথা হলো, এটি বার্গারের ফ্যাটকে সরাসরি ধমনীতে ব্লকেজ সৃষ্টি করতে বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত করে।

গবেষকরা দেখেছেন, যখন মাংস ও ডেইরি প্রোডাক্টসহ বিভিন্ন খাদ্যের স্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং ট্রান্স ফ্যাট লিভারে হাজির হয় তখন পিজিসি-১ বিটা এক ধরনের বায়োকেমিক্যাল সংকেতের প্রবাহ সৃষ্টি করে চলে, যা লিভারকে এলডিএল এবং ট্রাইগ্লিসারাইড উৎপন্ন করতে প্ররোচিত করে। উল্লেখ্য, এ দুটো উপাদানের মাত্রাধিক্য ধমনীতে ব্লকেজ সৃষ্টি করে, যা পরবর্তীতে হার্ট অ্যাটাকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

গবেষকদের মতে, বার্গারের মতো অন্যান্য যেসব খাবারে স্যাচুরেটেড এবং ট্রান্স ফ্যাট আছে সেসব খাবার খেলেও রক্তে এলডিএলের মাত্রা বাড়বেই। আর ফাস্টফুড বলতে আমরা যা বুঝি তার সবকটিতেই স্যাচুরেটেড এবং ট্রান্স ফ্যাটের অস্তিত্ব আছে বেশ ভালো রকমেই।

ফ্লেভার : আসল রহস্য এখানেই

খাবারের ধরন হিসেবে ফাস্টফুড হলো প্রক্রিয়াজাত খাবার। আর প্রক্রিয়াজাত করতে গিয়ে খাবারের আসল স্বাদ ও গন্ধ হারিয়ে যায়। তাই কৃত্রিম ফ্লেভার দিয়ে স্বাদ-গন্ধ আসলের মতো রাখা হয়। এসব ফ্লেভারগুলো এতটাই শক্তিশালী যে, বলা হচ্ছে, একটা শুকনো কাঠকেও কেবল ফ্লেভার দিয়েই সুস্বাদু করে তোলা সম্ভব।

সন্দেহজনক বিষয় হচ্ছে, ফ্লেভার-শিল্পকে রাখা হয় খুবই গোপনীয়তার ভেতর। এজন্যে দেখা যায়, ফাস্টফুড পণ্যের নাম কিংবা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নাম মানুষের মুখে-ঠোঁটে মুখস্থ থাকলেও এসব ফ্লেভার কারা তৈরি করে, সে বিষয়ে কেউই কিছু জানে না। বহুল প্রচলিত ব্র্যান্ডের সুনাম রক্ষার জন্যেই এ ধরনের গোপনীয়তা অত্যন্ত জরুরি। রেস্তোরাঁগুলো ক্রেতাদের এমন ধারণা দিতে চায় যেন খাবারের পুরো স্বাদটি তাদের রান্নাঘরেই তৈরি হয়েছে।

এছাড়াও স্বাদ বৃদ্ধির জন্যে ফাস্টফুডে আরেকটি উপাদান ব্যবহার করা হয় হরদম। টেস্টিং-সল্ট। এর ভয়াবহতা ইতোমধ্যে সচেতন মানুষ মাত্রেরই জানা। প্রায় সব ধরনের ফাস্টফুডেই এটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

বাড়ছে স্থূলতা আর জীবনঘাতী রোগব্যাধি
পাল্লা দিয়ে বাড়ছে চিকিৎসা-ব্যয়

ফাস্টফুডের বিকাশের সাথে সমান তালে বাড়ছে স্থূলতা। আর যেকোনো শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে স্থূলতার হার অনেক বেশি। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে ৬০-এর দশকে স্থূলতার যে হার ছিলো সেটা এখন বেড়ে হয়েছে দ্বিগুণ। আর শিশুদের ক্ষেত্রে এ হার ১৯৭০-এর চেয়ে দ্বিগুণ হয়েছে। অর্থাৎ শিশুদের মধ্যে স্থূলতার হার প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় বাড়ছে আরো দ্রুত।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সাম্প্রতিক ইতিহাসে আমেরিকানরাই একমাত্র জাতি যারা এত দ্রুত এত মোটা হয়েছে। সিডিসি-র সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, আমেরিকার প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে লিঙ্গ বর্ণ বয়স শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্বিশেষে গণহারে সবার মধ্যে স্থূলতা বাড়ছে। ১৯৯১-এ ১৫% বা তার বেশি স্থূলতার হার ছিলো মাত্র চারটি অঙ্গরাজ্যে। আর বর্তমানে এ সংখ্যা ৩৭টি অঙ্গরাজ্য ছাড়িয়ে গেছে।

স্থূলতার এমন হঠাৎ-বৃদ্ধির পেছনে কোনো জিনগত কারণ নেই। আমেরিকানদের জিন গত কয়েক দশকে রাতারাতি পাল্টেও যায় নি। পাল্টেছে তাদের খাওয়া এবং জীবনযাত্রার ধরন। কমেছে শারীরিক পরিশ্রম, বেড়েছে খাদ্যতালিকায় চর্বিজাত ও উচ্চ ফ্যাটযুক্ত খাবারের পরিমাণ। আর এসব খাবার সব জায়গায় এমন সহজলভ্য ও সুলভ হয়েছে ফাস্টফুড-শিল্পের আগ্রাসী বিকাশের ফলে।

ফাস্টফুডের প্রায় অপরিহার্য অংশ কোমল পানীয়ের উত্থান দেখলেই এর বিকাশ বোঝা যায়। গত চার দশকে কোমল পানীয় গ্রহণের পরিমাণ ওখানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে চারগুণেরও বেশি। অন্যদিকে স্বাস্থ্যকর খাবার প্রচলনের একাধিক উদ্যোগ কয়েকবারই ব্যর্থ হয়েছে। এর মূল কারণ, স্বাস্থ্যকর খাদ্যতালিকায় ফ্যাটের পরিমাণ কম। আর ছোটবেলা থেকেই ফ্যাটযুক্ত খাবারে রুচি ও আগ্রহ তৈরি হয়ে যাওয়ায় পরবর্তীতে সেটি ত্যাগ করা কঠিন হয়ে পড়ে বৈকি।

সিডিসি-র ধারণা অনুযায়ী, স্থূলতা থেকে সৃষ্ট নানা শারীরিক সমস্যা মোকাবেলায় আমেরিকানরা প্রতিবছর ব্যয় করে প্রায় ২৪ হাজার কোটি ডলার। হৃদরোগ, কোলন (মলাশয়) ক্যান্সার, পাকস্থলীর ক্যান্সার, স্তন ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, স্ট্রোক, এমনকি বন্ধ্যাত্বের সাথে মেদস্থূলতার সম্পর্ক রয়েছে। ১৯৯৯ সালে আমেরিকান ক্যান্সার

সোসাইটি পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, অতিরিক্ত ওজনধারীদের মধ্যে প্রি-ম্যাচিউর ডেথ বা অকালমৃত্যুর হার অনেক বেশি। স্বাভাবিক ওজনধারীদের তুলনায় সেটি হতে পারে দ্বিগুণ থেকে চারগুণ পর্যন্ত বেশি।

স্থূলতার 'মহামারি' যুক্তরাষ্ট্র থেকে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন দেশে। বিস্ময়কর ব্যাপার, সত্তরের দশকের গোড়ায় আমেরিকার চেইন ফাস্টফুড শপ ম্যাকডোনাল্ডস জাপানে তাদের শাখা চালু করে, তারপর জাপানিদের অবস্থাও হতে শুরু করে আমেরিকানদের মতোই। পরবর্তী এক দশক না পেরোতেই জাপানে ফাস্টফুড খাওয়ার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় দ্বিগুণ-এ। সেইসাথে দ্বিগুণ হয়ে যায় শিশুদের স্থূলতার হারও। কারণ, ফাস্টফুড একবার খাওয়া শুরু করলে ছাড়া কঠিন। দিন দিন বাড়তেই থাকে এর আসক্তি। প্রমাণ খোদ আমেরিকানরাই। ফাস্টফুডের পেছনে ১৯৭০ সালে তাদের খরচ ছিলো ছয়শ কোটি ডলার। ২০০১ সালে সেটি বেড়ে দাঁড়ায় ১১ হাজার কোটি ডলারে।

ফাস্টফুডে বুদ্ধিনাশ!

সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয়টি হচ্ছে, ফাস্টফুড শিশুর আইকিউ দুর্বল করে দিতে পারে। বিশেষত বয়স তিন বছর হওয়ার আগে থেকেই যেসব শিশু চিপ্‌স পিৎজা বিস্কিট বার্গার ইত্যাদি খেতে শুরু করে, তাদের আইকিউ দুর্বল হয়ে পড়ে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত একটি গবেষণায় এর প্রমাণ পেয়েছেন একদল ব্রিটিশ গবেষক। ২০১০ সালে এ গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় এপিডেমিওলজি এন্ড কমিউনিটি হেলথ জার্নালে।

তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সী চার হাজার স্কটিশ শিশুর ওপর চালানো এ গবেষণার ফলাফলে বিজ্ঞানীরা বলেন, ফাস্টফুড খাওয়ার ফলে শিশুর মস্তিষ্কের ক্ষমতা স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অন্যদিকে একই বয়সী যেসব শিশুকে ফলমূল ও শাক-সব্জিসহ ঘরে তৈরি তাজা পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো হয়, তাদের সঙ্গে ফাস্টফুড খাওয়া শিশুর আইকিউ-র ব্যবধান হতে পারে পাঁচ পয়েন্ট পর্যন্ত। গবেষকদের মতে, তিন বছর বয়সের আগে যেসব শিশু প্রচুর পরিমাণ ফাস্টফুড খায় পরবর্তীতে তাদের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন ঘটালেও আইকিউ-র কোনো উন্নতি হয় না। তারা বলেন, একটি শিশুর জন্যে প্রথম তিন বছর পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় মস্তিষ্ক সবচেয়ে দ্রুত বাড়ে। তাদের মতে, যেসব শিশু ওই বয়সে চর্বি ও চিনিযুক্ত এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার বেশি খায়, তারা প্রয়োজন অনুযায়ী ভিটামিন ও পুষ্টি পায় না।

তাই এ বিষয়ে আমাদের আশু সচেতনতা জরুরি–একটি সুস্থ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যদি আমরা চাই। নিজেরা সচেতন হওয়ার পাশাপাশি এখন সময় এসেছে এ নিয়ে কথা বলার, সোচ্চার হওয়ার এবং ফাস্টফুডের ক্ষতিকর দিকগুলো সবার সামনে দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরে সবাইকে সচেতন করার। কারণ, শারীরিকভাবে অসুস্থ একটি উত্তরপ্রজন্মের কাছ থেকে আমরা কখনো সুস্থ ও সমৃদ্ধ জাতি আশা করতে পারি না।

আমাদের ঘুম ভাঙবে কবে?

সঠিক খাদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির অভাব এবং অবাধ বিজ্ঞাপনের প্রসার আমাদের দেশেও সবাইকে উৎসাহিত করছে পাশ্চাত্যের মতো বেশি বেশি ফাস্টফুড খেতে। উচ্চবিত্ত আর উচ্চ-মধ্যবিত্তই কেবল নয়, সাধারণ পরিবারগুলোর সন্তানেরা এমনকি পরিবারের সব বয়সী সদস্যরাও দ্রুত অভ্যস্ত হয়ে পড়ছেন এসব খাবারে। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকালে এর ভয়াবহ পরিণতি আঁচ করা তেমন কঠিন কিছু নয়। ফাস্টফুড থেকে সৃষ্ট স্বাস্থ্য-জটিলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ওরা না হয় নিমেষেই খরচ করতে পারছে হাজার হাজার কোটি ডলার, কিন্তু আমাদের সে সুযোগ কোথায়?

তাই একমাত্র সচেতনতাই পারে এই সম্ভাব্য দুর্গতি থেকে আমাদের মুক্তি দিতে। এজন্যে চাই শুধু আমাদের ইচ্ছা। কারণ, ফাস্টফুডে উপকার বলে কিছু নেই বরং ক্ষতি অনেক। আমরা নিজেরা এসব না খাওয়া, আপ্যায়নের বেলায় এগুলো বর্জন করা এবং সর্বোপরি পরিবারে সমাজে সবাইকে সচেতন করে তোলাটাই এখন কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে দেশের বিশিষ্ট চিকিৎসক বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ডা. এ কে আজাদ খান তার একটি নিবন্ধে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন–'আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের এই ক্ষতিকর অবস্থা থেকে বাঁচাতে এখনই সচেতন হওয়া দরকার। এজন্যে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে এই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। ভবিষ্যতে একটি সুস্থ জাতি উপহার দিতে হলে আমাদের এখন থেকেই উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।'

তথ্যসূত্র : মার্কিন সাংবাদিক এরিক শ্লোজার-এর আলোচিত গ্রন্থ 'ফাস্টফুড নেশন'
ডেইলি মেইল অনলাইন
টাইম ম্যাগাজিনের অনলাইন সংস্করণ

কোমল পানীয় ॥ আসলে কতটা কোমল?

প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ বাড়িতে অফিসে পার্টিতে পথে-ঘাটে হরদম খেয়ে যাচ্ছেন বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কোমল পানীয়। বছর দশেক ধরে এর সাথে যুক্ত হয়েছে এনার্জি ড্রিংকস। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর নিত্যনূতন বিক্রয়-কৌশল আর চাকচিক্যময় বিজ্ঞাপনের হুজুগে এগুলো বিক্রিও হচ্ছে ধুন্ধুমার।

কিন্তু কী আছে এসব পানীয়ে আর মানবদেহের ওপর তার প্রভাবটাই-বা কেমন, এ নিয়ে বিশ্বজুড়ে গবেষণা চলছেই। যা থেকে প্রায়ই বেরিয়ে আসছে নতুন নতুন সব বিস্ময়কর তথ্য। নিজের ও পরিবারের সুস্থতা তো বটেই, সর্বোপরি একজন সচেতন মানুষ হিসেবেও আমাদের সবারই বিষয়গুলো জানা থাকা প্রয়োজন।

ইথিলিন গ্লাইকল : আর্সেনিক-সদৃশ বিষ!

ফ্রিজে চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা তার কম তাপমাত্রায় কোনো তরল দীর্ঘক্ষণ রাখলে তা জমে বরফ হয়ে যায়। কিন্তু কোমল পানীয় ও এনার্জি ড্রিংকসের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে না। কারণ এগুলোতে এন্টি-ফ্রিজার হিসেবে মেশানো হয় একটি রাসায়নিক উপাদান। যার নাম ইথিলিন গ্লাইকল। এটি মানবদেহের জন্যে স্বল্প মাত্রার আর্সেনিকের মতোই একটি বিষ। মূলত শিল্প-কারখানায় ব্যবহারযোগ্য হলেও স্বচ্ছ বর্ণ গন্ধহীন এ উপাদানটি বিভিন্ন পানীয়ে এন্টি-ফ্রিজার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে হরদম। গবেষকদের মতে, ইথিলিন গ্লাইকল মানবদেহে নীরব বিষক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, হৃৎপিণ্ড, লিভার এবং কিডনি জটিলতা এমনকি দীর্ঘমেয়াদে কিডনি বৈকল্য পর্যন্ত ঘটাতে পারে এটি।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ধারণা, বিশ্বজুড়ে গত কয়েক দশকে সববয়সী বিশেষত শিশুদের মধ্যে কিডনি রোগ বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো এই কোমল পানীয়।

ইথিলিন গ্লাইকলের পাশাপাশি কোমল পানীয় ও এনার্জি ড্রিংকসে মেশানো হয় কিছু কৃত্রিম রঙ। যেমন : টারট্রাজিন, কারমোসিন, ব্রিলিয়ান্ট ব্লু, সালফেট ইয়েলো ইত্যাদি। নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে এগুলোর বিক্রয় নিষিদ্ধ। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, এ উপাদানগুলো ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ। এছাড়াও কোমল পানীয়তে প্রিজারভেটিভ হিসেবে ব্যবহার করা হয় সোডিয়াম বেনজয়েট বা বেনজয়িক এসিড। এ উপাদানটি কারো কারো ক্ষেত্রে হাঁপানি ও চর্মরোগের কারণ হতে পারে।

কোনো তরল কতটা এসিডিক হবে তা নির্ভর করে তার pH মানের ওপর। যে পানীয়ের pH মান যত কম সে পানীয় তত এসিডিক। কোনো পানীয়ের pH মান ৫.৫ বা তার কম হলে সে পানীয় শরীরের জন্যে ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হয়। সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপারটি হলো, ব্রিটিশ কোমল পানীয় সমিতি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কোমল পানীয়ের মাত্রা শনাক্ত করে যে ছকটি প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায়, এদের প্রত্যেকটির মান ৩-এর কম। আর বাজারের সবচেয়ে জনপ্রিয় কোমল পানীয়টির pH মান ২.৪ থেকে ২.৮ এর মধ্যে। কোমল পানীয় পানের ফলে শরীরে ক্রমান্বয়ে জমা হতে থাকা এই এসিড দাঁত ও হাড়সহ শরীরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের ক্ষতিসাধন করে।

ঝাঁঝালো স্বাদে জীবনক্ষয়

কোমল পানীয়তে ঝাঁঝালো স্বাদের জন্যে মেশানো হয় ফসফরিক এসিড, যা ইতোমধ্যেই দাঁতের এনামেল আর শরীরের হাড়ের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত। পরীক্ষায় দেখা গেছে, কোমল পানীয়ের বোতলে একটি দাঁত ফেলে রেখে দিলে তা ১০ দিনের মধ্যে পুরোপুরি গলে যায়। ব্রিটিশ ডেন্টাল এসোসিয়েশনের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, প্রতিবার কোমল পানীয় গ্রহণের প্রায় একঘণ্টা পর্যন্ত দাঁতের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব বজায় থাকে। কারণ, ওই পানীয়তে থাকা ক্ষতিকর উপাদানগুলোর প্রভাব অকার্যকর করতে মুখের লালার প্রায় একঘণ্টা সময় লাগে।

কোমল পানীয়ে থাকা ফসফরাস শরীরে জমে দীর্ঘমেয়াদে হাড়কে ভঙ্গুর করে দেয়। শুধু তা-ই নয়, ভারী কোনো পরিশ্রমের পর কোমল পানীয় পান করলে এর ক্যাফেইন শরীরের ক্যালসিয়াম ও পটাশিয়ামের সাথে বিক্রিয়া করে। ফলে শরীর থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ক্যালসিয়াম ও পটাশিয়াম প্রস্রাবের সাথে বেরিয়ে যায়, যা হাড়ক্ষয় তরান্বিত করার পাশাপাশি হৃদযন্ত্রে গোলযোগ ঘটাতে পারে।

নিয়মিত কোমল পানীয় পানের ফলে শরীর থেকে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান মূত্রের সাথে বেরিয়ে যায়। ফলে বাড়তে থাকে হাড়ক্ষয়ের সম্ভাবনা ও থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের কার্যকারিতা কমে যাওয়া বা হাইপোথাইরয়েডিজম ইত্যাদি জটিলতার সম্ভাবনা। যুক্তরাষ্ট্রের টাফ্টন ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে ব্যাপক আকারে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব নারীরা নিয়মিত কোমল পানীয় পান করেন তাদের কোমরের হাড়ের ঘনত্ব কমে গেছে।

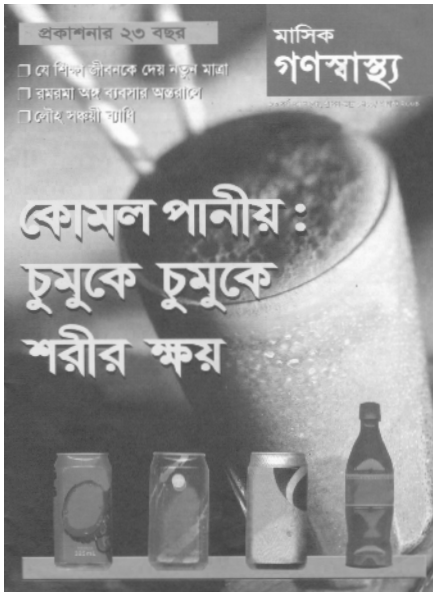

উচ্চমাত্রার ক্যাফেইন : আসক্তির প্রধান কারণ

কোমল পানীয় প্রীতির অন্যতম কারণ এর অত্যধিক ক্যাফেইন। তাই এগুলো একবার খেলে বার বার খেতে চায় মন। বলা হয়, কোনো খাবার বা পানীয়ে উচ্চমাত্রার ক্যাফেইন কাজ করে একটি আসক্তিকর মাদকের মতোই, যা শরীরের সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে সাময়িকভাবে উত্তেজিত করে তোলে। হৃৎস্পন্দন বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু এই সাময়িক উত্তেজনার শেষ পরিণতি হলো অবসন্নতা। উপরন্তু, এর ফলে ধীরে ধীরে দেখা দিতে পারে অনিদ্রা, স্নায়বিক দুর্বলতা বা নার্ভাসনেস, উদ্বেগ। অতিরিক্ত ক্যাফেইন শরীরের স্বাভাবিক হৃৎস্পন্দনকে বাধাগ্রস্ত করে।

গবেষণায় দেখা গেছে, গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত ক্যাফেইন গর্ভপাত, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই প্রসব, কম ওজনের সন্তান প্রসব ও গর্ভস্থ শিশুর জন্মগত ত্রুটি ঘটানোর মতো জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।

এছাড়াও মূত্রাশয় ও পাকস্থলীর ক্যান্সারসহ কমপক্ষে ছয় ধরনের ক্যান্সার ও উচ্চ রক্তচাপের অন্যতম কারণ এই অতিরিক্ত ক্যাফেইন। পাকস্থলীর

ভেতরের আবরণের ওপরও রয়েছে ক্যাফেইনের ক্ষতিকর প্রভাব। কোমল পানীয়ের আরেকটি উপাদান হলো কার্বন-ডাই-অক্সাইড, যা আমরা শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় শরীর থেকে বর্জ্য হিসেবে বের করে দিই। অথচ কোমল পানীয় পানের মাধ্যমে এটি শরীরে প্রবেশ করে।

মা-বাবা-অভিভাবকরা সাবধান!
অতিরিক্ত চিনি ডেকে আনতে পারে অকালমৃত্যু

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, স্বাদ মিষ্টি করার জন্যে প্রতি বোতল কোমল পানীয়তে মেশানো হয় গ্লুকোজ, সুক্রোজ, ফ্রুক্টোজ, স্যাকারিন ইত্যাদি। আর এক বোতল বা এক ক্যান কোমল পানীয়তে থাকা ক্যালরির পরিমাণ হলো ১৬০, যা প্রায় ১০ চামচ চিনির সমান। এ পরিমাণ ক্যালরি পোড়াতে একজন মানুষকে ভারী ব্যায়াম করতে হবে সপ্তাহে চার ঘণ্টারও বেশি। এবং স্বাভাবিকভাবেই তা করা হয়ে ওঠে না। যা শেষপর্যন্ত মেদস্থূলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এর পরিণতি হলো ডায়াবেটিস, মাত্রাতিরিক্ত কোলেস্টেরল, গলব্লাডারে পাথর, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, রক্তনালীর স্থায়ী সংকোচন, স্ট্রোক ও অকালমৃত্যু।

গত কয়েক দশকে সারা বিশ্বে এসব রোগে অকালমৃত্যুর হার বেড়ে যাওয়ার একটি সাধারণ কারণ হিসেবে কোমল পানীয়ের উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করেন স্বাস্থ্য-গবেষকরা।

বোস্টন চিলড্রেন্স হসপিটাল ও হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের একটি যৌথ গবেষণায় বলা হয়েছে, যেসব শিশু নিয়মিত এসব পানীয় পান করতে অভ্যস্ত, তাদের অতিরিক্ত ওজনধারী হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ৬০ ভাগ বেড়ে যায়।

এছাড়াও সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, এসব চিনিযুক্ত পানীয় বা সুগার ড্রিংক কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়। বলা হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের কোলা, সোডা, চিনিযুক্ত পানীয় যারা নিয়মিত পান করেন তাদের কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি স্বাভাবিক একজন মানুষের চেয়ে শতকরা ৩৩ ভাগ পর্যন্ত বেশি। এ ব্যাপারে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডা. এলেইন ওরচেস্টার বলেন, এসব পানীয় নিয়মিত পানের ফলে মুটিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। আর এ থেকেই বাড়ে কিডনিতে পাথর জমার ঝুঁকি। এ গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে আমেরিকান সোসাইটি অব নেফ্রোলজি জার্নালে।

এর প্রেক্ষিতে শুধু পাশ্চাত্যেই নয়, আমাদের দেশেও এখন সচেতন শিশু-বিশেষজ্ঞরা এসব ব্যাপারে মা-বাবা অভিভাবকদের কোমল পানীয়ের ব্যাপারে

সাবধান করে দিচ্ছেন। ২০০৯ সালের ১৪ নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসে আয়োজিত একটি সেমিনারে বিশেষজ্ঞরা বলেন, বর্তমানে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের শিশুদের মধ্যেও যে ডায়াবেটিস ও কিডনি জটিলতা ক্রমশ বেড়ে চলেছে, তার অন্যতম কারণ হলো কোমল পানীয়ের প্রতি ক্রমবর্ধমান আসক্তি। তাই যেসব মা-বাবা তাদের আদরের সন্তানটির বায়না রাখতে কোমল পানীয় কিনে দিচ্ছেন, তিনি আসলে সন্তানের অকালমৃত্যুকেই ডেকে আনছেন। চিনির মাত্রাধিক্যের কারণে সিঙ্গাপুর সরকার ১৯৯২ সালে কোকাকোলা, পেপসিসহ সকল ধরনের কোমল পানীয় স্কুল পর্যায়ে বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

হজম নয়, বদহজমের চূড়ান্ত

তথ্যগত বিভ্রান্তির ফলে আমরা অনেক সময় আমাদের জীবনযাপনে চূড়ান্ত বোকামির প্রকাশ ঘটাই। এর মধ্যে সবচেয়ে হাস্যকর বোকামিটি হচ্ছে বিয়ে বা কোনো উৎসবে ভরপেট খাওয়ার পর মহানন্দে কোমল পানীয় পান করা। অধিকাংশেরই ধারণা, এতে খাবারটা ভালো হজম হবে। এ ধারণার অসারতা বুঝতে কিছু তথ্য জানা প্রয়োজন।

খাবার সবচেয়ে ভালো হজম হয় যখন পাকস্থলীর তাপমাত্রা থাকে ৩৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এ তাপমাত্রায় পাকস্থলীর এনজাইম বা পাচক-রস খাবার হজমের জন্যে সবচেয়ে উপযোগী অবস্থায় থাকে। কিন্তু ভরপেট খাওয়ার পরই আপনি যখন আপনার পাকস্থলীতে শূন্য থেকে চার ডিগ্রি তাপমাত্রার কোমল পানীয় ঢেলে দেন তখন স্বাভাবিকভাবেই হজমের পুরো প্রক্রিয়াটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হজমের বদলে তখন পাকস্থলীতে থাকা খাবার গাঁজন প্রক্রিয়ায় পচতে শুরু করে। কোমল পানীয় পানের কিছুক্ষণ পর খাবার হজমের লক্ষণ মনে করে আপনি যে তৃপ্তির ঢেঁকুরটি তোলেন, তা আসলে খাবার পচনের ফলে সৃষ্ট গ্যাস।

কোমল পানীয়ে কীটনাশক!

হ্যাঁ তাই। এ অবশ্য অনেক পুরনো তথ্য। সেই ২০০৪ সালেই ভারতের অন্ধ্র-প্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের কৃষকরা তাদের জমিতে নামীদামী কোম্পানির কীটনাশক ব্যবহার না করে কোকাকোলা ও পেপসি ব্যবহার করেছেন। এবং চমৎকার সুফল পেয়েছেন, পোকামাকড় সব মরে শেষ! সে বছরই নয়াদিল্লি ও হায়দ্রাবাদে ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় ধরা পড়ে কোকাকোলা-পেপসিতে

মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক রয়েছে, যা শরীরের জন্যে বিশেষত শিশু-কিশোরদের জন্যে ক্ষতিকর। পরে এ নিয়ে দিল্লির স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সেন্টার ফর সায়েন্স এন্ড এনভায়রনমেন্ট বিস্তারিত গবেষণা-প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তারপর শুরু হয় সারা ভারতজুড়ে হৈ চৈ, মামলা-মোকদ্দমা যা শেষপর্যন্ত হাইকোর্ট পেরিয়ে সুপ্রিম কোর্ট অবধি গড়ায়। বিজ্ঞ বিচারপতিরা এর সত্যতা যাচাই করে রায় দেন–'একজন ক্রেতা কী খাচ্ছেন তা জানার অধিকার তার আছে। তাই এসব পানীয়ের বোতলে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি থাকতে হবে যে, এতে কীটনাশক থাকতে পারে।' কোকাকোলা ও পেপসি কোম্পানি তখন এটা তাদের পানীয়ের বোতলে উল্লেখ করতে রাজিও হয়।

সম্প্রতি (অক্টোবর ২০১৩) আবার ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও মান কর্তৃপক্ষকে বাজারের সব কার্বোনেটেড কোমল পানীয়ের ওপর নিয়মিত নজরদারি ও তা পরীক্ষা করে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন। এখন সিদ্ধান্ত একান্তই আপনার–কৃষকরা যা কীটনাশক হিসেবে জমিতে ব্যবহার করছেন সেটাই আপনি পান করবেন কি না।

আমাদের ধর্মবিশ্বাস কী বলে?

কোকের উপাদান বিশ্লেষণ করে গবেষকরা আরো কিছু তথ্য খুঁজে পেয়েছেন। এতে রয়েছে এলকোহল, যা থিতানো হয় ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ১৯০৯ সালের দিকে ক্যালিফোর্নিয়ার সাদা মদও শতকরা ২০ ভাগ এলকোহল ফর্মুলাতেই তৈরি হতো। এছাড়াও বর্ণ গন্ধ ও স্বাদের জন্যে কোকে মেশানো হয় সাইট্রাস, চুনের রস ও অন্যান্য মশলা। শুধু তা-ই নয়, ১৯০৯ সাল অবধি এতে কোকেন পর্যন্ত মেশানো হতো!

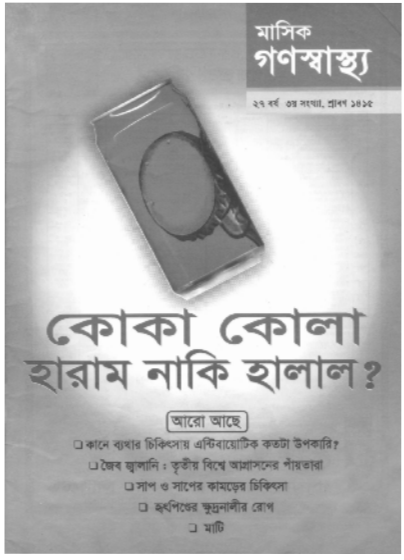

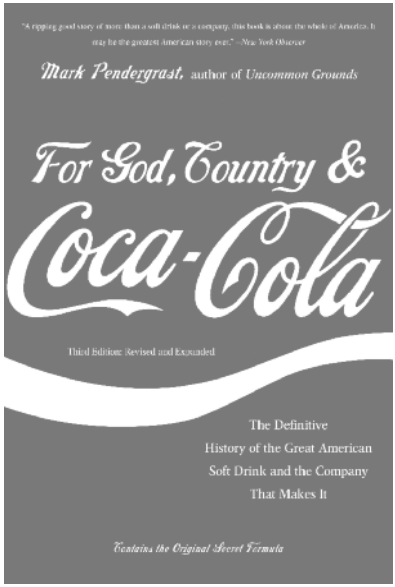

২০০৭ সালে ব্রিটিশ সানডে টাইমস পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, কোকাকোলায় রয়েছে এলকোহল। কোকাকোলা কোম্পানি অবশ্য এর সত্যতা অস্বীকার করে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ কারণেই হয়তো কোকাকোলা কোম্পানি গত এক শতাব্দী ধরে তাদের পানীয়ের ফর্মুলা প্রকাশে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছে এবং এ ব্যাপারে দুজন বিচারকের আদেশকেও অমান্য করেছে তারা। উল্লেখ্য, ১৯৭৭ সালে ভারত সরকার কোকের ফর্মুলা জানতে আগ্রহী হলে কোকাকোলা কোম্পানি দেশটি থেকে তখনকার মতো পাততাড়ি গুটিয়ে নেয়, তবু ফর্মুলা প্রকাশ করে নি। স্বাস্থ্য-গবেষকদের মতে, কোকে উপকারী কিছু তো নেই-ই, বরং এটি হাবিজাবি ক্ষতিকর মশলায় ভরা।

একালের প্রখ্যাত মার্কিন পণ্ডিত গবেষক বক্তা ও টিভি-ব্যক্তিত্ব মার্ক পেন্ডারগ্রাস্ট। ২০০০ সালে তার একটি বই প্রকাশিত হয়–'ফর গড কান্ট্রি এন্ড কোকাকোলা'। শুরু থেকেই ব্যাপকভাবে আলোচিত হয় বইটি। আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা নিউইয়র্ক টাইমস এটিকে সে বছরের উল্লেখযোগ্য বই হিসেবে আখ্যায়িত করে। ডিসকভার ম্যাগাজিন বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করে বইটির ওপর।

দীর্ঘ অনুসন্ধান ও গবেষণার ভিত্তিতে রচিত এ বইটিতে কোকাকোলাসহ অন্যান্য কোমল পানীয়ের অনেক অজানা দিক উন্মোচন করেন পেন্ডারগ্রাস্ট। তিনিই প্রথমবারের মতো বলেন, কোকাকোলার ফর্মুলায় এলকোহলের উপস্থিতি রয়েছে। তার ভাষায়–'শিশুরাও মদ খাচ্ছে, কারণ মা-বাবারা তাদের হাতে কোকের গ্লাস তুলে দিচ্ছেন'।

এ তথ্য প্রকাশের সাথে সাথে নড়েচড়ে বসেছেন অনেকেই। বিশেষত

মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর সংশ্লিষ্ট মুখপাত্রেরা বলছেন, কোকাকোলার বোতলের গায়ে এলকোহলের উল্লেখ না থাকায় মুসলমানদের পক্ষে এর উপাদান সম্পর্কে জানা সম্ভব হচ্ছে না। আর এই কৌশলগত গোপনীয়তার ফলে মুসলমানরা না জেনে এলকোহল খাচ্ছেন! কিন্তু এলকোহল থাকার কারণে এটি স্পষ্টতই মুসলমানদের জন্যে হারাম হয়ে গেছে। পবিত্র কোরআন ও হাদীসে উল্লেখ রয়েছে–কোনো খাদ্য নিয়ে এমন সন্দেহের সম্মুখীন হলে তা অবশ্যই বর্জনীয়।

মালয়েশিয়াভিত্তিক ভোক্তাদের সংগঠন 'উটুসান কনজ্যুমার' থেকে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'কোকে রয়েছে এলকোহল, তাই মুসলমানদের জন্যে এটি সম্পূর্ণ হারাম'। তারাও তাদের একটি বইতে প্রকাশ করেছে কোক তৈরির গোপন ফর্মুলা। এসব তথ্য প্রকাশিত হওয়ার পর সচেতন মুসলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তারা বলেছেন, এভাবে ফর্মুলা গোপন রেখে কোকাকোলা কোম্পানি মুসলমানদের বিভ্রান্ত করেছে ও না জেনে মদ্যপানে বাধ্য করছে। ক্রেতাদেরকে গোপনে হারাম খাওয়ানোকে তারা দেখছেন মানুষের দীর্ঘকালীন বিশ্বাসের প্রতি একটি বড় আঘাত হিসেবে।

এশিয়া-উইক সাময়িকীর একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এ প্রসঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার উলামা কাউন্সিল ঘোষণা করেছে–'মুসলমানদের জন্যে এক ফোঁটা এলকোহলও হারাম।' মালয়েশিয়ার মুসলমান সমাজকে 'Always CocaCola' জাতীয় চটকদার বিজ্ঞাপনের ফাঁদে না পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন সে দেশের বিজ্ঞ সমাজ।

এখানেই শেষ নয়। মার্ক পেন্ডারগ্রাস্টের মতে, কোকাকোলার আরেকটি উপাদান গ্লিসারিন। কোকাকোলা কোম্পানিও তাদের পানীয়ে গ্লিসারিন থাকার বিষয়টি অস্বীকার করে নি। গ্লিসারিন হচ্ছে তেল ও চর্বির উপজাত, যা ব্যবহৃত হয় সাবান তৈরিতে। অনেকেরই আশঙ্কা, মুসলমানদের জন্যে নিষিদ্ধ বা হারাম প্রাণী থেকেও এ চর্বি সংগৃহীত হতে পারে।

কোকে এলকোহল ও গ্লিসারিন-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর এখন প্রশ্ন উঠেছে, আর কী কী সন্দেহজনক উপাদান রয়েছে এসব পানীয়ে? কিন্তু জানতে চাইলেই তো আর জানা যায় না, কারণ গত এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এ নিয়ে চলছে এক অবিশ্বাস্যরকম গোপনীয়তা। বলা হয়ে থাকে, সেই ১৮৯২ সাল থেকেই কোকাকোলার মূল ফর্মুলা আজও আমেরিকার একটি গোপন রহস্য। আর এর ফর্মুলা সংরক্ষিত আছে

যুক্তরাষ্ট্রের একটি ব্যাংকের ভল্টে। শুধুমাত্র কোকাকোলা কোম্পানির চীফ কেমিস্ট এর প্রকৃত মাল-মশলা সম্বন্ধে জানেন এবং একজন চীফ কেমিস্ট-এর অবসর গ্রহণের সময় অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে তার উত্তরসূরির কাছে এ তথ্য হস্তান্তর করা হয়। কোকাকোলা কোম্পানিকে সে দেশের আদালত এ পর্যন্ত দুবার এই ফর্মুলা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে। কোম্পানিটি এ নির্দেশ না মানার দরুন বিপুল অংকের ক্ষতিপূরণ দিয়েছে, কিন্তু ফর্মুলা প্রকাশ করে নি।

দীর্ঘ সমীক্ষার পর মালয়েশিয়াভিত্তিক পত্রিকাটি কোক এবং অন্যান্য কোমল পানীয়কে মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণ হারাম বলে আখ্যায়িত করে। কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে, অন্যান্য পানীয়গুলোও কমবেশি একই পদ্ধতিতেই তৈরি হচ্ছে, তাই এগুলোতেও এলকোহল এবং অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদান থাকাটা খুব স্বাভাবিক। এছাড়াও সব ধরনের কোমল পানীয়ে ব্যবহৃত ইথানলও সম্পূর্ণ হারাম। কারণ, এটি একটি মাদক।

নবীজী (স) বলেন, 'যা বৈধ তা সুস্পষ্ট, যা অবৈধ সেটাও সুস্পষ্ট। কিন্তু এর মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে কিছু সন্দেহজনক জিনিস যা অনেক মানুষই জানে না, সেগুলো থেকে যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, সে তার ধর্ম ও সম্মানকে নিষ্কলুষ রাখে' (বোখারি ও মুসলিম)। মধু, ভুট্টা, বার্লি ইত্যাদিকে গাঁজিয়ে মাদক তৈরি করলে সেটা হালাল কি না, সে ব্যাপারে একবার নবীজী (স)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। উত্তরে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, প্রতিটি মাদকই হারাম। অর্থাৎ মূলত মানবদেহের জন্যে ক্ষতিকর ও অপকারী বস্তুগুলোই ইসলামে হারাম হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

এনার্জি ড্রিংকস ॥ পরিণতি ভয়াবহ

কোমল পানীয়ের সর্বনাশা বাণিজ্যের পথ ধরে বাজার সয়লাব হয়ে উঠেছে এনার্জি ড্রিংকসে। কী আছে এতে? বিশেষজ্ঞদের মতে, কোমল পানীয়ের সব ক্ষতিকর দিকগুলো তো বটেই, তার সাথে এসব পানীয়ে রয়েছে আরো বেশি মাত্রার ক্যাফেইন, অপিয়েট ও সিলডেনাফিল সাইট্রেট-এর মতো ক্ষতিকর উপাদান। যার পরিণতি হতে পারে ভয়াবহ। এনার্জি ড্রিংকস পুরুষদের ক্ষেত্রে যৌনশক্তি হ্রাস, সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা, হৃদরোগ এবং নারীদের ক্ষেত্রে গর্ভপাত ও দুর্বল শিশু জন্ম দেয়ার মতো দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে।

রেডিওলজিক্যাল সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকার সাম্প্রতিক একটি গবেষণা-প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পুরুষরা এনার্জি ড্রিংকস পান করার একঘণ্টার মধ্যে হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের মাত্রা বেড়ে যায়, যা হৃৎপিণ্ডের ওপর

অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে। জার্মানির ইউনিভার্সিটি অব বন-এর একটি গবেষণার ফলাফলেও একই কথা বলা হয়েছে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের হাসপাতালগুলোর জরুরি বিভাগে এনার্জি ড্রিংক পান সংশ্লিষ্ট অসুস্থতা নিয়ে ভর্তি হওয়া রোগীর সংখ্যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের 'দি সাবস্ট্যান্স এবিউজ এন্ড মেন্টাল হেলথ সার্ভিসেস এডমিনিস্ট্রেশন' থেকে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, ২০০৫ সাল থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে অন্যান্য এলকোহল জাতীয় পানীয় বা মাদকের সঙ্গে গ্রহণ করা এনার্জি ড্রিংক পানে অসুস্থতা নিয়ে হাসপাতালে আসা রোগীর সংখ্যা আগের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ বেড়েছে। এদের মধ্যে ১৮ থেকে ৩৯ বছর বয়সী পুরুষদের সংখ্যাই বেশি বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

বছর কয়েক আগে ফ্রান্সে ১৮ বছরের এক তরুণ বাস্কেটবল খেলার পর চার ক্যান 'রেড বুল' খেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে বলা হয়, উচ্চ রক্তচাপের সাথে এনার্জি ড্রিংকসের উচ্চমাত্রার ক্যাফেইন মিশে 'সাডেন এডাল্ট ডেড সিনড্রোম' থেকেই তার মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনার পর ফ্রান্স সরকার সে দেশে রেড বুল এনার্জি ড্রিংকসটি নিষিদ্ধ করে।

সম্প্রতি দেশের একটি জাতীয় দৈনিকে এনার্জি ড্রিংকস ও এদের ক্ষতিকর দিক নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় (প্রথম আলো, ৮ জানুয়ারি ২০১৩)। তাতে বলা হয়েছে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বাজার থেকে বিভিন্ন কোম্পানির এনার্জি ড্রিংকসের নমুনা সংগ্রহ করার পর তা কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে। দেখা গেছে, এসব পানীয়ে এমন সব উপাদান রয়েছে যা জনস্বাস্থ্যের জন্যে হুমকির কারণ। দেশের বাজারে প্রচলিত সাত ধরনের এনার্জি ড্রিংকসে উচ্চমাত্রার ক্যাফেইনের পাশাপাশি অপিয়েট ও সিলডেনাফিল সাইট্রেট পাওয়া গেছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যেখানে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রচলিত পানীয়গুলোতে প্রতি লিটারে ক্যাফেইনের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৫০ মিগ্রা, সেখানে আমাদের দেশের পানীয়গুলোতে সহনীয় মাত্রার চেয়ে পাঁচগুণ, এমনকি কোনো কোনোটাতে তারও বেশি পরিমাণ ক্যাফেইন পাওয়া গেছে। এছাড়াও এসব কার্বোনেটেড পানীয়ে ব্যবহৃত হয় সিনথেটিক ক্যাফেইন, যা আরো ভয়াবহ।

আর অপিয়েট ও সিলডেনাফিল নামের এ দুটি রাসায়নিক উপাদান ঔষধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৮২ অনুযায়ী নিষিদ্ধ। কারণ, সিলডেনাফিল সাইট্রেট

ধীরে ধীরে যৌনশক্তি নিঃশেষ করে ফেলতে পারে। আর অপিয়েট ও অতিরিক্ত ক্যাফেইন মানুষকে ধীরে ধীরে কড়া নেশার জগতে ধাবিত করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের অধ্যাপক আ ব ম ফারুক এসব পানীয়ের নেশাকে আরো বড় নেশার জগতে প্রবেশের জন্যে 'ওয়েটিং রুম' হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সিলডেনাফিল সাইট্রেট মেশানো পানীয় পর্যায়ক্রমে পুরুষত্ব নষ্ট করে ফেলবে। হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে লিভার ও কিডনি।

এর সাথে একমত পোষণ করে দেশের বিশিষ্ট চিকিৎসক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. এ বি এম আবদুল্লাহ বলেন, এসব পানীয় দীর্ঘদিন পান করলে ধীরে ধীরে স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। গর্ভবতী নারীর সন্তান বিকলাঙ্গ হতে পারে। রুচি নষ্ট ও মেজাজ হয়ে উঠতে পারে খিটখিটে। উপরন্তু, শিশুদের জন্যে এগুলো খুবই ক্ষতিকর। এসব তথ্যের প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের পরিচালক এ ধরনের পানীয় প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

মিথ্যা প্রচার আর মনমাতানো বিজ্ঞাপনে প্রলুব্ধ হয়ে এ যুগের মানুষ কোমল পানীয় ও এনার্জি ড্রিংকসের সর্বনাশা ফাঁদে পা দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের সবারই খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে, স্বাস্থ্য আমার আর একে সুস্থ রাখার দায়িত্বও আমার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোমল পানীয় ও এনার্জি ড্রিংকসসহ এরকম যত কৃত্রিম ও প্রক্রিয়াজাত পানীয় রয়েছে তাতে উপকারী কিছু তো নেই-ই বরং রয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিকর একাধিক উপাদান। তাই এসব জঞ্জাল শরীরের জন্যে সত্যিকার অর্থে অপ্রয়োজনীয়। কারণ, শরীরে পানির চাহিদা মেটাতে সাধারণ বিশুদ্ধ পানিই যথেষ্ট।

তাদের মতে, বাজারে প্রচলিত কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংকসসহ সব ধরনের প্রক্রিয়াজাত পানীয় এবং প্যাকেটজাত ও বোতলজাত জুস সবই আসলে কমবেশি একই উপাদান দিয়ে তৈরি। আর এসব পানীয়তে বর্ণ, গন্ধ ও প্রিজারভেটিভ হিসেবে যা ব্যবহৃত হয়, তার অধিকাংশই মানবদেহের জন্যে ক্ষতিকর ও নীরব ঘাতক।

তথ্যসূত্র : মার্ক পেন্ডারগ্রাস্ট-এর লেখা 'ফর গড, কান্ট্রি এন্ড কোকাকোলা'
জার্নাল অব আমেরিকান সোসাইটি অব নেফ্রোলজি
ওয়েব-এমডি ডটকম
মাসিক গণস্বাস্থ্য (আগস্ট ২০০৪ ও জুলাই ২০০৮)

চিনি ॥ হোয়াইট পয়জন এলকোহলের মতোই বিপজ্জনক!

৩৫ মিলিয়ন মৃত্যু ঘটাবে চিনি

চিনি শরীরের জন্যে এলকোহলের মতোই বিপজ্জনক। সেইসাথে আসক্তি সৃষ্টিকারীও বটে। শুধু তা-ই নয়, চিনি খাওয়ার সাথে দীর্ঘমেয়াদি অসংক্রামক ব্যাধি যেমন : হৃদরোগ ডায়াবেটিস ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ার সরাসরি সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছেন চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা। জাতিসঙ্ঘের সাম্প্রতিক ঘোষণা অনুযায়ী, ভবিষ্যতে এ রোগগুলো বছরে ৩৫ মিলিয়ন মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশুরোগ বিভাগের প্রফেসর রবার্ট এইচ লাস্টিগ ও তার একদল সহকর্মী অতিরিক্ত চিনি খাওয়ার ফলাফল নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করেন। তারা দেখেছেন, অতিরিক্ত চিনি গ্রহণের ফলে আপনার শরীরে দেখা দিতে পারে নানারকম বিষক্রিয়া। এছাড়াও সব ধরনের বিপাকজনিত রোগ, যেমন : উচ্চ রক্তচাপ (চিনির ফ্রুক্টোজ ইউরিক এসিডের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়, রক্তচাপ বৃদ্ধিতে যার ভূমিকা রয়েছে), কোলেস্টেরলের আধিক্য, ফ্যাটি লিভার, ডায়াবেটিস, মেদস্থূলতা ও বার্ধক্য প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হওয়ার সাথে চিনির সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এসব কারণেই বিশ্বজুড়ে এখন চিনির আরেক নাম 'হোয়াইট পয়জন'।

মেদস্থূলতার অন্যতম কারণ চিনি

বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু উন্নত দেশগুলোতেই নয় বরং যেসব দেশে পাশ্চাত্যের অনুকরণে প্রক্রিয়াজাত খাবারের প্রচলন বাড়ছে সেখানে মেদস্থূলতা ও এ জাতীয় সমস্যাগুলো ভয়াবহ আকার ধারণ করতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই বিশ্বজুড়ে অপুষ্টিতে আক্রান্ত মানুষের চেয়ে মেদবহুল মানুষের সংখ্যা শতকরা ৩০ ভাগ বেশি!

মেদস্থূলতাই একমাত্র সমস্যা নয়, স্বাভাবিক ওজন যাদের, তারাও প্রায় সমান ঝুঁকিতে আছেন বলে জানাচ্ছেন পুষ্টিবিজ্ঞানীরা। কারণ, অতিরিক্ত চিনি

গ্রহণের ফলে এদের মধ্যে শতকরা ৪০ জনের ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, করোনারি হৃদরোগ, উচ্চ কোলেস্টেরল ও লিভারের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

The toxic truth about sugar

Added sweeteners pose dangers to health that justify controlling them like alcohol, argue Robert H. Lustig, Laura A. Schmidt and Claire D. Brindis.

অতিরিক্ত চিনি গ্রহণ ঘটাতে পারে সামাজিক বিপর্যয়!

গত ৫০ বছরে পৃথিবীজুড়ে চিনির ব্যবহার তিনগুণ বেড়েছে। ইউরোপ-আমেরিকার মতো দেশগুলোতে খাদ্যাভ্যাসজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকির অন্যতম কারণ এই চিনি। সাম্প্রতিক একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, চিনিতে থাকা ফ্রুক্টোজ যকৃতে বিষক্রিয়া ও নানারকম দীর্ঘমেয়াদি রোগের কারণ। এভাবে অতিরিক্ত চিনি গ্রহণ মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়।

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, অতিরিক্ত চিনি খাওয়ার ফলে দীর্ঘমেয়াদি যেসব রোগ হয়ে থাকে তা খুব ধীরে ঘটে বলে তাৎক্ষণিকভাবে টের পাওয়া যায় না। চিনি যে এভাবে ব্যক্তিস্বাস্থ্যের পাশাপাশি সামাজিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তা নিয়ে জনস্বাস্থ্য সংস্থাগুলোও ক্রমশ সোচ্চার হয়ে উঠছে। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রতি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হলো– চিনির উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।

এলকোহলের মতোই বিপজ্জনক আর আসক্তি সৃষ্টিকারী

এক দশকেরও বেশি সময় আগে, সমাজ-মনোবিজ্ঞানী টমাস বিবার ও তার সহযোগীরা সামাজিক স্বাস্থ্যের ওপর এলকোহলের প্রভাব নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা পরিচালনা করেন। এর ভিত্তিতে ২০০৩ সালে একটি উল্লেখযোগ্য বইও প্রকাশ করেন তারা। এলকোহলের নেতিবাচক প্রভাবগুলো সবিস্তারে তুলে ধরা হয় বইটিতে।

তাতে বলা হয়েছে, এলকোহলের মতো চিনিও একইরকম সামাজিক দুর্গতি ঘটাতে পারে। কারণ, এখন প্রায় সব ধরনের প্রক্রিয়াজাত খাবারেই প্রচুর পরিমাণে চিনি ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যকৃতের ওপর ফ্রুক্টোজের বিষক্রিয়া এলকোহলের মতোই। আর এতে তেমন অবাক হওয়ারও কিছু নেই। কারণ, চিনির গাঁজনের মাধ্যমেই এলকোহল তৈরি হয়। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, অতিরিক্ত চিনি গ্রহণের ফলে মানবদেহে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে ও বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

তামাক এবং এলকোহলের মতোই চিনিও আসক্তি সৃষ্টি করে। চিনি যত খাওয়া হয়, তত এটি মস্তিষ্ককে উদ্দীপ্ত করে আরো খাওয়ার জন্যে। চিনি খাওয়ার ফলে গ্রেলিন, লেপটিন, ডোপামিন ইত্যাদি হরমোনের স্বাভাবিক প্রবাহ-ছন্দ কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়, যা মস্তিষ্কে ক্ষুধার অনুভূতি বাড়িয়ে দেয় এবং আমরা অতিরিক্ত পরিমাণ খাবার গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে উঠি।

জাতীয় নিরাপত্তার হুমকি!

পরোক্ষ ধূমপান ও মাদকাসক্তির কারণে মৃত্যুহার বেড়ে যাওয়ায় গত কয়েক দশক ধরে বিশ্বজুড়ে সচেতন মানুষ তামাক, এলকোহল ইত্যাদির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের দাবি জানিয়ে আসছেন। চিনি খাওয়ার দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনা করে তারা এখন সোচ্চার হয়ে উঠেছেন চিনির বিরুদ্ধেও।

কারণ, খোদ আমেরিকাতেই শুধু বিপাকজনিত অসুস্থতার চিকিৎসায় বছরে ব্যয় হয় ১৫০ বিলিয়ন ডলার, যা আমেরিকায় স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়িত মোট অর্থের ৭৫ ভাগ। সেখানে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে গিয়ে শতকরা ২৫ জনই অযোগ্য ঘোষিত হচ্ছেন শুধুমাত্র মেদস্থূলতার কারণে। এ অবস্থায় আমেরিকার সাবেক তিনজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা ও ইউএস জয়েন্ট চীফ অব স্টাফ-এর বর্তমান চেয়ারম্যান মেদস্থূলতাকে অভিহিত করেছেন 'জাতীয় নিরাপত্তার হুমকি' হিসেবে।

সব খাবারেই চিনির ভূত ॥ চাই সচেতনতা ও কার্যকর উদ্যোগ

ভোগ্যপণ্য হিসেবে চিনির ব্যবহার কমানোর ব্যাপারে বিশ্বজুড়ে সচেতনতা দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু কীভাবে সম্ভব এটি, যখন আমাদের প্রায় সব খাবারেই চিনি একটি অন্যতম অপরিহার্য উপাদান হয়ে উঠেছে! বিশেষজ্ঞদের পরামর্শটা এবার সরাসরি–তা হলো, চিনি এবং চিনিযুক্ত সকল প্রক্রিয়াজাত খাবার ও পানীয় যেমন : বিভিন্ন ধরনের কোমল পানীয়, সোডা, বোতলজাত জুস, স্পোর্টস ড্রিংকস ইত্যাদি পণ্যে বিক্রয়-কর ও মূল্য সংযোজন কর

বাড়ানো, যেমনটি করা হয়েছে তামাক ও এলকোহলের ক্ষেত্রে। সেইসাথে চিনির উৎপাদন ও এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও চাই যথাযথ মনোযোগ।

কানাডা ও ইউরোপের কিছু দেশ ইতোমধ্যেই এ পদক্ষেপ অনুসারে কাজ শুরু করেছে। চিনি এবং চিনিযুক্ত প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্যে উচ্চ হারে কর-আরোপ করেছে তারা। আমেরিকাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। কারণ, জরিপে দেখা গেছে, একজন আমেরিকান বছরে ২১৬ লিটার সোডা পান করে, যার শতকরা ৫৮ ভাগই হলো চিনি। তাই প্রতি ক্যান সোডায় ১০-১২ সেন্ট বাড়তি কর নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানে। মার্কিন নীতিনির্ধারকরা মনে করছেন, এতে একদিকে যেমন বছরে বাড়তি রাজস্ব আদায় হবে ১৪ বিলিয়ন ডলার, তেমনি এসব খাবার ও পানীয় গ্রহণের হার কিছুটা হলেও কমবে।

শিশুরা যেন থাকে নিরাপদ

ফ্রান্স হাঙ্গেরি ডেনমার্কও ইতোমধ্যেই কিছু প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো অধিক চর্বিযুক্ত খাবার ও চিনির ওপর উচ্চ কর-আরোপ। শুধু তা-ই নয়, অতিরিক্ত চিনিযুক্ত খাবার যেমন : ফাস্টফুড, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কোমল পানীয় ও বোতলজাত জুসের ব্যাপারে শিশু-কিশোরদের নিরুৎসাহিত করে তুলতে উন্নত বিশ্বের অনেক স্কুল-কলেজ তাদের ক্যাফেটেরিয়ার ভেন্ডিং মেশিন থেকে এসব খাদ্যপণ্য সরিয়ে নিয়েছে।

চিনি নিয়ে পাশ্চাত্যের সাম্প্রতিক এই ভয়াবহ পরিস্থিতি আমাদেরকে এ ইঙ্গিতটিই দিচ্ছে যে, এ বিষয়ে আমাদেরও যথাযথ সচেতনতা জরুরি। আর তাই একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে নিজেরা সচেতন হওয়ার পাশাপাশি আমাদের পরিবার কর্মক্ষেত্র স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়সহ চারপাশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমরা এ ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করে তুলতে পারি।

তথ্যসূত্র : বিজ্ঞান সাময়িকী 'নেচার'-এ প্রকাশিত স্বাস্থ্য-নিবন্ধ
'দি টক্সিক ট্রুথ এবাউট সুগার' (২ ফেব্রুয়ারি ২০১২)

টেস্টিং-সল্ট ॥ সুস্বাদু 'স্নায়ু বিষ'

মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট, সংক্ষেপে এমএসজি। 'টেস্টিং-সল্ট' নামেই এটি আমাদের কাছে বেশি পরিচিত। আজকাল প্রক্রিয়াজাত খাবার যেমন : নুডলস চিপ্স ফাস্টফুড এবং প্রধানত চাইনিজ খাবারে দেদারসে ব্যবহার করা হচ্ছে এটি। যুক্তি একটাই–এতে খাবারটা হবে আরো মজাদার ও সুস্বাদু। কিন্তু কৃত্রিম স্বাদ বৃদ্ধিকারী টেস্টিং-সল্ট নিয়ে বিশ্বব্যাপী একাধিক গবেষণার পর বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ এক ভয়ানক নীরব ঘাতক। পাশ্চাত্যের একটি গবেষণা-প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, টেস্টিং-সল্টের আগ্রাসন বিশ্বজুড়ে এলকোহল ও নিকোটিনের চেয়েও বড় বিপদ ঘটাতে পারে।

বিশ শতকের শুরুর দিকে ১৯০৮ সালে জাপানি রসায়নবিদ ও টোকিও ইমপেরিয়াল ইউনিভার্সিটির গবেষক কিকুনেই ইকেদা এটি উদ্ভাবন করেন। তখন এটি যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে খাবার-সুগন্ধকারী উপাদান হিসেবে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে অনেকগুলো গবেষণায় ক্রমেই এর স্বাস্থ্যহানিকর দিকটি সচেতন বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন।

গবেষকদের মতে, টেস্টিং-সল্ট নানাভাবে মস্তিষ্কের ক্ষতিসাধন করে। বিভিন্ন গবেষণা-প্রতিবেদনে তাই একে অভিহিত করা হয়েছে 'স্নায়ু বিষ' হিসেবে। শিশুদের জন্যে এটি আরো মারাত্মক। চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, টেস্টিং-সল্টের প্রতিক্রিয়ায় তীব্র মাথাব্যথা, হজমযন্ত্রের গোলযোগ, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, খিঁচুনিসহ বিভিন্ন রকম সমস্যা এমনকি দীর্ঘমেয়াদে মস্তিষ্কের ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে।

চাইনিজ ও প্রক্রিয়াজাত খাবারে স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে ॥ শিশুরাই আছে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে

ভোজনরসিকদের কাছে চাইনিজ, ইন্ডিয়ান ও থাই রেস্টুরেন্টগুলোর খাবার পছন্দের শীর্ষে। জানা গেছে, এসব রেস্টুরেন্টে পরিবেশিত স্যুপ, ফ্রাইড রাইস, ফ্রাইড চিকেনসহ প্রায় সব খাবারেই টেস্টিং-সল্ট ব্যবহার করা হচ্ছে ব্যাপকভাবে। সে কারণেই চাইনিজ খাবার এত সুস্বাদু। শুধু তা-ই নয়, ছোট

বড় বিভিন্ন ফাস্টফুডের দোকানগুলোর খাবারেও এর ব্যবহার এখন রীতিমতো মাত্রাছাড়া। টেস্টিং-সল্টের আগ্রাসন থেকে বাদ যাচ্ছে না কাবাব এবং সাধারণ হোটেলের খাবারও। নিয়মিত এসব খাবার খেয়ে রসনা তৃপ্ত করছেন যারা, ঘুণাক্ষরেও তারা জানেন না–নিজেদের অজান্তেই শরীরের কী ক্ষতি তারা করে চলেছেন।

পৃথিবীর অনেক দেশেই খাদ্যপণ্যে টেস্টিং-সল্টের ব্যবহার সরকারি আদেশে নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত। তাই কিছু বহুজাতিক কোম্পানি রয়েছে যারা সেসব দেশে তাদের পণ্যে টেস্টিং-সল্ট ব্যবহার করতে না পারলেও কেবলমাত্র দুর্বল আইনের সুযোগ নিয়ে এদেশে অনায়াসেই টেস্টিং-সল্টযুক্ত খাবার বাজারজাত করছে। তেমনই একটি বহুজাতিক কোম্পানি আমাদের দেশে বাজারজাতকৃত তাদের ব্র্যান্ডেড স্যুপ ও নুডলসে টেস্টিং-সল্ট ব্যবহার করছে। কিন্তু পাশের দেশ ভারতে তারা তা পারছে না বরং ওখানে তাদের পণ্যের মোড়কে উল্লেখ থাকে–'নো এডেড এমএসজি' অর্থাৎ এটি টেস্টিং-সল্টমুক্ত।

শিশুদের পছন্দের খাবার চিপ্স। এতে ব্যবহৃত হচ্ছে মাত্রাতিরিক্ত টেস্টিং-সল্ট। এছাড়াও প্যাকেটজাত স্যুপ, নুডলস, সসেজ, বোতলজাত মাংস ও সব্জি, এমনকি চানাচুর, ডাল ভাজা এবং কোনো কোনো কোম্পানির বিস্কুটের মতো অনেক শুকনো খাবারে পর্যন্ত এটি হরদম মেশানো হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, একজন পরিণত মানুষের চেয়ে শিশুর মস্তিষ্কের কোষকে টেস্টিং-সল্ট দ্রুত নিষ্ক্রিয় ও অবসন্ন করে দিতে পারে। তাই অভিভাবকরা নানা ব্র্যান্ডের চিপ্সের নামে সন্তানদের জন্যে মূলত বিষ কিনে দিচ্ছেন।

টেস্টিং-সল্ট নিয়ে বিশ্বব্যাপী যত গবেষণা হয়েছে তার সবগুলোতেই প্রমাণিত হয়েছে যে, এটি মানবদেহের জন্যে ক্ষতিকর। আর ক্ষতির পরিমাণ প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে শিশুদের ক্ষেত্রে চারগুণ বেশি। এ কারণে ১৯৬৯ সালে শিশুদের খাবারে টেস্টিং-সল্টের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো।

পুষ্টিবিজ্ঞানী জুডিথ রিচার্ড বলেন, চাইনিজ রেস্টুরেন্টে খাওয়ার পর যদি কারো তীব্র মাথাব্যথা, বমি ভাব, খিঁচুনি, চামড়ায় ফুসকুড়ি, হাত-পায়ে দুর্বলতা ও কাঁপুনি, বুকে চাপ, অবসাদ, ঝিমুনিভাব ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়, তবে বুঝতে হবে এটি টেস্টিং-সল্টের প্রতিক্রিয়ার ফল। এ সবগুলো লক্ষণকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নামকরণ করেছে 'চাইনিজ রেস্টুরেন্ট সিনড্রোম'। আর এর প্রধানতম কারণ টেস্টিং-সল্ট।

এছাড়াও টেস্টিং-সল্টযুক্ত খাবার গভীর মনোযোগে কাজ করার ক্ষমতাকে

ব্যাহত করে, মেজাজ হয়ে উঠতে পারে তিরিক্ষি। তাই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হলো, টেস্টিং-সল্ট পুরোপুরি বর্জন করুন এবং যতটা সম্ভব এসব রেস্টুরেন্ট এড়িয়ে চলুন।

আর, কোনো খাবারে টেস্টিং-সল্ট আছে কি না, সেটি একটু খেয়াল করলেই বোঝা সম্ভব। এসব খাবার মুখে দিলেই একটা ঝাঁঝালো নোনা স্বাদ পাওয়া যায়। ওটা টেস্টিং-সল্টেরই 'কৃতিত্ব'। এটি ছেলে-বুড়ো সবার কাছেই বেশ সুস্বাদু ঠেকে, তাই এসব খাবার খেতে মন চায় বার বার।

গর্ভাবস্থায় সাবধান!

অনাগত সন্তানের সুস্থতার জন্যেই গর্ভবতী মায়েদের টেস্টিং-সল্টযুক্ত খাবার পরিহার করা উচিত। এ প্রসঙ্গে পুষ্টিবিজ্ঞানী লিন্ডা অ্যান মিকারসন বলেন, টেস্টিং-সল্টে থাকা এক্সাইটোটক্সিন বা উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বিষাণু শরীরের সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করে তোলে। যার ফলে তীব্র মাথাব্যথা, এমনকি গর্ভপাত পর্যন্ত হতে পারে।

পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের ধারণা, গর্ভবতী মায়ের খাবারে অতিমাত্রায় টেস্টিং-সল্টের ব্যবহার অনাগত সন্তানের অটিজম, মস্তিষ্কের রোগ ও বুদ্ধিবৃত্তিক অসম্পূর্ণতা নিয়ে জন্মানোর মতো দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বাড়াতে পারে। উল্লেখ্য, ৬০-এর দশক থেকে চীনা খাবারসহ অন্যান্য টেস্টিং-সল্টযুক্ত খাবারের শিল্পোৎপাদন ও বাণিজ্য বৃদ্ধির সাথে বিশ্বব্যাপী বুদ্ধি-প্রতিবন্ধী শিশুর জন্মহার বেড়ে যাওয়ার একটি অন্তর্নিহিত সম্পর্ক রয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। গত তিন দশকে টাইপ ২ ডায়াবেটিস বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবেও এর দিকেই সন্দেহের আঙুল তুলেছেন গবেষকরা।

দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি ॥ সচেতনতাই হতে পারে একমাত্র সমাধান

'আপনার স্বাস্থ্যে এমএসজি প্রতিক্রিয়া' শীর্ষক একটি নিবন্ধে ভারতের বিশিষ্ট স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞ উমা শংকরী বলেন, টেস্টিং-সল্ট স্নায়ুকোষকে হত্যা করে। যেসব খাদ্যে অধিক পরিমাণ টেস্টিং-সল্ট রয়েছে সেগুলো ভোক্তাদের মাঝে মাদকের মতো আসক্তি ও নেশার সৃষ্টি করে। তাই মানুষ এগুলো বার বার খেতে চায়। তার মতে, কম চর্বিযুক্ত খাবার তেমন সুস্বাদু নয় বলে তা মানুষকে খুব বেশি আকৃষ্ট করে না, কিন্তু তাতে যদি টেস্টিং-সল্ট মেশানো হয় তবে খাবারের স্বাদ বৃদ্ধি পায়। যা হয়তো তৃপ্তিদায়ক, কিন্তু ক্ষতিকর।

গবেষণায় দেখা যায়, প্রচুর টেস্টিং-সল্টযুক্ত টমেটো সস, সয়া সস জাতীয় খাবারগুলোতে মানুষ দ্রুত আসক্ত হয়ে পড়ে। ইঁদুরের বাচ্চার খাবারে টেস্টিং-সল্ট প্রয়োগ করে দেখা গেছে, এদের স্নায়ুকোষগুলো সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, টেস্টিং-সল্ট মেদস্থূলতা, মস্তিষ্কের নানারকম রোগসহ মস্তিষ্কের ক্যান্সার, মলাশয় ও স্তন ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, পার্কিনসন্স, আলঝেইমার্স, ফাইব্রোমায়েলজিয়া, গেঁটে বাত, অনিদ্রা, বিষণ্নতা ইত্যাদি দীর্ঘস্থায়ী রোগ সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়াও যারা বিভিন্ন রকম এলার্জি, হাঁপানি ও ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত তারাও টেস্টিং-সল্টের প্রতিক্রিয়ায় ভুগতে পারেন।

পাশ্চাত্যে টেস্টিং-সল্টের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা দিন দিন বাড়ছে। তাই সেখানে অনেক রেস্টুরেন্টে খদ্দেরদের আশ্বস্ত করার জন্যেই 'এমএসজি ফ্রি রেস্টুরেন্ট' সাইনবোর্ড টাঙানো থাকে। আর এ থেকেই বোঝা যায় তাদের সচেতনতা। নিজেদের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়াতে তাই আমাদের দেশেও চাই এ ধরনের সচেতনতা, যাতে আমরা জেনে-শুনে বিষপান থেকে মুক্ত থাকতে পারি।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য। খাদ্যপণ্য কেনার সময় প্যাকেটের গায়ে ভালোভাবে এর উপাদানগুলো দেখে নিন–তাতে টেস্টিং-সল্টের উল্লেখ আছে কি না। বিশ্বব্যাপী সচেতনতা গড়ে ওঠার পর থেকে খাদ্য-প্রস্তুতকারী বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো এখন তাদের বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্যের প্যাকেটের গায়ে সরাসরি 'টেস্টিং-সল্ট' শব্দটি উল্লেখ করছে না। তার পরিবর্তে লেখা থাকে মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট কিংবা আরো সংক্ষেপে এমএসজি। আসলে জিনিস একই। অতএব, সচেতনতাই একমাত্র সমাধান।

তথ্যসূত্র : রিসোর্স ফর লাইফ ডটকম
হেলদি লিভিং এসএফ গেইট ডটকম
মার্কোলা ডটকম (২১ এপ্রিল ২০০৯)

মেদস্থূলতা ॥ সচেতনতা প্রয়োজন এখনই

মেদস্থূলতা : এ শতাব্দীর মহামারি!

মেদস্থূলতা বা অতিরিক্ত ওজন। বিশ্বজুড়ে গত কয়েক দশকে এটি রূপ নিয়েছে ক্রমবর্ধমান এক স্বাস্থ্য-জটিলতায়। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে ইতোমধ্যেই এটি দেখা দিয়েছে মহামারি হিসেবে। অর্থাৎ কাগজে-কলমে যা ছিলো এতদিন বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, সেটাই ওখানে আজ বাস্তবতা।

মেদস্থূলতার এই আগ্রাসন পাশ্চাত্যে শুরু হয়েছে মূলত দুই যুগেরও বেশি সময় আগে। ওখানকার স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি সর্বনাশা ক্যান্সারের মতোই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। তারা বলছেন, ব্যাপারটা এখন অনেকটা এমন, যেন ভিনগ্রহ থেকে অতিকায় কোনো অপ্রতিরোধ্য এলিয়েন-বাহিনী এসে জয় করে নিচ্ছে আমেরিকার একটির পর একটি রাজ্য।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই পরিস্থিতি গিয়ে ঠেকেছে আরো ভয়াবহ পর্যায়ে। যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সংস্থার একটি জরিপে (২০০৯-২০১০) বলা হয়েছে, তাদের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি মানুষ (৩৫.৭%) অতিরিক্ত ওজনের শিকার। আবার এদের মধ্যে শতকরা ১৭ ভাগই বয়সে তরুণ।

এসব তথ্য-উপাত্ত নিয়ে তাই আমেরিকাসহ সারা বিশ্বেই স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞরা এখন সত্যিই খুব উদ্বিগ্ন। কারণ মেদস্থূলতার এই সাঁড়াশি আক্রমণ দিন দিন বাড়ছে বৈ কমছে না। আমেরিকান কলেজ অব ফিজিশিয়ানস থেকে প্রকাশিত চিকিৎসা-সাময়িকী আন্যাল্‌স অব ইন্টারনাল মেডিসিন-এ প্রকাশিত একটি গবেষণা-প্রতিবেদনে এর সত্যতা মেলে।

চার হাজার মানুষের প্রাত্যহিক জীবনধারা পর্যবেক্ষণ করে প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, মেদস্থূলতার এই হার অব্যাহত থাকলে তার পরিণতি হতে পারে ভয়াবহ। কারণ সম্ভাবনা আছে যে, ৩০ বছর পর এদের প্রতি ১০ জন পুরুষের মধ্যে নয় জন এবং প্রতি ১০ জন নারীর মধ্যে সাত জন অতিরিক্ত ওজনের ভারে আক্রান্ত হবেন।

বাড়ছে রোগ, বাড়ছে চিকিৎসা-ব্যয়

মেদস্থূলতার হার যত বাড়ছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে হরেক রকম রোগব্যাধি। যেমন : হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, পিত্তথলির রোগ, স্লিপ এপনিয়া (ঘুমের সময় শ্বাসজনিত সমস্যা), হাড়ক্ষয় এবং বিভিন্ন ধরনের জীবনঘাতী ক্যান্সার।

শুধু তা-ই নয়, মা-বাবার অতিরিক্ত ওজন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনাশঙ্কার ঝুঁকি বাড়ায়। যুক্তরাজ্যের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত একটি গবেষণা মতে, অতিরিক্ত ওজনধারী মা-বাবার সন্তানদের হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকজনিত কারণে অকালমৃত্যুর ঝুঁকি স্বাভাবিকের চেয়ে ৩৫ শতাংশ বেশি। এ প্রসঙ্গে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেটাবলিক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ প্রফেসর রেবেকা রেনল্ডস বলেন, অনাগত সন্তানের সুস্থতার কথা বিবেচনা করে গর্ভধারণের আগেই মা-বাবার ওজন নিয়ন্ত্রণে মনোযোগী হওয়া উচিত।

যুক্তরাষ্ট্রের হেলথ এন্ড হিউম্যান সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট-এর একটি জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, সে দেশে প্রতিবছর তিন লক্ষ অকালমৃত্যুর কারণ হলো মাত্রাতিরিক্ত শারীরিক ওজন। এছাড়াও তাতে বলা হয়েছে, মেদস্থূলতার কারণে একজন মানুষের অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে বহুগুণ।

রোগ বাড়ছে, ফলে স্বাভাবিকভাবেই বাড়ছে চিকিৎসা-ব্যয়। একটি হিসেবে দেখা গেছে, মাত্রাতিরিক্ত ওজনধারী মানুষের পেছনে বার্ষিক চিকিৎসা-ব্যয় হয় অতিরিক্ত চৌদ্দশ ডলার। এর ফলে ২০০৮ সালে শুধু মেদস্থূলতার কারণেই যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসাখাতে অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে মোট ১৪৭ বিলিয়ন ডলার, যা আমাদের মূল্যমানে ১১ লক্ষ ৪৫ হাজার ১৩০ কোটি টাকার সমপরিমাণ অর্থ।

পাশ্চাত্যে মেদ-বাণিজ্য

৩২৭,৬৫,৮৬,৮৬০ কিলোগ্রাম। না, এটি কোনো বিশালাকার পর্বতমালা কিংবা অতিকায় বস্তুর ওজন নয়। এ হলো আমেরিকানদের মোট অতিরিক্ত ওজনের পরিমাণ। বর্তমানে সামগ্রিকভাবে আমেরিকানদের মাত্রাতিরিক্ত ওজনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২৭ কোটি ৬৫ লক্ষ ৮৬ হাজার ৮৬০ কিলোগ্রাম। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এখন এ পরিস্থিতিকে আপনি দুভাবে দেখতে পারেন–আমেরিকার এই ক্রমবর্ধমান মেদস্থূলতা অদূর ভবিষ্যতে দেখা দেবে ভয়াবহ এক জাতীয় দুর্দশা হিসেবে, যার ফলে ক্রমশ বাড়তে থাকবে ডায়াবেটিস, হৃদরোগসহ জীবনঘাতী রোগের প্রকোপ। আবার একে দেখতে পারেন ব্যবসার একটা বড় সুযোগ (!) হিসেবেও। সেটা কেমন?

চিকিৎসকসমাজ বলছেন, অতিরিক্ত ওজনধারী রোগীর চিকিৎসা মানেই মোটা অংকের অর্থের ছড়াছড়ি। শুধুমাত্র ওজন কমানো ও এ সংক্রান্ত চিকিৎসায় আমেরিকানরা বছরে ব্যয় করছে অতিরিক্ত প্রায় দেড়শ বিলিয়ন ডলার। পুরো বিষয়টিকে আমেরিকান ব্যবসায়ীরা নিয়েছেন দারুণ এক সুযোগ হিসেবে। সোজা বাংলায় যাকে বলে, ঝোপ বুঝে কোপ মারা।

চিকিৎসা-সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী ব্যবসায়ীরা ইতোমধ্যেই তৈরি করতে শুরু করেছেন স্বাভাবিক আকারের চেয়ে অধিকতর প্রশস্ত সিটি স্ক্যান মেশিন। মেদবহুল শরীরের পুরু চর্বির আস্তর ভেদ করে প্রবেশ করতে সক্ষম ইনজেকশন সিরিঞ্জ, এমনকি বিশালাকার এম্বুলেন্সও তৈরির মহাযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে। আর হাসপাতালগুলোও তাদের বিশালদেহী মেদস্থূল মক্কেলদের জন্যে এসবের পসরা সাজিয়ে অপেক্ষা করছে। মেদস্থূলতার এই ভয়াবহ পরিস্থিতি এভাবে এসব সামগ্রীর উৎপাদক ও প্রস্তুতকারকদের জন্যে সহজ অর্থ উপার্জনের একটি ভালো উৎসে পরিণত হয়েছে।

পোশাক ডিজাইনাররা তো বটেই, মোটর গাড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও ঝুঁকে পড়েছে তাদের মোটাসোটা মেদবহুল মক্কেলদের

সেবায় প্রশস্ত গাড়ি তৈরির কাজে। অবশ্য দেশের ৬৫ ভাগ পূর্ণবয়স্ক মানুষই যখন শরীরে মাত্রাতিরিক্ত মেদ বহন করছেন তখন এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক বটে। কারণ, উৎপাদকরাও চিন্তা করছেন ফ্যাশন-দুরস্ত চমৎকার পোশাকটি তো বানালাম, এখন এটি আমার ক্রেতার গায়ে লাগবে তো? কিংবা গাড়ির সিটবেল্ট আসলেই মাপ মতো হবে কি না।

টেইন এমনই একজন মেদস্থূল আমেরিকান, ঘুমানোর জন্যে যার আছে বিশাল খাট-বিছানা, যার টয়লেটের কমোডের ওজন প্রায় পাঁচশ কিলোগ্রাম এবং গোসলের পর তার প্রয়োজন হয় একটি বিশাল টাওয়েল। অথচ এসব সামগ্রী কিছুকাল আগেও ছিলো দুর্লভ। কয়েক দশক আগে না ছিলো এসব পণ্য, না ছিলো এর ক্রেতা। এখন অবস্থা পাল্টেছে। দুই-ই আছে।

আমেরিকার একটি স্বাস্থ্যসেবা পরিচালনা প্রতিষ্ঠানের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সম্প্রতি ইউএস নিউজ ও ওয়ার্ল্ড রিপোর্টকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ওজন মাপার জন্যে আগে হাসপাতালগুলোতে যে স্কেল ব্যবহার করা হতো তার সর্বোচ্চ সীমা ছিলো ১৬০ কিলোগ্রাম। এখন প্রয়োজন হচ্ছে ৪৫০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত ওজন দেখাতে সক্ষম ডিজিটাল স্কেল।

শুধু তা-ই নয়, পোশাক বিক্রির চিত্রটিও বদলে যাচ্ছে দ্রুত। আঠারো ও তদূর্ধ্ব বয়সী নারীরা এখন প্রায়শই জামাকাপড় কিনছেন প্লাস সাইজের। এর ফলে শুধু ২০০৫ সালেই আমেরিকায় কেনাকাটার ক্ষেত্রে ৩২ বিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে, যা ২০০০ সালের তুলনায় ৪৭ শতাংশ বেশি। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে জানা গেছে এসব তথ্য।

আমেরিকায় এখন পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়াও আয়তনে বাড়ানো হচ্ছে গাড়ির সিটের পরিধি, অফিসের চেয়ার, এমনকি চার্চে প্রার্থনাকারীদের বসার জন্যে সংরক্ষিত আসন পর্যন্ত। চার্চে যে আসনের প্রস্থ ছিলো ৪০ সেন্টিমিটার, চার্চ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এখন তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৫৩ সেন্টিমিটার। তথ্যটি দিয়েছেন চার্চের আসবাব নির্মাতা একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী।

এছাড়াও বিভিন্ন পর্যটন স্পটে নির্মিত অবকাশ যাপন কেন্দ্রগুলোও এখন সাজানো হচ্ছে একটু অন্যরকমভাবে, মেদবহুল পর্যটকদের কথা মাথায় রেখেই। সেগুলোতে ব্যবহার করা হচ্ছে বিশালাকার খাট ও আসবাব। শুধু বয়স্কদের বেলায় নয়, এক থেকে ছয় বছর বয়সী প্রায় তিন লক্ষ আমেরিকান শিশু বেড়ে উঠছে মাত্রাতিরিক্ত ওজন নিয়ে। সবমিলিয়ে ভালোই জমে উঠেছে আমেরিকান মেদ-বাণিজ্য।

স্থূলতার কারণ

পরিশ্রমহীন জীবনযাপন আর ভুল খাদ্যাভ্যাসকেই আজ পৃথিবীজুড়ে মেদবহুলতার প্রধানতম কারণ হিসেবে শনাক্ত করেছেন গবেষকরা। প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশের ফলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ন্যূনতম পরিশ্রমের প্রয়োজনটুকু ফুরিয়ে গেছে অনেকখানিই। ফলে খাবারের মাধ্যমে যে ক্যালরি আমরা গ্রহণ করছি, তার একটা বড় অংশই শারীরিক নিষ্ক্রিয়তার কারণে থেকে যাচ্ছে অব্যবহৃত, যা পরবর্তীতে রূপান্তরিত হচ্ছে ফ্যাট-এ।

আবার অন্যদিকে, আমাদের খাদ্যাভ্যাসে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। একসময় মানুষের দৈনন্দিন খাবারের প্রায় পুরোটাই ছিলো প্রাকৃতিক উৎসজাত। কিন্তু গত প্রায় ৫০ বছরের ধারাবাহিকতায় একটু একটু করে বদলে গেছে সেই চিত্রটি। অধিক চিনি আর উচ্চ ফ্যাটযুক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবারের দাপট এখন সারা বিশ্বজুড়ে। আর এর সাথে তাল মিলিয়ে বাড়ছে অতিরিক্ত ওজন নিয়ে মেদস্থূলদের হাঁসফাঁস।

অতিরিক্ত ওজনের ক্ষেত্রে আছে স্ট্রেসেরও ভূমিকা। গবেষকরা বলছেন, দীর্ঘমেয়াদি মানসিক চাপে ভুগছেন যারা, তাদের অনেকেই এ থেকে বেরিয়ে আসার একটি ভ্রান্ত উপায় হিসেবে অস্বাস্থ্যকর মুখরোচক খাবারের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। স্ট্রেসের ফলে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস থেকে একটি নিউরোট্রান্সমিটার (নিউরোপেপটাইড ওয়াই) নিঃসৃত হয়, যা ক্ষুধার অনুভূতি বাড়িয়ে তোলে, বিশেষত শর্করা জাতীয় খাবারের প্রতি আসক্তি বেড়ে যায়। তখন খাওয়ার পরিমাণও হয় বেশি।

দীর্ঘদিনের মানসিক চাপের ফলে মানুষের শরীরে কিছু হরমোন যেমন : স্টেরয়েড ও ইনসুলিনের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায়। এটি শরীরে ফ্যাট-এর পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। আর এই ফ্যাট মূলত জমা হয় শরীরের মধ্যবর্তী স্থানে অর্থাৎ পেটের আশপাশে, বিভিন্ন রোগঝুঁকি বাড়ায় বলে তুলনামূলকভাবে এটি বেশি ক্ষতিকর। সৌন্দর্য-হানিকর তো বটেই।

প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ॥ সচেতনতা জরুরি

সম্প্রতি (৩ জুলাই, ২০১৩) ঢাকার আইসিডিডিআরবি-তে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ-এর মহাসচিব জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগে. (অব.) ডা. আব্দুল মালিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে বিশেষজ্ঞরা বলেন, বর্তমানে দেশের শহরাঞ্চলের ১৪ শতাংশ শিশু অতিরিক্ত ওজন ও স্থূলতার শিকার। ঢাকা শহরে এই হার ২১ শতাংশ।

আর এর অন্যতম কারণ হলো অস্বাস্থ্যকর ও ক্ষতিকর খাদ্যাভ্যাস। এবং এসব শিশু তুলনামূলক কম সক্রিয়।

মেদস্থূলতা বিষয়ক দেশের প্রথম এই জরিপের ফলাফল উপস্থাপন করতে গিয়ে খ্যাতনামা জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও পুষ্টিবিদরা বলেন, শিশু-কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অতিরিক্ত ওজন দেশে নতুন জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এর ফলে বাড়ছে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক ও বাতসহ নানারকম রোগব্যাধি।

তাই শিশুসহ সব বয়সী মানুষকে শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। নিয়মিত খেলাধুলা ও হাঁটাচলার কথা বলেছেন তারা। অতিরিক্ত তেল-চর্বিযুক্ত খাবার কম খাওয়া, বিশেষত ফাস্টফুড থেকে দূরে থাকা এবং শিশুরা যাতে অধিক সময় ধরে টিভি না দেখে ও ভিডিও গেম না খেলে সে ব্যাপারে অভিভাবকদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তারা।

সঠিক ওজন ॥ সুস্থ দেহ সতেজ মন

দীর্ঘদিন ধরে স্বাস্থ্য-গবেষকদের ধারণা ছিলো, আমাদের শরীরের টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থগুলো মূলত জমা হয় লিভারে, কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, শরীরের বেশিরভাগ টক্সিন গিয়ে জমে ফ্যাট বা চর্বিতে। এবং চর্বিতে জমা এই টক্সিনের পরিমাণ রক্তের চেয়ে প্রায় একশ গুণ বেশি। তাই বলা হচ্ছে, শরীরে চর্বির পরিমাণ কমালে টক্সিনের পরিমাণও কমে। সুস্থতার সম্ভাবনা তাতে বাড়ে। অর্থাৎ সার্বিক সুস্থতার জন্যেই চাই দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণ। সঠিক ওজন মনোদৈহিক সুস্থতা নিশ্চিত করে। আর এ ব্যাপারে সচেতন হোন এখনই।

আগে জানুন, উচ্চতা অনুসারে আপনার ওজন কত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি কাঙ্ক্ষিত ওজনের চেয়ে তা বেশি হয়ে থাকে তবে অতিরিক্ত ওজন কমানোর জন্যে একটি বাস্তবভিত্তিক লক্ষ্য নির্ধারণ করুন।

সাবধান! স্থূলতা কমাতে গিয়ে ভুলেও '৭ দিনে ৭ কেজি ওজন কমান' জাতীয় স্থূল বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পা দেবেন না। লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই তাতে বেশি। তাই ন্যূনতম লক্ষ্য স্থির করুন। যেমন, প্রতি মাসে এক থেকে দুই কেজি ওজন কমানো যুক্তিযুক্ত।

এ লক্ষ্যে একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন। দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় প্রাকৃতিক খাবার যেমন : পর্যাপ্ত শাক-সব্জি, পরিমিত শর্করা,

মাছ, তাজা ফলমূল, বাদাম ইত্যাদির প্রাধান্য দিন। আপনার স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করেই ভাজাপোড়া, তৈলাক্ত, অধিক চিনিযুক্ত খাবার, ফাস্টফুড, কোমল পানীয়সহ সব ধরনের কৃত্রিম ও প্রক্রিয়াজাত খাবার এবং পানীয় যথাসাধ্য বর্জন করুন।

নিয়মিত ব্যায়াম করুন–দিনে অন্তত ৩০ মিনিট। ওজন কমাতে এটি সর্বোত্তম পন্থা। ব্যায়াম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুভাবেই দেহের ওজন কমাতে সাহায্য করে। নিয়মিত হাঁটুন। স্বল্প দূরত্বে রিকশা বা গাড়ি, লিফট এড়িয়ে চলুন। অর্থাৎ সারাদিনে যতটা সম্ভব সক্রিয় ও কর্মচঞ্চল থাকুন।

সবমিলিয়ে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হোন। ওজন থাকবে আপনার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। শরীর হয়ে উঠবে ঝরঝরে আর সতেজ। আপনি উপভোগ করবেন এক আনন্দ-উচ্ছল সুখী জীবন।

তথ্যসূত্র : ডা. ডিন অরনিশ-এর নিউইয়র্ক টাইমস বেস্টসেলার গ্রন্থ 'দি স্পেকট্রাম'
রিডার্স ডাইজেস্ট (এপ্রিল ২০০৮)

অধিক সময় টিভি দেখা হৃদরোগ ও অকালমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়

টিভি আসক্তি ॥ রোগঝুঁকি বাড়ে নীরবে

নিষ্প্রাণ টিভির সামনে জড় পদার্থের মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা কি আপনার প্রিয়তম কাজ কিংবা দৈনন্দিন অভ্যেস? সাবধান! আপনি কিন্তু অবধারিতভাবে নিজের অকালমৃত্যু ডেকে আনছেন।

অস্ট্রেলিয়ার খ্যতনামা স্বাস্থ্য-গবেষণা প্রতিষ্ঠান বেকার আইডিআই হার্ট এন্ড ডায়াবেটিস ইনস্টিটিউট। টিভি দেখার স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে জানার জন্যে তারা পরিণত বয়সের আট হাজার আটশ' মানুষকে বেছে নেন–যারা নিয়মিত দীর্ঘ সময় ধরে টেলিভিশন দেখেন। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, এদের মধ্যে ৮৭ জন হৃদরোগে ও ১২৫ জন ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

গবেষকরা বলেন, যারা টেলিভিশনের সামনে দিনে চার ঘণ্টা বা তারও বেশি সময় কাটান, তাদের হৃদরোগে মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়তে পারে ৮০ ভাগ পর্যন্ত। শুধু তা-ই নয়, টিভি দেখা ছাড়াও শারীরিক পরিশ্রমহীন অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রেও এটি একইরকম সত্য। যারা সারাদিন অফিসে চেয়ারে বসে কাজ করেই কাটিয়ে দেন, আবার বাসায় এসেও টিভির সামনে সময় কাটান ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তারা আছেন সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে।

আইডিআই হার্ট এন্ড ডায়াবেটিস ইনস্টিটিউটের গবেষক ডেভিড ডানস্ট্যান বলেন, শরীরের ওজন ঠিক থাকলেও যারা এভাবে দীর্ঘক্ষণ বসে সময় কাটান তাদের রক্তে শর্করা ও কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ে। তার মতে, টেলিভিশন নিজে কোনো সমস্যা নয়। কিন্তু বিষয়টি মারাত্মক আকার ধারণ করে, যখন দৈহিক শ্রম না করে কিংবা কম পরিশ্রম করে অধিক সময় বসে থাকা হয়। আর এভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে একাধারে বসে থাকা আপনার স্বাস্থ্যের জন্যে সবদিক থেকেই ভীষণ ক্ষতির। কারণ এ থেকে সূত্রপাত ঘটতে পারে মেদস্থূলতা, মাত্রাতিরিক্ত কোলেস্টেরল, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার ও বিষণ্নতাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাণসংহারী রোগব্যাধি ও মনোদৈহিক জটিলতা।

শিশুরাও আছে সমান ঝুঁকিতে

শিশুদের বেলায়ও এ ঝুঁকি কোনো অংশে কম নয়। অস্ট্রেলিয়ার একই গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা ১০ বছরের কম বয়সী শিশুদের ওপরও টিভি আসক্তির প্রভাব নিয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা পরিচালনা করেন। গড়ে ছয় বছর বয়সী প্রায় নয় হাজার শিশুর ওপর তারা দীর্ঘদিন ধরে জরিপ চালিয়ে এর ফলাফলে বলেন, দিনে যারা দু-ঘণ্টার কম সময় টিভি দেখে, তাদের তুলনায় যারা দিনে চার ঘণ্টারও বেশি সময় বিভিন্ন চ্যানেলে ঘুরে বেড়ায় তাদের অকালমৃত্যুর ঝুঁকি শতকরা ৪৬ ভাগ বেশি। এক্ষেত্রে তাদের অতিরিক্ত ওজন ছিলো কি না, সে বিষয়টি মূখ্য নয়। মূল বিষয় হলো, টেলিভিশন আসক্তি রোগ ও মৃত্যুঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

কেবল পাশ্চাত্যে নয়, গত কয়েক দশকে বিশ্বজুড়েই বেড়ে চলেছে শিশু-মেদস্থূলতার হার। এর সাথেও মাত্রাতিরিক্ত টিভি দেখার একটি যোগসূত্র আছে বলে ধারণা করছেন শিশু-বিশেষজ্ঞরা। এ প্রসঙ্গে আমেরিকান একাডেমি অব পেডিয়াট্রিকস-এর পরামর্শ হলো, দু-বছরের কম বয়সের শিশুদের টিভি দেখা একেবারেই উচিত নয়। বয়স বাড়লে মানসম্পন্ন অনুষ্ঠান দেখা যেতে পারে, তবে তা-ও বড়জোর দিনে দুই/এক ঘণ্টা, এর বেশি নয়।

এসব গবেষণার প্রেক্ষিতে ছেলে-বুড়ো সবার প্রতি গবেষকদের পরামর্শ– অযথা টিভির সামনে বসে সময় কাটানোর পরিমাণ কমিয়ে দিন, যদি সুস্থ থাকতে চান। টিভির পেছনে এভাবে সময় ব্যয় করা এককথায় শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য এবং সামাজিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান সময়ের অর্থহীন অপচয় বৈ আর কিছু নয়।

তথ্যসূত্র : রিডার্স ডাইজেস্ট

ভুল বিনোদন ॥
ডেকে আনতে পারে ভয়াবহ পরিণতি

শহর কিংবা মফস্বল যেখানেই হোক, শিশুদের কাছে ভিডিও গেমস, কম্পিউটার গেমস এসব অত্যন্ত আনন্দের এক পরিচিত জগৎ। সাথে টিভি তো আছে ঘরে ঘরেই। অনেক ব্যস্ত মা-বাবা-অভিভাবক আছেন, যারা তাদের সন্তানদের সময় দিতে না পারার ক্ষতিটুকু পুষিয়ে দিতে, কখনো-বা সন্তানের মন রাখতে, মান রাখতে কিংবা ভুলিয়ে রাখার চেষ্টায় নির্বিচারে টিভি দেখা আর গেমস নিয়ে সময় কাটানোর অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে দেন। কিন্তু শিশু-মনস্তত্ত্ববিদরা এ নিয়ে আমাদের জানাচ্ছেন ভয়াবহ সব তথ্য।

ভিডিও গেমস ॥ সহিংসতার দীক্ষা?

জার্মানির বিশেষজ্ঞরা সম্প্রতি এক গবেষণায় বলেন, আমাদের মস্তিষ্কের যে অংশটি আবেগ-অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করে, নিয়মিত ভিডিও গেমস খেলার ফলে শিশু-মস্তিষ্কের সে অংশটি প্রায় অসাড় আর অবসন্ন হয়ে পড়ে। শুধু তা-ই নয়, শারীরিক-মানসিক উত্তেজনার সাথে সংশ্লিষ্ট পিঠের অংশটি হয়ে ওঠে অত্যধিক সক্রিয়, যার প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর। এর চেয়েও মারাত্মক দুঃসংবাদ এসেছে রাশিয়া থেকে। বছর কয়েক আগে ১২ বছর বয়সী কয়েকজন বালক ক্রমাগত উত্তেজনাকর ভিডিও গেমস খেলার কারণে স্ট্রোক বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে মারা যায়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা এ-ও বলেছেন, ভিডিও গেমস প্রায়শই শিশুদের কল্পনা ও বাস্তবতার পার্থক্য-রেখাটি ভুলিয়ে দেয়। ভারতের বিশিষ্ট শিশু-মনস্তত্ত্ববিদ হেমাঙ্গি দাভালে বলেন, এসব গেমস শিশুরা নিয়মিতভাবে খেলার ফলে এর সহিংসতাকেই একসময় স্বাভাবিক বাস্তবতা বলে ধরে নেয়। ফলে প্রাত্যহিক জীবনে কখনো কখনো তার এসব প্রয়োগ করার ইচ্ছা জাগে। তখন নিজেকে গেমসের অংশ বলে মনে করে হিংস্র শারীরিক সক্ষমতা ও সহিংসতাকে অনুকরণ করতে চায়। তারা আরো জানাচ্ছেন, ভিডিও গেমস শিশুর অফুরান

মনোদৈহিক শক্তি ক্ষয় করে ফেলে। শেষপর্যন্ত তাকে করে তোলে অবসাদগ্রস্ত। ভারতের আরেকজন শিশু-বিশেষজ্ঞ নির্মলা রাও বলেন, এ ধরনের খেলা শিশুদের মস্তিষ্কের ওপর চাপ বাড়ায় এবং উদ্ধত হয়ে ওঠাসহ নানারকম সমস্যা তৈরি করে।

গেমস নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনে আমরা প্রভাবিত হচ্ছি। অবিদ্যার কারণে কেউ কেউ আবার এটাও ভেবে বসি যে, ভিডিও গেমস শিশুদের বুদ্ধিদীপ্ত করে তোলে। আর এ ভয়াবহ অজ্ঞানতার অসহায় শিকার হয় আমাদের কোমলমতি শিশুরা।

টিভি সিরিয়াল দেখে বিগড়ে যাচ্ছে আগামী প্রজন্ম!

বছর কয়েক আগে ভারতে বেশ হৈ চৈ শুরু হয় সেদেশের দুটো টিভি অনুষ্ঠান নিয়ে। 'বিগ বস ফোর' আর 'রাখি কা ইনসাফ'। বড়দের অনুষ্ঠান বলে এ দুটো গভীর রাতে সম্প্রচার করার জন্যে সুপারিশ করেছিলো কেন্দ্রীয় সরকার। কারণ, সে দেশের জাতীয় পর্যায়ের একটি সমীক্ষা অনুসারে, সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত ১০টার মধ্যে যে টিভি সিরিয়াল ও অনুষ্ঠান দেখানো হয় তাতে বিগড়ে যাচ্ছে ছয় থেকে ১৭ বছরের ছেলে-মেয়েরা। এই মতামতকে আবার সমর্থন দিয়েছে দেশটির প্রায় ৯০ শতাংশ অভিভাবক। তারা বলছেন, যত দিন যাচ্ছে ততই শালীনতা হারাচ্ছে এ জাতীয় অনুষ্ঠান আর

সিরিয়ালগুলোর সংলাপ এবং ছবি। এদিকে ভারতীয় মনস্তত্ত্ববিদরা জানাচ্ছেন, টিভি দেখার প্রভাবে ক্রমশ হিংস্র হয়ে পড়ছে কমবয়সী ছেলে-মেয়েরা। মা-বাবার সাথে কোনো ধরনের খারাপ ব্যবহার করতেও পিছপা হচ্ছে না তারা এবং এসব ঘটছে এই অনুষ্ঠানগুলোর দৌলতেই।

এখানেই শেষ নয়। বলা হচ্ছে, ছয় বছরের কম বয়সী বাচ্চারা এখন তিন থেকে চার ঘণ্টা টিভি দেখে। বাদ যায় না ইচ্ছেমতো ডিভিডি দেখা-ও। শুধু এটুকু হলেও কথা ছিলো, কিন্তু গোল বেঁধেছে অন্য জায়গাতে। মা-বাবারা বলছেন, টিভি দেখার সময় বিজ্ঞাপনগুলো খুঁটে খুঁটে দেখে ওরা। তারপর একগুঁয়ে বায়না–বিজ্ঞাপনে দেখানো খাবারগুলো কিনে দিতে হবে। আর অস্বাস্থ্যকর ওসব খাবারগুলোতে এভাবেই আসক্ত হয়ে পড়ছে বাচ্চারা।

সমীক্ষায় আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। সেটি হলো, বাচ্চারা কার্টুন দেখেই বেশি সময় কাটায়। কিন্তু ওসব কার্টুনেই মজার ছলে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে হিংসাত্মক ঘটনা। এ ওকে মারছে, সে এসে আবার পাল্টা মার দিচ্ছে ইত্যাদি। এতে তাৎক্ষণিক মজা আছে বটে, কিন্তু দূরপ্রসারী ফল হতে পারে ধ্বংসাত্মক আর ভয়াবহ।

শিশু-বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিশুর দুরন্ত প্রাণময় শৈশবকে এসব ভুল আর ক্ষতিকর বিনোদনের আগ্রাসন থেকে সচেতনভাবে রক্ষা করা, বাঁচিয়ে রাখা এখন আমাদের সবার জরুরি নৈতিক দায়িত্ব।

তথ্যসূত্র : হাফিংটন পোস্ট (১০ অক্টোবর, ২০১৩)
নিউজ ম্যাক্স ডটকম (২৭ আগস্ট, ২০১৩)
কিডস হেলথ
সায়েন্স ওয়ার্ল্ড (আগস্ট ২০০৫)

মোবাইল বোমা ॥
স্বাস্থ্যঝুঁকি ও শঙ্কায় আগামী প্রজন্ম

'দূষণ' শব্দটি আজ আমাদের খুব পরিচিত। কারণ বিভিন্ন প্রকার দূষণ আমাদের পরিবেশকে দিন দিন বিষাক্ত করে তুলছে। যেমন : বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ, পানি দূষণ, আলোক দূষণ, ইত্যাদি। আরেকটি দূষণের কথা আজ বলবো যার নাম অনেকেই হয়তো শোনেন নি। এটা গন্ধহীন বর্ণহীন শব্দহীন ও অদৃশ্য কিন্তু মানবদেহ ও জীবজগতের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর। এমনকি অন্যান্য সব দূষণের চেয়ে অধিক ভয়ংকর। এই দূষণের নাম তড়িৎ দূষণ (Electropollution)।

এই দূষণের সাথে যুক্ত রয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির তড়িৎ কৌশলসমূহ যেমন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, হেয়ার ড্রায়ার, টোস্টার ইত্যাদি এবং কোটি কোটি ডলারের তারহীন যোগাযোগশিল্প অর্থাৎ মোবাইল ফোন প্রযুক্তি। তারহীন মোবাইল প্রযুক্তির মহাবিস্ফোরণ যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে উপহার দিচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মারাত্মক ক্ষতিকর তড়িৎ-চৌম্বকীয় বিকিরণ। ফলে দুই দশক আগের তুলনায় মানবসমাজ আজ কোটি গুণ বেশি তড়িৎ-চৌম্বকীয় বিকিরণ দূষণে আক্রান্ত। তড়িৎ-চৌম্বকীয় বিকিরণ দ্বারা ক্ষতির ব্যাপকতা এতই বিশাল যে, মোবাইল শিল্প দ্বারা সৃষ্ট তড়িৎ-চৌম্বকীয় ক্ষেত্র ও তড়িৎ দূষণ আজ সমার্থক হয়ে পড়ছে।

ব্যাপক হারে মোবাইল ফোন ব্যবহার এবং বাড়ি হাসপাতাল স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদে নির্মিত স্বল্প ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বেইজ স্টেশন বা টাওয়ার এন্টেনা থেকে নির্গত তড়িৎ-চৌম্বকীয় বিকিরণ বর্তমানে সবচেয়ে বেশি তড়িৎ দূষণের কারণ।

প্রথমে আসি মোবাইল ফোন সেটের কথায়। আমরা যখন মোবাইল ফোনে আলাপ করি, মোবাইল সেট তখন দুটি কাজ করে। এন্টেনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যসংবলিত বিকিরণ শোষণ করে এবং ব্যবহারকারীর কথা উচ্চক্ষমতার বিকিরণের মাধ্যমে প্রেরণ করে। এই প্রক্রিয়ার সময়

ব্যবহারকারীর দেহের টিস্যুসমূহ তড়িৎ-চৌম্বকীয় বিকিরণে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ফলে কোষ থেকে কোষে স্বাভাবিক যোগাযোগ পথ বিঘ্নিত হয়। বিশেষভাবে কান ও ব্রেনের কোমল টিস্যু বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা ব্রেন টিউমার, অটিজম ইত্যাদি মারাত্মক ব্যাধির কারণ হতে পারে।

২০০৩ সালে অধ্যাপক কেইল মিলড (ওরেব্রো ইউনিভার্সিটি অব সুইডেন) এক গবেষণায় দেখান, দিনে গড়ে এক ঘণ্টা মোবাইল ফোন ব্যবহার করলে ব্রেন ক্যান্সার বা টিউমার হওয়ার ঝুঁকি ৩০% পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। অন্যদিকে কোনো শিশু মাত্র দুই মিনিট মোবাইল ফোনে কথা বললে স্বাভাবিক ব্রেন তরঙ্গ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়, যা পরবর্তী এক ঘণ্টায়ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে না।

আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, মোবাইল ফোন ব্যবহারের আগে যেমন ১৯৭০ সালে ১০,০০০ শিশুর মধ্যে অটিজমে আক্রান্তের সংখ্যা পাওয়া যেত একজন। ২০০৩ সালে এর হার হয়েছে ১৬৬ জন শিশুর মধ্যে একজন। বর্তমানে বিভিন্ন গবেষণায় অনেক বিজ্ঞানী ও ডাক্তার এমনই ইঙ্গিত পাচ্ছেন। তড়িৎ-চৌম্বকীয় বিকিরণের আঘাতে শিশুদের দেহকোষ ক্রমেই দুর্বল হচ্ছে। ফলে জিনগত ক্ষতি হচ্ছে, যা অটিজমের চেয়েও মারাত্মক। গবেষণালব্ধ এ ফলাফলগুলো জানার পর তড়িৎ দূষণের ভয়াবহতা সম্পর্কে আমাদের নিশ্চয়ই আর কোনো সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই।

তড়িৎ দূষণের আরো মারাত্মক দিক হলো স্বল্প ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বেইজ স্টেশন বা টাওয়ার এন্টেনা থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে নির্গত বিকিরণ। মোবাইল ফোন আমরা সারাক্ষণ ব্যবহার করি না। কম ব্যবহারে বিকিরণ কম আঘাত করবে। কিন্তু কোনো বেইজ স্টেশন বা টাওয়ার এন্টেনা দিনে ২৪

ঘণ্টাই তড়িৎ-চৌম্বকীয় বিকিরণ চারদিকে ছড়াতে থাকে। কাজেই যারা এই টাওয়ারের নিচে বা আশপাশে বসবাস করেন তাদের সবাই অর্থাৎ আবালবৃদ্ধবনিতা নিজেদের অজান্তেই দিনের অধিকাংশ সময় উচ্চক্ষমতার বিকিরণে আঘাতপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

এভাবে দীর্ঘসময় অবস্থান করায় আন্তঃকোষীয় যোগাযোগ সংকেত বিকৃত হতে পারে, যার ফলে শরীরের স্বাভাবিক বিপাকক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। সেইসাথে ক্যান্সার, ব্রেন টিউমার, অটিজম এবং লিউকেমিয়া ইত্যাদি জীবননাশী মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় বহুলাংশে।

এবার আসি বাংলাদেশ প্রসঙ্গে। ১৬ কোটি মানুষের এই দেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা দেশের অর্থনীতি অনুযায়ী যা হওয়ার কথা তার চেয়ে বেশি। ফলে অপরিকল্পিতভাবে টাওয়ার এন্টেনা বসানোর সংখ্যাও অধিক। দুঃখের বিষয়, শিক্ষিত/ অশিক্ষিত এমনকি সরকারের উচ্চমহল পর্যন্ত তড়িৎ দূষণের ভবিষ্যৎ ভয়াবহতা সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন। এ ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। আর এ সুযোগে মোবাইল কোম্পানিসমূহ বাড়ি স্কুল কলেজ হাসপাতাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদে এবং যেখানে সেখানে নির্বিচারে বেইজ টাওয়ার ও এন্টেনা স্থাপন করে চলছে। ঢাকা শহরে অনেক স্কুলের ছাদে পর্যন্ত এ দৃশ্য দেখা যায়।

প্রতিটি এন্টেনা থেকে উচ্চ ক্ষমতার বিকিরণ প্রতিনিয়ত চারদিকে ছড়াচ্ছে। আর প্রতিদিন ছয় থেকে সাত ঘণ্টা সময় শিশুরা স্কুলে অতিবাহিত করছে। ফলে এরা শারীরিক দিক থেকে ভয়াবহ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যদি এই শিশুরা আজ থেকে ২০ বছর পর এই বিকিরণের আঘাতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে–কেউ লিউকেমিয়া, কেউ ব্রেন ক্যান্সার, কেউ স্মৃতিশক্তি হারিয়ে বা অন্যান্য মারাত্মক রোগে ধুঁকে ধুঁকে প্রাণ হারায় তখন ভবিষ্যৎ নাগরিকদের এই পরিণতির জন্যে কে দায়ী হবে? সামান্য কিছু অর্থের লোভে আমরা আমাদের সন্তানদের কী সর্বনাশ করছি, একবার কি তা ভেবে দেখেছি?

অথচ উন্নত দেশে লোকালয়ের মধ্যে বিশেষ করে বাড়ি হাসপাতাল স্কুল কলেজ ও এ ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক দূরে এবং অনেক উঁচুতে উচ্চক্ষমতার বেইজ স্টেশন স্থাপন করা হয়। তড়িৎ-চৌম্বকীয় ক্ষেত্র কোন মাত্রা পর্যন্ত নিরাপদ, এ নিয়ে কিছুটা বিতর্ক থাকলেও বিভিন্ন দেশের সরকার তাদের জনগণের নিরাপত্তার খাতিরে মাত্রা ঠিক করে দিয়েছে। ফরাসি বিশেষজ্ঞদের মতে, লোকালয় থেকে ১০০ মিটার দূরত্বের মধ্যে কোনো মোবাইল এন্টেনা স্থাপন করা যাবে না।

এখন আসি কী করে তড়িৎ দূষণ লাঘব করা যায় সেই প্রসঙ্গে। প্রথমত, মোবাইল ফোন কম ব্যবহার করুন। শুধু প্রয়োজনীয় কথাটুকু বলে ফোন রেখে দিন। 'অন' অবস্থায় মোবাইল সেট দেহ থেকে দূরে রাখতে সচেষ্ট থাকুন। ঘুমের সময় সেটটি মাথার কাছে না রেখে পাঁচ-ছয় ফুট দূরে রাখুন। সেটের সাথে এয়ার পিস ব্যবহার করলে ঝুঁকির মাত্রা অনেকাংশে কমে।

শিশুদের মোবাইল ফোন ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে হবে। টাওয়ার এন্টেনা লোকালয় স্কুল কলেজ হাসপাতাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দূরে স্থাপন করতে হবে। নিজের এলাকায় তড়িৎ-চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের তীব্রতার মাত্রা নিরাপদ সীমার ভেতর রয়েছে কি না মনিটর করতে আপনি উদ্যোগী ভূমিকা নিতে পারেন। এছাড়াও মোবাইল সেট বাজারজাত করার আগে সেটির বিকিরণ মাত্রা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা থাকাটা জরুরি।

পরিশেষে বলা যায়, যোগাযোগের আধুনিক প্রযুক্তি আমরা ব্যবহার করবো বটে, কিন্তু তা কোটি জীবনের বিনিময়ে নয়। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকার, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব। আর এজন্যে সাধারণ জনগণকে আরো সচেতন করে তুলতে হবে।

লেখক : ড. গোলাম মোহাম্মদ ভূঞা
অধ্যাপক, তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সৌজন্যে : সাপ্তাহিক বিপরীত স্রোত (ডিসেম্বর ২০১১)

আপনার স্ট্রেস-এর শিকার হতে পারে আপনার পরবর্তী প্রজন্ম!

নিতান্তই ছোটখাটো কোনো কারণে আজ হয়তো আপনি একটু অস্থিরতায় ভুগছেন, মানসিকভাবে চাপ বোধ করছেন। সবমিলিয়ে হয়তো কিছুটা স্ট্রেস-আক্রান্ত আপনার মন। জেনে রাখুন, এ যে কেবল আপনারই ক্ষতি করছে তা নয়, এর প্রভাব হতে পারে সুদূরপ্রসারী–আপনার আজকের স্ট্রেস ভোগাতে পারে আপনার পরবর্তী প্রজন্মকেও!

ইঁদুরের ডিএনএ স্ক্যান করে সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এ তথ্য দিয়েছেন। তাদের মতে, একজন মানুষের আজকের স্ট্রেস যে তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরও ক্ষতির কারণ হতে পারে–এ গবেষণার ফলাফল তা-ই প্রমাণ করে। শুধু তা-ই নয়, পারিপার্শ্বিক নানা বিষয় যেমন : ধূমপান, খাদ্যাভ্যাসের ধরন ইত্যাদির পাশাপাশি শৈশবের মানসিক চাপও একই রকম সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

স্ট্রেস বা অন্য যেকোনো কারণে ডিএনএ-তে যে কিছু ছাপ (Marking) থেকে যায়, তা সময়ের সাথে একসময় পুরোপুরি মুছে যায় অর্থাৎ শুক্রাণু ও ডিম্বাণু পূর্ণবয়স্ক হতে হতে তা মোটামুটি আগের অবস্থাতেই ফিরে আসে–এতদিন জিনবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিলো এটাই। আর যদি তা না-ও হয়, তবে পরবর্তীকালে ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়ার সময় স্ট্রেস-এর কারণে সৃষ্ট প্রভাব ঠিকই মুছে যায়। কিন্তু একাধিক গবেষণার ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা এখন তাদের ধারণা পাল্টাতে শুরু করেছেন।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক জেমি হ্যাকেট-এর নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী সম্প্রতি এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান করেন। জিন-এর প্রাথমিক পর্যায় থেকে পরিপূর্ণ হওয়ার প্রতিটি ধাপ তারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তারা বলেন, খুব অল্প সংখ্যক জিন-এ শেষপর্যন্ত কিছুটা ছাপ বা চিহ্ন থেকেই যায়। সংখ্যাটা এমন–একটি জননকোষে থাকা ২৫,০০০ জিন-এর মধ্যে গড়ে প্রায় ২৩৩টি জিন-এ স্ট্রেস-এর প্রভাব রয়ে যেতে পারে। হ্যাকেট ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মতে, বংশপরম্পরায় এর প্রভাব

পড়তে পারে আপনার পরবর্তী প্রজন্ম অবধি।

পুরো প্রক্রিয়াটি কীভাবে ঘটে– সে বিষয়ে এখনো সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হতে না পারলেও, যেটুকু বোঝা গেছে তাতে বিজ্ঞানীরা বেশ উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। জুরিখের সুইস ফেডারেল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি-র গবেষক ইসাবেলা ম্যানসুই এ বিষয়ে তার দীর্ঘ গবেষণার পর বলেন, স্ট্রেস-এর প্রভাব চলতে পারে এমনকি পরবর্তী দুই প্রজন্ম পর্যন্ত।

তথ্যসূত্র : নিউসায়েন্টিস্ট
(২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩)

Stresses in your life may affect future generations

FOR the first time, genes chemically silenced as a result of stress have been shown to stay switched off in eggs and sperm, so the effect is passed down to the next generation.

The finding is based on DNA scans of developing mouse eggs and sperm. It backs up mounting but indirect evidence, from multigenerational studies, that the genetic impacts of environmental factors such as smoking, diet, famine and childhood stress can be passed on through a process called epigenetic inheritance. Many mainstream geneticists had considered this an impossibility.

Genes can be switched off by altering DNA through a process called methylation, in which enzymes respond to environmental factors by marking genes with methyl groups that prevent them from working.

But the idea that genes could retain these epigenetic markings when inherited is controversial. In previous studies, any markings added to genes were erased as sperm and eggs developed. If any marks did survive, it was thought they are wiped out when an egg is fertilised.

Now a team led by Jamie Hackett at the University of Cambridge has challenged this picture. The researchers extracted DNA from mouse primordial germ cells - the precursors to sperm and eggs - at various stages of their development and used markers to spot any methylated genes.

They found that a tiny number of methylated gene regions survived unerased: an average of just 233 out of about 25,000 genes in the germ cells. Still, the work clearly shows that traits resulting from the surviving markings can, in principle, be passed on. "What we've found is a potential way things can get through whereas before, everything was considered to be erased," says Hackett (*Science*, doi.org/kbj).

Do the markings survive simply because the erasure process may not always work properly, or are they deliberately spared so that the information they carry is passed to the next generation? The finding "doesn't solve this question", says Hackett. "But it's a proof of principle for one possible mechanism by which traits might be inherited epigenetically."

Those sceptical of epigenetic inheritance are adamant that even if some methylated DNA makes it through, it is likely to be because of faulty erasure and will have little

"It backs indirect evidence that impacts of smoking, poor diet and childhood stress can be passed on"

impact on offspring. "The idea that what's left carries information about the environment is sufficiently far-fetched to demand much more evidence of its importance," says Adrian Bird of the University of Edinburgh, UK. "I'd say [the erasure] is an inefficient process, and what's left doesn't matter."

Researchers who claim to have demonstrated that epigenetic traits can be passed down were more enthusiastic. Isabelle Mansuy of the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich has found that, in mice, the effects of stress in infancy can be passed from one generation to at least the next two.

"The paper demonstrates there are regions which do escape reprogramming," Mansuy says. "This is fundamental to the idea of epigenetic inheritance of acquired traits that so many people are reluctant to accept, because it does indicate that it is possible to maintain some marks intact from parents to offspring."

Hackett says that he and his colleagues plan to repeat the experiment in human cells. They also hope to resolve the question of whether gene markings that escape erasure do so by luck or by design.

Andy Coghlan ■

2 February 2013 | NewScientist | 11

সচল থাকুন সুস্থ থাকুন

গতিশীলতাই সুখ, তাতেই সুস্বাস্থ্য

Happiness is a state of activity. কথাটি বলেছিলেন গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল। সচল থাকুন, কর্মব্যস্ত থাকুন। আপনি সুখী হবেন। কিন্তু এ তো প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের কথা। আমরা আধুনিক মানুষ, জানতে চাই হালের খবর আর তত্ত্ব।

একুশ শতকে এসেও স্বাস্থ্য-গবেষকরা বলছেন রীতিমতো একই কথা। সেটি হলো, সারাদিন কেবল শুয়ে বসে কিংবা বসে থেকে সব কাজ নয়, বরং সুযোগ পেলেই একটু উঠে দাঁড়ান, হাঁটুন, ব্যায়াম করুন। কিছুটা পরিশ্রম আর পেশি সঞ্চালন হতে পারে এমন কাজগুলো করুন আনন্দের সাথে। গতিশীল হোন, যতটা সম্ভব। সুখী হবেন তো বটেই, আপনি সুস্থ থাকবেন। কমবে জটিল সব রোগব্যাধি আর অকালমৃত্যুর ঝুঁকি। সেইসাথে বাড়বে আপনার কর্মময় দীর্ঘজীবনের সম্ভাবনা।

শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা রোগঝুঁকি বাড়ায়

বিশ্বজুড়ে গত কয়েক দশকে বেড়েছে উচ্চ রক্তচাপ, করোনারি হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, স্ট্রোক, স্থূলতা, ক্যান্সারের মতো জীবনঘাতী রোগগুলোর আগ্রাসন। উন্নত দেশগুলোই শুধু নয়, উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও এসব রোগে চিকিৎসা-ব্যয়ের অংকটা বেশ মোটা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি এক অর্থে জাতীয় অর্থনীতির বিপুল অপচয়। তাদের মতে, এসব রোগের অন্যতম কারণ হলো ন্যূনতম শারীরিক পরিশ্রমহীন ও প্রায় নিষ্ক্রিয় জীবনযাপন। সেইসাথে ভুল খাদ্যাভ্যাস, মানসিক চাপ ইত্যাদি তো রয়েছেই।

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন-এর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দৈহিক নিষ্ক্রিয়তা সে দেশে দেখা দিয়েছে এক গুরুতর স্বাস্থ্যসমস্যা হিসেবে। তাতে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ দৈনিক ন্যূনতম শারীরিক পরিশ্রমটুকুও করে না।

উদ্ভূত এ পরিস্থিতিতে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য-বিষয়ক সব প্রতিষ্ঠানগুলো। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানাচ্ছে, বর্তমানে বিশ্বজুড়ে মোট মৃত্যুর চতুর্থ কারণ হলো এই শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা। শুধু তা-ই নয়, প্রায় ২৫ শতাংশ স্তন ক্যান্সার ও কোলন ক্যান্সার, ২৭ শতাংশ ডায়াবেটিস, ৩০ শতাংশ হৃদরোগের অন্যতম প্রধান কারণও এটি। এছাড়াও এর ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া এবং বিভিন্ন রকম সংক্রমণের ঝুঁকি তো থাকেই।

কর্মব্যস্ত থাকুন সবসময়

যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা চিকিৎসা-গবেষণা প্রতিষ্ঠান মেয়ো ক্লিনিক। একাধিক গবেষণার পর তাদের পরামর্শ–সবসময় সচল থাকুন। দীর্ঘক্ষণ একনাগাড়ে বসে না থেকে একটু হেঁটে আসুন। আপনার কাজের ধরনটা যদি এমন হয় যে, ডেস্কে বসেই কাজ করতে হয় অফিসে থাকাকালীন পুরোটা সময়, তবে প্রতি আধঘণ্টা পর পর ছোট্ট বিরতি নিন। মিনিট পাঁচেকের জন্যে উঠে দাঁড়ান, দাঁড়িয়েই হাত-পায়ের পেশিগুলো নাড়িয়ে কিছুটা ব্যায়াম করে নিতে পারেন। পরবর্তী কাজে আপনি আরো উজ্জীবিত বোধ করবেন।

আপনি হয়তো ক্লাস কিংবা অফিস থেকে বাড়ি ফিরে বেশ আয়েশি সময় কাটাচ্ছেন, টিভি অথবা কম্পিউটারের সামনে বসে আছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। প্রিয় টিভি সিরিয়ালে বুঁদ হয়ে আছেন বা ফেসবুকে খোঁজখবর নিচ্ছেন প্রাণের বন্ধুদের। এদিকে যে একটু একটু করে বেড়ে চলেছে আপনার প্রাণের ঝুঁকি!

দিনের পর দিন এমন নিষ্ক্রিয়তা অজান্তেই আপনাকে ঠেলে দিতে পারে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, স্ট্রোক, স্থূলতা, হাড়ক্ষয়, বয়সজনিত স্মৃতিভ্রষ্টতা ও কয়েক রকমের ক্যান্সারের দিকে। ২০১১ সালে আমেরিকান কলেজ অব কার্ডিওলজি থেকে প্রকাশিত একটি গবেষণা-প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দিনের উল্লেখযোগ্য সময় যারা টিভি বা কম্পিউটারের সামনে বসে কাটিয়ে দেয়, হৃদরোগে অকালমৃত্যুর হার তাদের অপেক্ষাকৃত বেশি।

গবেষকরা সতর্ক করে দিয়ে বলছেন–নিরবচ্ছিন্নভাবে বসেই কাজ করেন যারা, তারা কিন্তু ঝুঁকিতে আছেন। এর মধ্যে যারা দিনে সর্বোচ্চ ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত বসেই কাটিয়ে দেন, তারা আছেন তুলনামূলক বেশি ঝুঁকিতে। গবেষণায় দেখা গেছে, যারা সবসময় কোনো না কাজে সচল আর চলাফেরার মধ্যে আছেন তাদের হৃৎস্বাস্থ্য নিষ্ক্রিয়দের তুলনায় অনেকটাই ভালো।

তাই যে কাজই করুন, দীর্ঘসময় বসে কাটাবেন না। টিভি দেখছেন, দাঁড়িয়ে বা দাঁড়িয়ে থেকে কিছু একটা করতে করতে দেখা যায়? কিংবা

প্রতিদিনের পত্রিকাটা দাঁড়িয়েই পড়ে নিতে পারেন। অথবা বাড়ির দৈনন্দিন কাজকর্মগুলো নিজেই করা, শখের বাগানের যত্ন-আত্তি, আপনার গাড়ি ধোয়ার কাজটি না হয় আপনিই করলেন। বাড়ি ফিরে সন্তানের সাথে খেলাধুলাও হতে পারে দৈহিকভাবে সচল আর গতিশীল থাকার একটি দারুণ উপায়।

কেবল বড়দের ক্ষেত্রেই নয়, শিশু-কিশোরদের জন্যেও এটি সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, খুব ছোটবেলায় এমনকি পাঁচ বছর বয়সের আগে থেকেই যেসব শিশু খেলাধুলা-দৌড়ঝাঁপের মধ্য দিয়ে অধিকতর সক্রিয় থাকতে অভ্যস্ত, তাদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশ এবং পরবর্তী জীবনে সুস্থতা ও দীর্ঘায়ুর সম্ভাবনা তুলনামূলক বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, যারা প্রায়শই উচ্ছল ও কর্মচঞ্চল, একাডেমিক ক্ষেত্রে তাদের ফলাফল তুলনামূলক ভালো। বেশিরভাগ সময়েই এরা জীবনে মেধা ও সম্ভাবনার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম। অতএব, আপনার সন্তানের অবিরাম চঞ্চলতা আর দুরন্তপনা দেখে এবার আনন্দের হাসি হাসতে পারেন বৈকি।

ব্যায়াম হোক প্রতিদিনের অভ্যাস

বিজ্ঞানের অভাবনীয় সব আবিষ্কার আধুনিক মানুষের জীবনযাত্রাকে করে দিয়েছে অভূতপূর্ব সহজ। দৈনন্দিন জীবনযাপনে আমাদের পরিশ্রম করার দায় কিংবা সুযোগ কোনোটাই এখন আর প্রায় নেই। ভোরে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রাতে ঘুমোতে যাওয়া অবধি আমাদের চারপাশে আজ অসংখ্য বিলাসদ্রব্য; লিফ্‌ট আর গাড়ির কথা আর নাই-বা বলা হলো। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে চলা এ পরিশ্রমহীনতা আমাদের সুস্থতাকে ব্যাহত করছে, শারীরিক মানসিক নানাভাবে। তাই চাই পরিকল্পিত দৈহিক শ্রম, এটি হতে পারে ব্যায়াম।

ব্যায়ামের উপকারিতা অগণন। সার্বিক সুস্থতার জন্যে ব্যায়ামের ভূমিকা সচেতন মানুষ মাত্রই জানেন। এছাড়াও নিয়মিত ব্যায়ামে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সুসংহত হয়ে ওঠে। শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমনকি দেহকোষের জেনেটিক কোডে-ও সূচিত হতে পারে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন।

শরীরের সুস্থতা তো বটেই, মনের সুস্থতার জন্যেও এটি সমান গুরুত্বপূর্ণ। যারা নিয়মিত ব্যায়াম করেন ও কর্মচঞ্চল থাকেন সবসময়, তাদের ক্ষেত্রে বিষণ্ণতার প্রকোপ কম। এদের মানসিক সহিষ্ণুতাও তুলনামূলক বেশি। উপরন্তু, ব্যায়ামের ফলে মস্তিষ্কে সেরোটনিন ও এন্ডোরফিনের মতো

আনন্দবর্ধক নিউরোট্রান্সমিটারের প্রবাহ বাড়ে, দেহ-মন থাকে চনমনে। চিন্তাশক্তি আর বুদ্ধিমত্তা তখন কাজ করে চমৎকার। কানাডার নিউরোলজি এসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত নিবন্ধে এটি বলা হয়েছে।

ব্যায়ামের মধ্যে হাঁটা একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। যুক্তরাজ্যের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্বাস্থ্য-বিষয়ক কার্যক্রমের মূল স্লোগান হলো–Sit less walk more. হাজারো তথ্য-প্রমাণ ও গবেষণার ভিত্তিতে যুক্তরাজ্য সরকার তাদের নাগরিকদের জন্যে হাঁটার একটি আদর্শ রুটিন বাতলে দিয়েছেন– দিনে ন্যূনতম ৩০ মিনিট, সপ্তাহে অন্তত পাঁচ দিন।

সচল থাকুন ॥ সুস্থ থাকবেন

প্রায় এক যুগ আগে, ২০০২ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের মূল প্রতিপাদ্য ছিলো– Move for health. এর গুরুত্ব বিবেচনা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পরের বছর অর্থাৎ ২০০৩ সাল থেকেই এ আহ্বানটি নিয়ে বিশ্বজুড়ে একটি দিবস পালন করছে–Move for health day (১০ মে)।

তাই জীবনে সক্রিয়তা আর গতিশীলতা বাড়ান, যতটা সম্ভব। আপনি সুস্থ থাকবেন। আপনার আনন্দময় দীর্ঘজীবনের সম্ভাবনা বাড়বে। যুক্তরাষ্ট্রে ৬৫ হাজার মানুষের ওপর ১০ বছর ধরে পরিচালিত একটি দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার ফলাফলে বলা হয়েছে, যারা তাদের অবসর সময়েও দৈহিক শ্রম ব্যয় করে কোনো না কোনো কাজ করেছেন, তারা অন্যদের চেয়ে বেঁচেছিলেন চার বছরেরও বেশি সময়।

সদা সক্রিয় ও কর্মচঞ্চল থাকার অভ্যেসটি গড়ে তুলতে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ–পরিবারের সদস্য, নিকটতম বন্ধু, কর্মক্ষেত্রের সহকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করুন। তাদের সম্পৃক্ততা আপনার আগ্রহ ও আনন্দকে বাড়িয়ে দেবে। বন্ধুত্ব গড়ে তুলুন এমন জীবনদর্শনে বিশ্বাসী মানুষ ও সংগঠনের সদস্যদের সাথে।

আজ থেকেই শুরু করুন...। আরো বেশি সচল আর কর্মমুখর থাকার দৃঢ় আশাবাদ নিয়ে শুরু হোক আপনার আগামী দিনগুলো।

তথ্যসূত্র : সায়েন্টিফিক আমেরিকান (আগস্ট ২০১৩)
জার্নাল অব আমেরিকান কলেজ অব কার্ডিওলজি
মেয়ো ক্লিনিক অনলাইন জার্নাল

হাঁটুন, নিয়মিত হাঁটুন

হাঁটার উপকারিতা বিস্তর

Walking is the best medicine. আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটিস এ কথাটি বলেছিলেন আড়াই হাজার বছরেরও বেশি সময় আগে। কথাটি আজও একইরকম সত্য। বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্য-গবেষকদের মতামত তা-ই বলছে।

হাঁটার উপকারিতা বিস্তর। নিয়মিত হাঁটেন যারা, তাদের হৃৎপিণ্ড সুস্থ থাকে। কারণ, হাঁটার ফলে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কর্মক্ষমতা বাড়ে। আর উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও স্ট্রোকের মতো জীবনঘাতী রোগগুলো প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত হাঁটার ভূমিকা এখন একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত। শুধু শারীরিক সুস্থতার জন্যেই নয়, মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখারও চমৎকার একটি উপায় হলো হাঁটা।

প্রায় ৪০ হাজার নারী-পুরুষের ওপর পরিচালিত একটি ব্যাপক আকারের গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত হাঁটার অভ্যাসটি যাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অনুষঙ্গ, তারা তুলনামূলক কম অসুস্থতায় ভোগেন। তাদের ওষুধের প্রয়োজনও হয় কম। এছাড়াও হাঁটার ফলে দেহের অক্সিজেন গ্রহণ ক্ষমতা বাড়ে। ফলে শরীর-মন সবসময়ই থাকে প্রাণবন্ত।

হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখতে নিয়মিত হাঁটুন

নিয়মিত হাঁটুন। আপনার হৃৎপিণ্ডের সুস্থতার জন্যে এটি বিশেষভাবে উপকারী। যারা সপ্তাহে তিন ঘণ্টা দ্রুতগতিতে হাঁটেন, তাদের করোনারি হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে অনেকখানি। সেইসাথে কমে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি। হৃৎপিণ্ড থাকে সুস্থ সবল ও অধিকতর কর্মক্ষম।

রক্তে কোলেস্টেরল-মাত্রার তারতম্য করোনারি হৃদরোগের অন্যতম কারণ। এখানে উল্লেখ্য, হৃৎপিণ্ডের সুস্থতার জন্যে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল এলডিএল-এর পরিমাণ থাকা চাই পরিমিত আর উপকারী কোলেস্টেরল

এইচডিএল-এর পরিমাণ থাকা উচিত নির্দিষ্ট সীমার চেয়ে বেশি। নিয়মিত হাঁটলে ঠিক তা-ই ঘটে। অর্থাৎ এলডিএল-এর পরিমাণ কমে এবং বাড়ে এইচডিএল-এর পরিমাণ। হৃৎপিণ্ডের সুস্থতার জন্যে এটি জরুরি।

এছাড়াও নিয়মিত হাঁটলে শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। উল্লেখ্য, অতিরিক্ত ওজন বা মেদস্থূলতা করোনারি হৃদরোগের অন্যতম কারণ।

'ন্যাচারাল বাইপাস'-এর সম্ভাবনা বাড়ে

নিয়মিত হাঁটেন যারা, তাদের হৃৎপিণ্ডের চারপাশে কোলেটারাল সারকুলেশন গড়ে ওঠে। সেটা কেমন? আমরা অনেক সময় শুনি, এনজিওগ্রাম করে দেখা গেছে, কারো একটি বা দুটি করোনারি ধমনীতেই রক্ত চলাচল শতভাগ বন্ধ অর্থাৎ ১০০% ব্লকেজ। মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক–তবে তিনি বেঁচে আছেন কী করে? রক্তনালী শতভাগ বন্ধ হয়ে পড়লে তো হৃৎপিণ্ডের কোষ আর পেশিগুলো প্রয়োজনীয় রক্ত ও পুষ্টির অভাবে পুরোপুরি অকেজো এমনকি মারা যাওয়ার কথা। কিন্তু তার ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে না কেন?

এখানে যে বিষয়টি ঘটে তা হলো, হৃৎপিণ্ডের ব্লকেজ-আক্রান্ত ধমনীর চারপাশে কিছু পরিপূরক রক্তনালী সচল হয়ে ওঠার মাধ্যমে একটি কোলেটারাল সারকুলেশন গড়ে ওঠে। উল্লেখ্য, হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনীর চারপাশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তনালী থাকে–যারা শারীরিক পরিশ্রম করেন, ব্যায়াম করেন, বিশেষ করে যারা নিয়মিত হাঁটেন, তাদের এই রক্তনালীগুলো সচল হয়ে ওঠে। মূলত এই বিকল্প রক্ত সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমেই হৃৎপিণ্ডের সব অংশে প্রয়োজনীয় রক্ত পৌঁছে যায়।

একটি গবেষণায় দেখা গেছে, এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তনালীর সংখ্যা কারো কারো ক্ষেত্রে দুশ থেকে আড়াইশটি পর্যন্ত হতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় একে 'ন্যাচারাল বাইপাস' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

করোনারি হৃদরোগ নিরাময়ের একটি উপায় হিসেবে বর্তমানে দেশে-বিদেশে 'ইসিপি' নামে একটি চিকিৎসাপদ্ধতির প্রচলন ঘটেছে। যার মূল উদ্দেশ্য প্রধানত এটাই–কোলেটারাল সারকুলেশন তৈরি করা। আর এ উপকারটিই আপনি বিনা অর্থ ব্যয়ে চমৎকারভাবে লাভ করতে পারেন নিয়মিত ৩০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা হাঁটা এবং ব্যায়ামের মধ্য দিয়ে। হাঁটার ফলে একদিকে আপনার ন্যাচারাল বাইপাসের সম্ভাবনা বাড়লো, এর পাশাপাশি হাঁটার অন্যান্য উপকারিতাগুলোও আপনি লাভ করলেন।

উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে

নিয়মিত হাঁটলে আপনি উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও স্ট্রোকের ঝুঁকিমুক্ত থাকবেন। পরিবারে ডায়াবেটিসের ইতিহাস আছে যাদের, তারা বেশ দুশ্চিন্তায় ভোগেন। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তাড়া করে ফেরে তাদের। প্রায়ই ভাবেন, এ থেকে বুঝি আর মুক্তি নেই। গবেষকরা বলছেন, মুক্তির উপায় আছে বৈকি। সেটি হলো, সপ্তাহে অন্তত চার/ পাঁচ দিন জোরে হাঁটুন। ইংল্যান্ডে পরিচালিত একটি গবেষণায় এটি প্রমাণিত হয়েছে।

আবার, ইতোমধ্যেই উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে থাকেন যদি, তবে প্রতিদিন নিয়ম করে হাঁটা আপনার জন্যে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এ রোগগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে হাঁটা অত্যন্ত কার্যকরী। তাতে এসব রোগ থেকে সৃষ্ট নানান জটিলতা আপনি খুব সহজেই এড়াতে পারবেন। আর সে কারণেই এসব অসুখ শনাক্ত হলে চিকিৎসকরা ওষুধের পাশাপাশি নিয়মিত হাঁটার পরামর্শ দেন।

উপকারিতা আছে আরো

হাঁটলে ক্যান্সার-ঝুঁকি কমে। একাধিক গবেষণায় বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন, নিয়মিত হাঁটার ফলে কোলন ক্যান্সার এবং বিশেষত মহিলাদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে। এমনকি ক্যান্সার-আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে যারা নিয়মিত হাঁটেন, তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, কেমোথেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অন্যদের চেয়ে তুলনামূলক কম।

হাঁটার ফলে হাড়ক্ষয় বা অস্টিওপোরোসিস-এর ঝুঁকি কমে। এছাড়াও নিয়মিত হাঁটার ফলে শরীরের ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হয়ে ওঠে আরো সংহত ও কার্যকরী।

হাঁটুন, সুখী হবেন

নিয়মিত হাঁটার একটি উল্লেখযোগ্য উপকারিতা হলো, এর ফলে মস্তিষ্কের রক্তনালী ও নিউরোনগুলোতে রক্তপ্রবাহ বাড়ে। মস্তিষ্কের সব নিউরোন, সিন্যাপ্স কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। মস্তিষ্ক হয়ে ওঠে অধিকতর সক্রিয় ও প্রাণবন্ত।

নিয়মিত হাঁটেন যারা, তাদের দেহ-মনে সৃষ্টি হয় এক চনমনে সুখানুভূতি। কারণ, এতে স্ট্রেস-এর পরিমাণ কমে। গবেষকরা বলছেন, এসব মানুষ তুলনামূলক দুশ্চিন্তামুক্ত, হাসিখুশি, তারুণ্যদীপ্ত ও ইতিবাচক মনোভাবে

উজ্জীবিত। নিয়মিত হাঁটার ফলে বয়সজনিত স্মৃতিভ্রম রোগ আলঝেইমার্স-এর ঝুঁকি কমে অনেকখানি।

হাঁটা বিষণ্নতা প্রতিরোধ ও নিরাময় করে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, গুরুতর বিষণ্নতায় ভুগছিলেন এমন রোগীদের মধ্যে একদলকে নিয়মিত হাঁটার পরামর্শ দেয়া হয়েছিলো। টানা ১২ সপ্তাহ এভাবে চলার পর দেখা গেছে, তাদের বিষণ্নতার হার কমেছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। বিজ্ঞানীদের মতে, হাঁটা সত্যিই সুখকর। আর হাঁটার সাথে রাতের সুখনিদ্রার সম্পর্কটাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

নিয়মিত হাঁটুন

চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলছেন, হাঁটা আপনার দীর্ঘায়ুর সম্ভাবনা বাড়ায়। আপনাকে সুস্থ রাখে। তাই নিয়মিত হাঁটুন। সকালে বা বিকেলে আপনার সুবিধামতো যেকোনো সময়ে হাঁটতে পারেন। একে দৈনন্দিন রুটিনের একটি আনন্দময় অনুষঙ্গে পরিণত করুন। সুস্থতার আনন্দ নিয়ে হাঁটুন।

দেহ-মনের সুস্থতার জন্যে চাই জোর কদমে হাঁটা। ঘণ্টায় চার মাইল বেগে। দিনে অন্তত ৩০ মিনিট। এভাবে না পারলে ধীরে হাঁটুন এবং দিনে ১৫/২০ মিনিট করে শুরু করুন। প্রতিদিনই একটু একটু করে হাঁটার গতি ও সময় বাড়ান।

হাঁটার আদ্যোপান্ত জানলেন। সত্যতা নিজেই পরখ করে দেখুন। হাঁটতে বেরিয়ে পড়ুন...।

তথ্যসূত্র : ডা. ডিন অরনিশের 'প্রোগ্রাম ফর রিভার্সিং হার্ট ডিজিজ' ও 'স্পেকট্রাম'
টাইমস অব ইন্ডিয়া (১৯ অক্টোবর, ২০১৩)
ডিসকভারি হেলথ অনলাইন

মা-বাবার জন্যে পরামর্শ

হাঁটতে শেখামাত্র শিশুদের দিনে কমপক্ষে তিন ঘণ্টা সক্রিয় রাখতে হবে

বড়রা কেবল নয়, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদেরও শরীরচর্চার পাশাপাশি সচল রাখার পরামর্শ দিয়েছেন যুক্তরাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞরা। মা-বাবার উদ্দেশ্যে তারা বলেছেন, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের দিনে অন্তত তিন ঘণ্টা হাঁটা-চলা করানো অথবা শারীরিকভাবে সক্রিয় রাখা উচিত। শিশুর ভবিষ্যৎ সুস্বাস্থ্যের কথা ভেবেই এটা করা উচিত বলে মনে করছেন তারা। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা যৌথভাবে এ পরামর্শ দিয়েছেন। শিশুদের শরীরচর্চার ব্যাপারে যুক্তরাজ্যে সরকারিভাবে পরামর্শ দেয়ার ঘটনা এটিই প্রথম।

বিশেষজ্ঞদের এ পরামর্শের পর ব্রিটেনে যেসব শিশু যথেষ্ট পরিমাণে শরীরচর্চা করে না, তাদের বিষয়ে সরকারের ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। কারণ, শরীরচর্চা না করার ফলে এসব শিশুর স্থূলতা ও মস্তিষ্কের বিকাশজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে। সরকারের নতুন নির্দেশনা মতে, জন্ম থেকেই শিশুদের হামাগুড়ি এবং একটু বড় হলে সাঁতার কাটা ও এ জাতীয় শারীরিক কসরতে উৎসাহিত করে তুলতে বলা হয়েছে। কেবল ঘুমের সময়টা ছাড়া পাঁচ বছরের কম বয়সী সব শিশুকে যতটা সম্ভব কম শুয়ে অথবা বসে থাকার সুযোগ দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

নির্দেশনায় বলা হয়েছে, শিশুরা হাঁটতে শেখামাত্র দিনে তাদের কমপক্ষে তিন ঘণ্টা শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকা ও চারদিকে ছোটাছুটি করার সুযোগ দিতে হবে। এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে শিশুদের।

যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস-এর প্রাক্তন মহাসচিব ও বর্তমানে দেশটির প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা প্রফেসর ডা. ডেইম স্যালি ডেভিস বলেছেন, ছোট্ট শিশুকে শারীরিকভাবে সক্রিয় হতে উৎসাহ দেয়ার দায়িত্ব তাদের মা-বাবার। তিনি বলেন, যেসব শিশু হাঁটতে শেখে নি তাদের মেঝেতে খেলতে,

হামাগুড়ি দিতে, নিদেনপক্ষে চারদিকে ছোটাছুটি করতে দেয়াটা গুরুত্বপূর্ণ।

স্যালি ডেভিস আরো বলেন, যেসব খেলা পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুকে নড়াচড়া করতে সাহায্য করে, দিনে অন্তত তিন ঘণ্টা এটা করতে দেয়াটা জরুরি। তিনি বলেন, এমন অনেক অভিভাবক আছেন, যারা তাদের শিশু সন্তানদের শারীরিকভাবে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সময়টুকু সক্রিয় রাখার ব্যাপারে সচেতন নন। আবার কেউ কেউ হয়তো এতটাই ব্যস্ত যে, এ বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়ার মতো সুযোগই পান না। স্যালি ডেভিস বলেন, আমরা যা বলছি তা সবই আপনাদের শিশুসন্তানের ভালোর জন্যে। তাদের শৈশব ও কৈশোর এবং সর্বোপরি পরবর্তী জীবনের কল্যাণের জন্যে।

যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দুই থেকে ১৫ বছর বয়সী মাত্র ৩০ শতাংশ শিশু প্রয়োজনমতো শরীরচর্চা করে। স্কুলে ভর্তি হয় নি, যুক্তরাজ্যের এমন বেশিরভাগ শিশুর দিনে দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা সক্রিয় থাকার প্রমাণ মিলেছে। এর মধ্যে রয়েছে খুঁটি বাওয়া, সাইকেল চালানো, দৌড়াদৌড়ি, খেলাধুলা, সাঁতার কাটা ইত্যাদি।

সরকারি এ পরামর্শকে স্বাগত জানিয়েছেন ইংল্যান্ডের রয়েল কলেজ অব পেডিয়াট্রিকস এন্ড চাইল্ড হেলথ-এর প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ডা. টেরেন্স স্টিফেনসন।

তথ্যসূত্র : বিবিসি অনলাইন

ব্যায়াম মস্তিষ্কের শক্তি বাড়ায়

উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে, শরীর থেকে অতিরিক্ত ওজন ঝরাতে ব্যায়াম বা শরীরচর্চা কার্যকরী–এটুকু আমরা কমবেশি সবাই জানি। এছাড়াও শরীরকে দৃঢ় ও সবল এবং পেশির শক্তি বাড়াতেও ব্যায়ামের বিকল্প নেই। কিন্তু সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, ব্যায়াম মস্তিষ্কের শক্তিও বাড়ায়।

দীর্ঘ এক দশকের বেশি সময় ধরে গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা বলছেন, যারা প্রতিদিন অথবা নিদেনপক্ষে সপ্তাহে পাঁচ দিন ব্যায়াম করেন তাদের মস্তিষ্কের শক্তি ও কার্যকারিতা বাড়ে, মস্তিষ্ক হয়ে ওঠে অধিকতর সচল ও কর্মক্ষম।

গবেষণায় আরো উল্লেখ করা হয়েছে, নিয়মিত ব্যায়ামে মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ বাড়ে। মস্তিষ্কের রক্তনালীর সংকোচন প্রতিরোধে সাহায্য করে, মস্তিষ্ক কোষ নিউরোনকে সবল করে, এমনকি নতুন নতুন নিউরোন তৈরিতে সাহায্য করে। আর এ গবেষণা-প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায়।

এ ব্যাপারে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এডভান্সড সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট-এর সাইকোলজির প্রফেসর জাস্টিন এস রোডস ব্যাপক গবেষণা ও তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে জানিয়েছেন, নিয়মিত ব্যায়াম, হাঁটা, সাঁতার ইত্যাদি দৈহিক পরিশ্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সুফলটি হলো–এর ফলে মস্তিষ্কের সার্বিক ক্ষমতা ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়।

গবেষকরা বলেন, মস্তিষ্কও শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতোই এক ধরনের টিস্যু দিয়ে তৈরি। আর বয়স বাড়ার সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই এর ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, আমাদের বয়স যখন ২০-এর কোঠায় থাকে তখন আমাদের মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাসের (শেখার ক্ষমতা ও স্মৃতিশক্তি নিয়ন্ত্রণ করে) ক্ষমতা ও কার্যকারিতা কমতে থাকে প্রতিবছর এক শতাংশ হারে। আর ব্যায়াম এই বয়সজনিত ক্ষয়ের গতিটাই দেয় কমিয়ে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্স জার্নালে এ তথ্যটি প্রকাশিত হয়।

নিউরোসায়েন্টিস্টরা এতকাল ধরে বলে আসছেন যে, শিশুর জন্মের সময় তার মস্তিষ্কে যে সংখ্যক নিউরোন থাকে, বয়স বাড়লেও সেই সংখ্যাটি থাকে অপরিবর্তিত এবং একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর থেকে এর ক্ষয় শুরু হয়, যা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু নতুন গবেষণার ভিত্তিতে তারা এখন আশার বাণী শোনাচ্ছেন–ব্যায়াম কেবল মস্তিষ্ককে সবল করেই তোলে না, উপরন্তু মস্তিষ্কে তৈরি হতে নতুন নিউরোন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় নিউরোজেনেসিস। আর এক্ষেত্রে ব্যায়ামের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

বিজ্ঞানীরা আরো উল্লেখ করেন, তারা একদল ইঁদুরকে কয়েক সপ্তাহ ধরে উন্মুক্ত পরিবেশে রাখেন এবং অপর দলকে আবদ্ধ স্থানে রাখা হয়। পরবর্তীতে এদের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করে দেখা যায়, যে দলটি উন্মুক্ত পরিবেশে ইচ্ছেমতো ছোটাছুটির মধ্যে ছিলো তাদের মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাসে নতুন নিউরোন তৈরি শুরু হয়েছে, কিন্তু অন্য দলের ক্ষেত্রে তা হয় নি।

গর্ভকালীন ব্যায়াম ॥ শিশুর সুস্থ হৃৎপিণ্ড ও শাণিত মস্তিষ্কের নিশ্চয়তা

গর্ভাবস্থায় নিয়মিত ব্যায়াম মায়ের স্বাস্থ্যের জন্যে তো বটেই, গর্ভস্থ শিশুর জন্যেও বিশেষভাবে উপকারী। আমেরিকান ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটির উদ্যোগে পরিচালিত একটি গবেষণায় এ তথ্যটি প্রকাশিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আমেরিকার ন্যাশনাল সিটি ইউনিভার্সিটি অব মেডিসিন এন্ড বায়োসায়েন্স-এর গবেষক ডা. লিন্ডা ই মে বলেন, 'গর্ভকালীন সময়ে মায়ের ব্যায়ামের চমৎকার প্রভাব রয়েছে গর্ভস্থ শিশুর হৃৎপিণ্ড এবং অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের সুষম গঠন ও কার্যকারিতার ওপর। অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম দেহের স্বনিয়ন্ত্রিত কাজগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন : হার্টবিট, রক্তচাপ, শ্বাসপ্রশ্বাসের হার ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের স্বাভাবিক কাজসমূহ।'

ডা. মে গর্ভবতী মায়েদের ওপর একটি তুলনামূলক গবেষণায় দেখেছেন, গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে যারা নিয়মিত ব্যায়াম করেছেন তাদের গর্ভস্থ শিশুর হৃৎপিণ্ড ও দেহের স্বাভাবিক কাজগুলো অন্যদের চেয়ে সুন্দর ও যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে। আর এটি হয়ে থাকে গর্ভকালীন সময়ের প্রতিটি ধাপেই। গর্ভস্থ শিশুর নার্ভাস সিস্টেম বা স্নায়ুতন্ত্র পরীক্ষায় এর প্রমাণ মিলেছে। ডা. মে-র ভাষায়, 'শিশুর হৃৎপিণ্ডের চমৎকার কার্যকারিতার জন্যে গর্ভাবস্থায় নিয়মিত ব্যায়াম হতে পারে সর্বোত্তম পদ্ধতি।'

গর্ভকালে ব্যায়াম শিশুর মস্তিষ্ককে শাণিত করে, বুদ্ধিমত্তাকে করে তুলতে পারে অধিকতর পরিণত। সাম্প্রতিক একটি গবেষণার ফলাফলে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন কানাডার ইউনিভার্সিটি অব মন্ট্রিয়ালের বিজ্ঞানীরা। সদ্যপ্রসূত (আট থেকে ১২ দিন বয়সী) একদল শিশুর মাথায় একাধিক ইলেকট্রোড স্থাপন করে তারা এর প্রমাণ পেয়েছেন। এসব শিশুর মায়েদেরকে তাদের গর্ভাবস্থায় প্রতিদিন হালকা ব্যায়াম করার পরামর্শ দেয়া হয়েছিলো এবং তারা সেটি করেছিলেন। এ গবেষণার ফলাফল ২০১৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সানডিয়াগো-তে অনুষ্ঠিত নিউরোসায়েন্টিস্টদের বাৎসরিক সম্মেলনে উপস্থাপন করা হয়।

এছাড়াও গর্ভবতী মায়ের জন্যে ব্যায়াম নানাভাবে উপকারী। আমেরিকান কলেজ অব অবস্টেট্রিসিয়ান্স এন্ড গাইনোকোলজিস্ট থেকে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, গর্ভকালীন কোনো জটিলতা না থাকলে এ সময় দৈনিক ৩০ মিনিটের হালকা ব্যায়াম মায়ের জন্যে সবদিক থেকেই খুব কাজের। এতে তার ঘুম ভালো হয়, গর্ভকালীন বিভিন্ন শারীরিক অসুবিধা ও স্ট্রেস কমে, সন্তান প্রসবের জন্যে শরীরকে প্রস্তুত করে ও শক্তি যোগায়। উপরন্তু, যারা গর্ভাবস্থায় নিয়মিত ব্যায়াম করেন, সন্তান জন্মের পর তারা মনোদৈহিকভাবে দ্রুত আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, গর্ভকালীন ব্যায়াম ও দমচর্চার ফলে মায়ের শরীর ও বিশেষত প্লাসেন্টা-তে রক্তপ্রবাহ বাড়ে, ফলে এর মধ্য দিয়ে গর্ভস্থ শিশুর পর্যাপ্ত অক্সিজেন ও পুষ্টি লাভের সম্ভাবনা নিশ্চিত হয়।

বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, নিয়মিত ব্যায়াম বা শরীরচর্চায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত এসব তথ্য সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ, যা পরিকল্পিত উপায়ে মানব মস্তিষ্কের শক্তি, কার্যকারিতা এবং বুদ্ধিমত্তা বাড়ানোর ক্ষেত্রে হতে পারে এক অনন্য উদ্ভাবন।

তথ্যসূত্র : নিউইয়র্ক টাইমস হেলথ সায়েন্স
টাইম ম্যাগাজিন
রয়টার্স হেলথ

অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসাকে ‘না’ বলুন

আমাদের অনেকেরই ধারণা, সকল অসুস্থতার সমাধান লুকিয়ে আছে প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থার নানারকম টেস্ট আর ব্যয়বহুল অপারেশনে, যেমন : সিটি স্ক্যান, এমআরআই, স্পাইনাল সার্জারি, এনজিওগ্রাম, এনজিওপ্লাস্টি, বাইপাস ইত্যাদি। কিন্তু আসলেই কি তাই? এর কতটুকুই-বা নির্ভেজাল সত্য? সময়োপযোগী এ প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে গেলে বের হয়ে আসে পর্দার অন্তরালের এক ভিন্ন চিত্র।

লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি নয় তো?

যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন ইউনিভার্সিটির স্কুল অব মেডিসিন-এর প্রফেসর ইমিরেটাস ডা. স্টিফেন স্মিথ। বরাবরের মতো এবারও তিনি রুটিন চেক-আপের জন্যে গিয়েছিলেন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসকের কাছে। প্রফেসর স্মিথ প্রথমেই বলে নিলেন, প্রতিবছরের মতো এবার আর তিনি পিএসএ টেস্ট করাতে চান না। উল্লেখ্য, পিএসএ হলো প্রোস্টেট ক্যান্সার নির্ণয়ের একটি পরীক্ষা, আমেরিকান চিকিৎসকরা প্রতিবছর প্রায় ২০ লক্ষ পুরুষকে এ পরীক্ষাটি করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির মেডিসিনের প্রফেসর ও প্রখ্যাত মেডিকেল জার্নাল ‘আর্কাইভস অব ইন্টারনাল মেডিসিন’-এর সম্পাদক ডা. রিটা রেডবার্গ। সদ্য পঞ্চাশ পেরিয়েছেন তিনি। এ বয়সের মহিলাদের সাধারণত মেমোগ্রামের (স্তন ক্যান্সার নির্ণয়ের পরীক্ষা) পরামর্শ দেয়া হয়। কিন্তু ডা. রেডবার্গ এ ব্যাপারে আগ্রহী নন মোটেই।

ডা. স্টিফেন স্মিথ, ডা. রিটা রেডবার্গ–এরা কিন্তু প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থার বিরুদ্ধে নন। আমেরিকায় চিকিৎসা খাতে বছরে যে ২.৭ ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় হয় তা কমাতেও তারা কোনো উদ্যোগ নেন নি। তাদের মতে, এসব পরীক্ষায় অনেকসময় ‘ফল্‌স পজিটিভ’ রিপোর্ট আসে, অর্থাৎ

প্রাথমিকভাবে সন্দেহজনক কিছু মনে হলেও, পরবর্তীতে বায়োপসি করলে দেখা যায়, আসলে সেটি ক্যান্সার নয়। বড়জোর হয়তো কোনো নির্দোষ টিউমার, যা আপনাতেই মিলিয়ে যাবে।

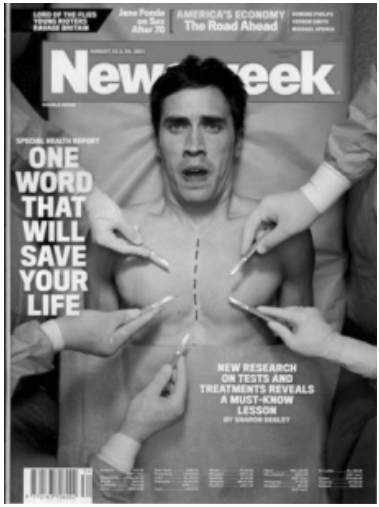

ডা. রেডবার্গ বলেন, 'অসুস্থতার কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে, যেখানে এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর আগ্রাসী চিকিৎসা না করলেও চলে। এক্ষেত্রে কিছু না করাটাই বরং একটা চিকিৎসা।' আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন থেকে প্রকাশিত 'আর্কাইভস'-এর একাধিক গবেষণা রিপোর্টের সুরও একই; তা হলো, ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর আগ্রাসী চিকিৎসা অনেক সময় লাভের চেয়ে ক্ষতিই করে বেশি।

নীরোগ যেন না হয় 'রোগী'

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হার্ট লাং এন্ড ব্লাড ইনস্টিটিউটের কার্ডিওলজিস্ট মাইকেল লয়ের বলেন, কোনো টেস্টে সন্দেহজনক কিছু ধরা পড়লে স্বাভাবিকভাবেই রোগীরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। আর আমাদের সমস্যা হলো, রোগীর শরীরে তিল পরিমাণ অস্বাভাবিকতা দেখলেই আমরা সেটিকে গুরুতর সমস্যা বলে ভাবতে শুরু করি। সবমিলিয়ে বিষয়টা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, 'নীরোগ একজন মানুষ হঠাৎই যেন গুরুতর রোগী-তে পরিণত হন।'

বিশেষজ্ঞদের মতে, পিএসএ, ব্যাকপেইনের ক্ষেত্রে স্পাইনাল সার্জারি (উপকারের চেয়ে ক্ষতির ঝুঁকিই এতে বেশি। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশ্রাম এবং হালকা ব্যায়াম তুলনামূলক উপকারী বলে মত দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা), যত্রতত্র এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ–এর সবই হয় ক্ষতিকর, নয়তো নেহাতই প্লাসিবো হিসেবে কাজ করে। আর এভাবে চিকিৎসার ব্যয়ই শুধু বাড়ছে, সে হারে দেখা মিলছে না সুস্বাস্থ্য কিংবা দীর্ঘায়ুর।

টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল শাখার বিশেষজ্ঞ ডা. জেম্‌স গুডউইন বলেন, 'পঁচাত্তরোর্ধ্বদের বেলায় পূর্ববর্তী ১০ বছরের কোনো কোলনস্কপি

রিপোর্ট স্বাভাবিক থাকলে তা আর নতুন করে করানোর প্রয়োজন হয় না। অথচ এর পরামর্শ দেয়াটা চলছে হরহামেশাই। এমন রোগীদের মধ্যে অনেকে যখন এসে বলেন, পাঁচ বছর এমনকি দুই বছর আগের রিপোর্ট স্বাভাবিক থাকার পরও চিকিৎসক তাকে কোলনস্কপির পরামর্শ দিয়েছেন তখন আমি নিজেই বোকা বনে যাই।'

এটা সত্য যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজকের যে অগ্রগতি তাতে অনেক রোগ প্রতিরোধ সহজ হয়েছে, বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে অগণিত প্রাণ, দূর হচ্ছে অযাচিত ভোগান্তি। কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়। এসব চিকিৎসার উপযোগিতা ও উপকারিতা রোগের একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত, যার অন্যথা হলে ক্ষতির সম্ভাবনাই বরং বেশি। আর বর্তমানে এটি সবচেয়ে বেশি ঘটছে হৃদরোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে।

করোনারি হৃদরোগ : সুস্থ জীবনাচারেই সমাধান

একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, মৃদু বুক-ব্যথায় আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে যাদের স্টেন্টিং কিংবা বাইপাস করা হয়েছে, শেষপর্যন্ত তাদের কারোরই জীবনযাত্রার মান ও আয়ুবৃদ্ধি ঘটে নি। বরং এ ধরনের রোগীদের মধ্যে যারা ওষুধের পাশাপাশি ব্যায়াম, সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন করেছেন, তারা ঢের ভালো আছেন অন্য যে-কারো তুলনায়।

ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলিনার মেডিসিনের প্রফেসর ও 'রি-থিংকিং এজিং' গ্রন্থের লেখক ডা. নর্টিন হ্যাডলার বলেন, এনজিওগ্রামে করোনারি ব্লকেজ দেখা গেলেই যে তা সবসময় হার্ট অ্যাটাকের কারণ হবে সেটি ঠিক নয়; বরং স্টেন্টিং ও বাইপাসের সময় এসব কোলেস্টেরল-প্লাক্ যেকোনো সময় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছোট ধমনীতে আটকে পুনরায় হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের মতো বিপদ ঘটাতে পারে। তার মতে, আমেরিকায় প্রতিবছর পাঁচ লক্ষ মানুষ স্টেন্টিং করাচ্ছেন প্রত্যেকে ৫০ হাজার ডলার ব্যয় করে। অথচ খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, ব্যায়াম ও সুস্থ জীবনধারা মেনে চলেই তারা সুন্দর জীবনযাপন করতে পারতেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের কার্ডিওলজিস্ট স্টিভ নিসেনের মতে, হৃদরোগ নির্ণয়ের পরীক্ষাগুলোও কখনো কখনো বিভ্রান্তিকর ফলাফল দিতে পারে, যা অযথাই রোগীকে অপারেশনের দিকে ঠেলে দেয়। আবার এসব চিকিৎসা নেয়ার পরও কিন্তু আবার হার্ট অ্যাটাক হতে পারে যদি জীবনাচারে ভুল থাকে।

করোনারি ব্লকেজ শনাক্তের পাশাপাশি হৃদযন্ত্রের ত্রিমাত্রিক ছবি নেয়ার জন্যে বিশ্বজুড়ে এখন বহুল প্রচলিত একটি পরীক্ষা 'সিটি এনজিওগ্রাম'। ঝুঁকিমুক্ত নয় এটিও। জন্স হপকিন্স মেডিকেল ইনস্টিটিউটের কার্ডিওলজিস্ট ম্যাক এভয় বলেন, এর অন্যতম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলো উচ্চ মাত্রার রেডিয়েশন, যা পরবর্তীতে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়।

ওষুধ-বাণিজ্যের চিরন্তন ফাঁদ

ওষুধ কোম্পানিগুলোও কতিপয় ওষুধ নিয়ে ফেঁদে বসেছে ধুন্ধুমার ব্যবসা। বিষণ্নতারোধী ওষুধ, পিপিআই (যেমন : ওমিপ্রাজল, প্যান্টোপ্রাজল ইত্যাদি) যার অন্যতম। আমেরিকার শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশি প্রেসক্রিপশনে (বাংলাদেশেও নয় কি?) পিপিআই সেবনের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা অপ্রয়োজনীয়। কারণ, পিপিআই কিন্তু মোটেই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত নয়। এটি সেবনে হাড়-ভঙ্গুরতা, দুরারোগ্য ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ এমনকি নিউমোনিয়ার সম্ভাবনাও বাড়তে পারে।

রক্তের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে বহুল-ব্যবহৃত স্ট্যাটিন গ্রুপের ওষুধ নিয়েও আছে বিতর্ক। বিশেষজ্ঞদের মতে, করোনারি ব্লকেজ এবং রক্তের উচ্চ কোলেস্টেরল–এ দুটোই আছে যাদের, স্ট্যাটিন শুধুমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই উপকারী। গবেষণায় দেখা গেছে, শতকরা ২০ ভাগ ক্ষেত্রে স্ট্যাটিন গুরুতর

পেশি সমস্যার কারণ হতে পারে। এভাবে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার চিকিৎসায় ফি বছর আমেরিকানদের ব্যয় হচ্ছে অতিরিক্ত ২০০ বিলিয়ন ডলার।

অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসা নয় আর

প্রফেসর স্মিথের নেতৃত্বে সম্প্রতি আমেরিকার একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমস্ত অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অযাচিত চিকিৎসা থেকে বিরত থাকার ঘোষণা দিয়েছেন।

তাদের মতে, স্বাস্থ্যবান একজন মানুষের রক্তের ২০টি উপাদান পরীক্ষা করা হলে তাতে দু-একটির মান কমবেশি হতেই পারে। তাই বলে এটাই একমাত্র সত্য হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে ডা. গুডউইন বলেন, 'এতসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমরা যত লোকের প্রাণ বাঁচাতে পারছি, তার চেয়ে ঢের বেশি লোক হত্যা করছি।'

তথ্যসূত্র : নিউজউইক (২২ আগস্ট ২০১১)

ওষুধ-বাণিজ্যের ফাঁদে বিষণ্নতা

বিষণ্নতায় ভুগছেন এমন অনেকেই আজকাল চিকিৎসকের পরামর্শে কিংবা কেউ কেউ আবার নিজের খেয়াল-খুশিমতো বিষণ্নতা প্রতিরোধী ওষুধ সেবন করছেন। এগুলো আপনি খুব সহজেই কিনতে পারছেন বটে, কিন্তু এসব ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আপনি কতটা সচেতন? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এখন সময় এসেছে এ নিয়ে সচেতন হওয়ার।

একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর ১৪ মিলিয়নেরও বেশি পূর্ণবয়স্ক মানুষ বিষণ্নতায় আক্রান্ত হয় এবং ৩২ মিলিয়ন মানুষ জীবনের কোনো না কোনো সময় বিষণ্নতায় ভোগে। ফলে সেখানে এসব ওষুধ ব্যবহারকারীর সংখ্যা গত এক দশকে ১৩.৩ মিলিয়ন থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে স্রেফ দ্বিগুণ অর্থাৎ ২৭ মিলিয়নে। এদিকে ২০ বছর ধরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট গবেষকরা বলছেন, বিষণ্নতারোধী ওষুধগুলোর রয়েছে নানারকম স্বল্প ও দূরপ্রসারী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে অনুভূত হতে পারে মাংসপেশিতে ব্যথা, মাথা ঝিমঝিমভাব, মাথাঘোরা ইত্যাদি। এছাড়াও দীর্ঘমেয়াদে এটি মানুষকে আত্মহত্যার দিকে চালিত করতে পারে!

আত্মহত্যার প্রেসক্রিপশন!

১২ বছরের উচ্ছল কিশোরী ক্লারা আটার। কিছুদিন ধরে বিষণ্নতায় ভুগছিলো সে। ডাক্তারের পরামর্শে বিষণ্নতা নিরোধক একটি ওষুধ খাওয়ার সাত মাসের মাথায় একদিন মেয়েটি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলো। মায়ের জন্যে রেখে গেল একটা ছোট্ট চিরকুট–'মা, এ চিরকুট যখন পাবে, তখন আমি আর বেঁচে নেই। তোমাকে আমি খুব ভালবাসি।'

ক্লারার মা মিসেস শ্যানন বেকার তার মেয়ের মৃত্যুর জন্যে শেষপর্যন্ত বিষণ্নতারোধী ওষুধটাকেই দায়ী করলেন। তার মনে পড়লো, ওষুধটা দেয়ার সময় তাকে শুধু জানানো হয়েছিলো যে, এ ওষুধের সবচেয়ে খারাপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে ইনফ্লুয়েঞ্জা। অথচ ওষুধটি নিয়মিত সেবন করার সপ্তাহ

তিনেকের মধ্যেই ক্লারার অবস্থা আরো খারাপ হচ্ছিলো। স্কুলের রেজাল্ট খারাপ হতে লাগলো। সে হয়ে উঠলো ভীষণ খিটখিটে মেজাজের, যেমনটা আগে কখনো দেখা যায় নি। একসময় সে পরিণত হলো নিজের ওপর বিরক্ত ও নিয়ন্ত্রণহীন একজন অসামাজিক মানুষে। আর তার পরেই এই ঘটনা।

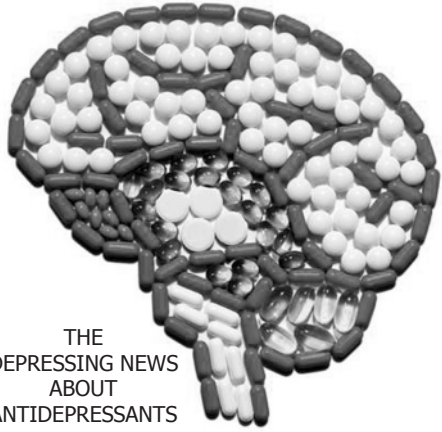
THE DEPRESSING NEWS ABOUT ANTIDEPRESSANTS

হ্যারিস। ১৮ বছর বয়সী এক তরুণ। বিষণ্নতা-আক্রান্ত এ তরুণটিও একদিন কলম্বিয়ার একটি স্কুলে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিলো। পরে জানা গেল, সে তখন নিয়মিত বিষণ্নতা নিরোধক ওষুধ সেবন করছিলো।

বলা হচ্ছে, আমেরিকায় ২০ লক্ষেরও বেশি শিশু-কিশোর ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনের শিকার। অর্থাৎ বিষণ্নতার মাত্রা সেখানে এত বেশি যে, সেটি জটিল ও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। আর সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গেলে স্বাভাবিকভাবেই তারা প্রেসক্রাইব করেন বিষণ্নতারোধী এক বা একাধিক ওষুধ। কিন্তু ওসব ওষুধ সেবন করে এই তরুণ-তাজা প্রাণগুলো সুস্থ তো হচ্ছেই না, বরং চালিত হচ্ছে আত্মহত্যার মতো ধ্বংসাত্মক প্রবণতার দিকে। বছর দশেক ধরে পাশ্চাত্যে বিশেষত আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে এ নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ভিত্তিতে ২০০২ সালে আমেরিকার ফুড এন্ড ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন 'প্যাক্সিল' নামে বিষণ্নতা চিকিৎসায় ব্যবহৃত একটি ওষুধ প্রেসক্রাইব করার ব্যাপারে সে দেশের ডাক্তারদের সাবধান করে দেন। কারণ তাদের গবেষণায় দেখা গিয়েছিলো–এ ওষুধটি বিশেষত তরুণ রোগীদের আত্মহত্যার প্রবণতাকে উসকে দেয়।

যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনের ম্যাক ক্লিন হাসপাতালের গবেষক ড. মার্টিন টিশার।

তার পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বিষণ্নতা-আক্রান্ত যে সমস্ত রোগী সুস্থ হওয়ার জন্যে প্লাসিবো বা অন্য কোনো উপায় যেমন : সাইকোথেরাপি, কাউন্সেলিং, ইতিবাচক জীবনপদ্ধতি গ্রহণ করেছেন– তাদের চাইতে 'প্রোজাক' সেবনকারীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা ছিলো তুলনামূলক বেশি। এসব উল্লেখযোগ্য গবেষণার ফলাফলের পর ইংল্যান্ডে বিষণ্নতা নিরোধক আরো বেশ কয়েকটি ওষুধের ব্যবহার শিশু-কিশোর-তরুণদের জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়।

ওষুধ কোম্পানিগুলো অবশ্য এ ধরনের অভিযোগকে যথারীতি অস্বীকার করেছে। তাদের যুক্তি হলো, চূড়ান্ত বিষণ্নতাই আসলে একজন রোগীকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এখানে ওষুধের কোনো ভূমিকা নেই। যদিও তাদের দাবির সপক্ষে বিস্তারিত কোনো তথ্য-প্রমাণ কিংবা গবেষণা-প্রতিবেদন তারা প্রকাশ করে নি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর কারণটা অবশ্য খুব পরিষ্কার। আর তা হলো, কোনো ওষুধের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে মানুষকে জানালে যে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, সেটা মেনে নিতে না পারার হীন ব্যবসায়িক স্বার্থ।

আত্মবিশ্বাস, ইতিবাচক জীবনচর্চা ও কাউন্সেলিং ॥ বিষণ্নতা দূর করে

নিউইয়র্কের ওয়েইল কর্নেল মেডিকেল কলেজের সাইকিয়াট্রির প্রফেসর ও গবেষক রিচার্ড ফ্রাইডম্যান বলেন, বিষণ্নতারোধী ওষুধের মাধ্যমে যারা নিরাময় লাভ করেন তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, বিষণ্নতা প্রতিরোধে এসব ওষুধের কার্যকারিতা বৈজ্ঞানিকভাবে অব্যর্থ ও প্রশ্নাতীত; অতএব তিনি বিষণ্নতা কাটিয়ে উঠবেন, তাতে সন্দেহের কী আছে?

অর্থাৎ মূলত রোগীর বিশ্বাসই এক্ষেত্রে নিরাময়কে ত্বরান্বিত করে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় যার নাম 'প্লাসিবো'। গবেষকরা আরো জানান, বিষণ্নতারোধী ওষুধগুলো আসলে একজন রোগীর বিষণ্নতা প্রশমনে প্লাসিবো প্রভাবের চেয়ে বেশি কার্যকর নয় অর্থাৎ ওষুধ দেয়া হয়েছে, কাজেই বিষণ্নতা ভালো হয়ে যাবে–এই বিশ্বাস বা আশাবাদটুকুই রোগীর মধ্যে কাজ করে।

বিষণ্নতারোধী ওষুধের কার্যকারিতা নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করেন আমেরিকার কানেকটিকাট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকিয়াট্রিস্ট আর্ভিং কির্স ও গাই স্যাপিরস্টেইন। এর আওতায় বিষণ্নতা-আক্রান্ত একদল রোগীকে দু-গ্রুপে ভাগ করা হয়। প্রথম গ্রুপের রোগীদেরকে ৩৮টি ওষুধ কোম্পানির গত

অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে বিষণ্নতার চিকিৎসায় প্রচলিত কিছু ওষুধ সেবনের পরামর্শ দেয়া হয়। অন্য গ্রুপটিকে কোনো ওষুধ নয়, বরং বিষণ্নতা নিরাময়ে কাউন্সেলিং, আত্মবিশ্বাসে উজ্জীবিত করা ইত্যাদি প্লাসিবো চিকিৎসার আওতায় রাখা হয়। নির্দিষ্ট সময় পর দেখা যায়, যারা প্লাসিবোর প্রভাবে বিষণ্নতামুক্ত হয়েছেন এবং যারা ওষুধ সেবন করেছেন–এ দুই গ্রুপের নিরাময়ের মাত্রা মোটামুটি একই।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিষণ্নতার মাত্রা যা-ই হোক, এক্ষেত্রে প্রথম পছন্দ হওয়া উচিত সাইকোথেরাপি বা কাউন্সেলিং। কির্স এর মতে, বিষণ্নতারোধী ওষুধ খেয়ে যারা নিরাময় লাভ করেছেন, ওষুধের ওপর তাদের অগাধ বিশ্বাসের কারণেই তা সম্ভব হয়েছে। কারণ, সরাসরি মস্তিষ্কের ওপর এসব ওষুধের তেমন কোনো প্রভাব দেখা যায় নি। তারা বলছেন, এ জাতীয় ওষুধগুলো হচ্ছে গাঁটের পয়সা খরচ করে কেনা কিছু অপ্রয়োজনীয় বস্তু!

পশ্চিমা দেশগুলোতে বিশেষজ্ঞদের অনেকেই এখন বলছেন, বিষণ্নতার চিকিৎসায় ওষুধের কথা ভাবতে পারো বটে, কিন্তু নিরাময়ের জন্যে বেছে নাও প্লাসিবো। অর্থাৎ বিশ্বাস, ইতিবাচক প্রত্যাশা, কাউন্সেলিং ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন পদ্ধতি। তাই বিষণ্নতা-চিকিৎসার ক্ষেত্রে সাইকিয়াট্রিস্টদের একটি সচেতন অংশ তাদের প্রেসক্রিপশনের ধরন পাল্টে ফেলছেন। এছাড়াও বিষণ্নতা সাধারণত ব্যক্তিবিশেষে একেকজনের ক্ষেত্রে একেক ধরনের হয়ে থাকে। তাই সার্বজনীনভাবে প্রচলিত কিছু ওষুধের মাধ্যমে সবার বিষণ্নতামুক্ত হয়ে যাওয়ার বিষয়টিও অমূলক বলে মনে করছেন তারা। বিশেষজ্ঞরা সে কারণেই বিষণ্নতা নিরাময়ের মূল অনুষঙ্গ হিসেবে কাউন্সেলিং ও জীবনধারা পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। তারা বলছেন, বিষণ্নতা নিরাময়ে ওষুধ কখনোই কাউন্সেলিংয়ের চেয়ে বেশি কার্যকর হতে পারে না এবং বিষণ্নতার জন্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো ওষুধেরই প্রয়োজন হয় না।

যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব ম্যানচেস্টার-এর শিশু-কিশোর মনস্তত্ত্ববিদ ড. রিচার্ড হ্যারিংটন বলেন, রোগীকে বিষণ্নতারোধী ওষুধ দেয়ার আগে চিকিৎসকদের উচিত এ সম্বন্ধে প্রকাশিত অপ্রকাশিত সব গবেষণার ফলাফলগুলো একবার পড়ে দেখা। কারণ, এসব ওষুধ একবার খাওয়া শুরু করলে এটা বন্ধ করাও কম ঝক্কির নয়। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা দিতে পারে যন্ত্রণাদায়ক পেশি সংকোচন, হাত-পা কাঁপা, ঝাপসা দৃষ্টি, বমি বমি ভাব ইত্যাদি। যার ফলাফল দাঁড়ায়, এসব মনোদৈহিক অস্বস্তি নিয়ে ক্রমাগত দুশ্চিন্তা এবং শেষমেশ আবার বিষণ্নতা। এ যেন দুর্ভেদ্য এক দুষ্টচক্র।

ওষুধ-বাণিজ্যের চিরন্তন ফাঁদ

ভোক্তাদেরকে অপ্রয়োজনীয় ওষুধ খাইয়ে মুনাফা লাভের অভিযোগ ওষুধ কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে নতুন নয়। এই সন্দেহকে সম্প্রতি আরো জোরালো করে তুলেছে আর্ভিং কির্সের কাছে লেখা থমাস মুরের একটি চিঠি। মুর আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্বাস্থ্যনীতি বিশ্লেষক। সেই চিঠিতে তিনি লেখেন, ১৯৯৮ সালে তিনি ও একদল গবেষক ৪০টি ওষুধ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহযোগিতায় বিষণ্নতারোধী ওষুধের কার্যকারিতা নিয়ে একটি গবেষণা চালান। কিন্তু গবেষণার বেশিরভাগেরই ফলাফল শেষপর্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নি।

থমাস মুর বলেন, এর মূল কারণটা হলো, বিষণ্নতা নিরাময়ে এসব ওষুধের উল্লেখযোগ্য কোনো কার্যকারিতা তারা খুঁজে পান নি। উপরন্তু দেখা গেছে, এসব ওষুধে যেসব উপকারের কথা বলা হয় তার সবই সম্ভব প্লাসিবো চিকিৎসায়। এসব বিবেচনায় মুরের অভিমত হলো, ওষুধগুলো যে বিষণ্নতা থেকে মুক্তি দেয়, এটি একটি ভুল ধারণা। তাই এসব ওষুধ বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টরা বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করে তাদের ব্যবসায়িক উদ্যোগটিকেই বরং প্রাধান্য দিচ্ছেন বেশি।

এতসব তথ্য-উপাত্ত-প্রমাণের পরও বিশ্বজুড়ে এমনকি খোদ পাশ্চাত্যে বিষণ্নতারোধী ওষুধের ব্যবহার না কমার কারণ উন্মোচিত হয়েছে জার্নাল অব আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশনে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে। তাতে বলা হয়েছে, এসব ওষুধের অকার্যকারিতার বিষয়ে সাধারণ মানুষকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে। আর যারা এ ওষুধগুলো সেবন করে বিষণ্নতামুক্ত হচ্ছেন বলে মনে করছেন, তারা মূলত সুস্থ হচ্ছেন প্লাসিবো অর্থাৎ তাদের বিশ্বাসের ফলে। কিন্তু মাঝখান থেকে ভোগ করছেন ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও উচ্চমূল্যের যন্ত্রণা। বিশেষজ্ঞদের তাই জিজ্ঞাসা–প্রকৃত সত্যটা এই বেলা সবার জানা প্রয়োজন নয় কি?

তথ্যসূত্র : নিউজউইক (৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১০)
টাইম ম্যাগাজিন (১ জানুয়ারি ২০১০, ৬ মার্চ ২০১২)
সাইক সেন্ট্রাল ডটকম

সিজারিয়ান ॥ নতুন চিকিৎসা মহামারি?

শিশু কীভাবে পৃথিবীর আলো দেখবে, কোন প্রক্রিয়ায় সে ভূমিষ্ঠ হবে– স্বাভাবিক প্রসব নাকি সিজারিয়ান, এ দুয়ের ভালো-মন্দ নিয়ে বিশ্বজুড়ে তর্কবিতর্কের শেষ নেই। এদিকে পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ইউরোপ-আমেরিকার পাশাপাশি এশিয়ার দেশগুলোতেও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সন্তান প্রসবের হার। কিন্তু এটা কতটা যুক্তিযুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত? প্রশ্নটা এবার উঠেছে খোদ পাশ্চাত্যেই।

স্বাভাবিক প্রসবই সাধারণভাবে সবার কাম্য। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রসব-জটিলতা এড়াতে কিংবা শিশুর জীবন রক্ষার্থে সিজারের প্রয়োজন হতে পারে। যেমন, স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে দীর্ঘায়িত প্রসব, প্লাসেন্টা বা গর্ভফুল যখন আশঙ্কাজনকভাবে জরায়ুমুখের কাছে নেমে আসে, মাতৃগর্ভে শিশুর অস্বাভাবিক অবস্থান কিংবা প্রসবের আগেই নাড়ি জরায়ুর বাইরে বেরিয়ে আসা। এছাড়াও রয়েছে গর্ভবতী মায়ের উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ডিম্বাশয় ও জরায়ুর সিস্ট, টিউমার ইত্যাদি। ঝুঁকিপূর্ণ এসব পরিস্থিতিতে চিকিৎসকরা সিজারিয়ান প্রসবের পক্ষে মত দেন।

সিজারিয়ান ॥ স্বাভাবিক প্রসবের চেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ

The Business of Being Born. ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তিপ্রাপ্ত এ ডকুমেন্টারিতে যে দৃশ্যটি দেখে দর্শকরা সবচেয়ে বেশি ভিরমি খেয়েছেন তা ছিলো, সিজারিয়ান অপারেশন করে একটি শিশুকে তার মাতৃগর্ভ থেকে বের করে আনার দৃশ্য। বহুল আলোচিত এ তথ্যচিত্রের নির্বাহী প্রযোজক সাবেক আমেরিকান টিভি উপস্থাপিকা রিকি লেক ও এর পরিচালক অ্যাবি এপস্টেইন। সবার কাছে তারা শুধু একটি বার্তাই পৌঁছে দিতে চেয়েছেন– মা এবং অনাগত সন্তানের স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়ানোর দরকার পড়লেই কেবল সিজারিয়ান অপারেশন করা উচিত এবং প্রসবকালে মা ও শিশুর সুস্থতাসহ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এটা কখনোই প্রথম পছন্দ হওয়া উচিত নয়।

সিজারিয়ান অপারেশনের ঝুঁকি সম্পর্কিত একটি সাম্প্রতিক জরিপও তাদের এই মতামতকে সমর্থন করেছে। অক্টোবর ২০০৭-এ বৃটিশ মেডিকেল জার্নাল পরিচালিত একটি জরিপে দেখা গেছে, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. জোস ভিলার ৪১০টি ল্যাটিন আমেরিকান হাসপাতালের ৯৭,০০০ ডেলিভারি রিপোর্ট অনুসন্ধান করেন। তারপর তিনি এ সত্যে উপনীত হন যে, স্বাভাবিক প্রসবের তুলনায় সিজারিয়ান করা মায়েদের মৃত্যুঝুঁকি তিনগুণ বেশি। রিপোর্টে বলা হয়, স্বাভাবিক প্রসবের ক্ষেত্রে যেখানে মায়েদের মৃত্যুঝুঁকি ০.১%, সেখানে সিজারিয়ানের ক্ষেত্রে ০.৪%। ডা. ভিলার বলেন, সিজারিয়ান একটি মেজর অপারেশন বলে এর ঝুঁকিও স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি।

এছাড়াও সিজারের পর মায়ের শরীরে রক্ত পরিসঞ্চালনের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। আবার স্বল্প ওজনের বাচ্চার বেলায় স্বাভাবিক প্রসবের তুলনায় সিজারের মৃত্যুঝুঁকি দ্বিগুণ। উপরন্তু, সিজারিয়ান অপারেশনে জন্ম নেয়া বাচ্চাদের মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত জটিলতা পরিলক্ষিত হয়। কারণ, স্বাভাবিক প্রসবের সময় শিশুর ফুসফুস থেকে কিছু তরল নিঃসৃত হয়, যা মাতৃগর্ভের বাইরে এসে স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্যে শিশুর ফুসফুসকে প্রস্তুত করে দেয়। সিজারিয়ান অপারেশন এই প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে।

এসবের পরও চিকিৎসক গবেষক বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছেন– সিজারিয়ান প্রাণ বাঁচায়, যখন সত্যিই তা প্রয়োজন। কিন্তু এ নিয়েও বিতর্কের শেষ নেই। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রসব প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে হাসপাতালগুলোতে 'পিটোসিন' নামে একটি ওষুধ ব্যবহারের চল রয়েছে, যা প্রসূতির জরায়ুতে প্রয়োজনীয় সংকোচন সৃষ্টি করে। কিন্তু এ সংকোচন আবার কিছুটা ব্যথা সৃষ্টি করে, তাই এ ব্যথার উপশমে চিকিৎসকরা দেন ব্যথানাশক ইনজেকশন (Epidural Painkiller), যেটি জরায়ুর সংকোচনকে ধীর ও বিলম্বিত করে, যা গর্ভস্থ শিশুর ঝুঁকির কারণ হতে পারে। অতঃপর চিকিৎসকরা শেষপর্যন্ত সিজারের পক্ষেই মত দেন। এর প্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, হাসপাতালগুলো এক্ষেত্রে পরিচালিত হচ্ছে মুনাফার চিন্তায়।

অপ্রয়োজনীয় সিজার ॥ কার স্বার্থে?

Pushed : The Painful Truth About Childbirth and Modern Maternity Care গ্রন্থের লেখক জেনিফার ব্লক বলেন, 'ধরুন, আপনি একটি রেস্টুরেন্টে ঢুকলেন, আরাম করে টেবিলে বসলেন কিন্তু কোনো খাবারের অর্ডার দিলেন না, ফলে স্বাভাবিকভাবেই রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষ

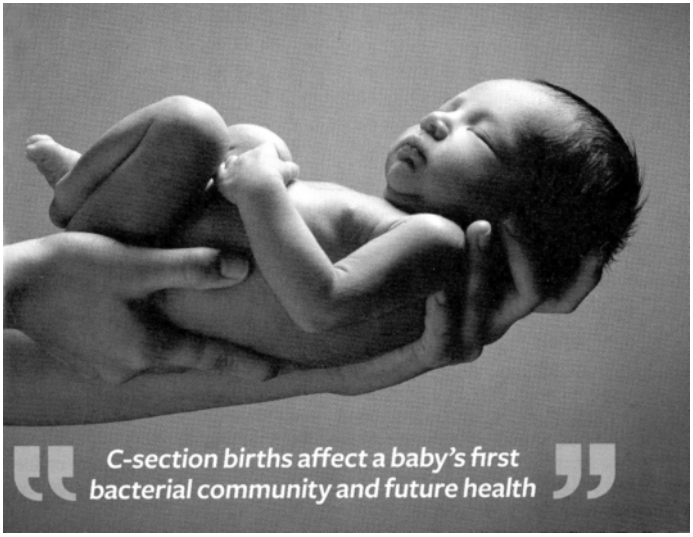

আপনার কাছ থেকে কোনো পয়সাই নিতে পারলো না। হাসপাতাল, ক্লিনিকে গিয়ে সিজার না করে সন্তান প্রসব করাও অনেকটা তেমনি।' তার মতে, 'স্বাভাবিক প্রসব হাসপাতালগুলোর জন্যে লাভজনক নয়।' উল্লেখ্য, স্বাভাবিক প্রসবের তুলনায় সিজারিয়ান অপারেশন কয়েকগুণ বেশি ব্যয়বহুল।

শুধু তা-ই নয়, স্বাভাবিক প্রসবে যেখানে সাধারণত একদিনের বেশি হাসপাতালে থাকার প্রয়োজন হয় না, সেখানে সিজারের ক্ষেত্রে থাকতে হয় পাঁচ থেকে সাত দিন পর্যন্ত। অর্থাৎ একদিকে সিজারের খরচ, তার সাথে যুক্ত হয় হাসপাতাল বা ক্লিনিকে তুলনামূলক বেশিদিন অবস্থানের খরচ। এর পাশাপাশি অতিরিক্ত ওষুধের খরচ তো আছেই। তবু কেবল আমেরিকাতেই নয়, বিশ্বজুড়েই বেড়ে চলেছে অপ্রয়োজনীয় সিজারের হার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০০৮ সালে সারা পৃথিবীতে যত শিশুর জন্ম হয়েছে তার মধ্যে ৬২ কোটিই হয়েছে অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান অপারেশনে!

Misconceptions : Truth, Lies, and the Unexpected on the Journey to Motherhood বইটির লেখিকা নাওমি উল্‌ফ। তিনি অভিযোগের আঙুল তুলেছেন ইনস্যুরেন্স কোম্পানি ও হাসপাতালগুলোর দিকে। এছাড়াও বিশেষজ্ঞদের মতে, বিভিন্ন টিভি-সিরিয়াল ও চলচ্চিত্রে স্বাভাবিক প্রসব প্রক্রিয়াকে সবসময় দেখানো হয় একটি তীব্র যন্ত্রণাময় ও

রক্তক্ষয়ী বিষয় হিসেবে, যা অযাচিত কিছু ভীতির সৃষ্টি করে। কিন্তু এগুলো থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের প্রকৃত ধারণা নিয়ে মূল সত্যটা জানা উচিত।

এ পরিস্থিতিগুলো ছাড়াও বর্তমানে আরেকটি কারণে সিজারের প্রবণতা বাড়ছে, তা হলো স্বেচ্ছা সিজার। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায়, ইলেকটিভ সিজারিয়ান সেকশন। এক্ষেত্রে সন্তান জন্মদানের জন্যে মা-ই স্বেচ্ছায় সিজারিয়ান প্রসবের পথ বেছে নেন। সাম্প্রতিককালে সচেতন চিকিৎসকদের দুশ্চিন্তার কারণ মূলত এই স্বেচ্ছা সিজার। কোনো কোনো চিকিৎসকের মতে, 'বর্তমানে সারা পৃথিবীতেই সিজারের হার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ মায়েদের চাহিদা। অনেক ব্যস্ত মায়েরা তাদের প্রসবের সময়সূচিটা নিজেদের মতো তৈরি করে নিতে চান।'

স্বেচ্ছা সিজার ॥ নতুন বিড়ম্বনা

গর্ভধারণের ৩৭ থেকে ৪২ সপ্তাহ পর্যন্ত সময়টি হলো সন্তান প্রসবের স্বাভাবিক কাল। কিন্তু স্বেচ্ছা সিজারের বেলায় অধিকাংশ প্রসবই হয়ে থাকে ৩৪ থেকে ৩৬ সপ্তাহের মধ্যে অর্থাৎ স্বাভাবিক গর্ভকালীন সময়ের আগেই। এর ফলে সিজারিয়ান শিশুরা কিছু স্বাস্থ্য-জটিলতার সম্মুখীন হয়, শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা যার মধ্যে অন্যতম। ফলে শিশুর নিঃশ্বাসের গতি দ্রুত হয়ে ওঠে, যা 'টাইপ টু রেসপিরেটরি স্ট্রেস সিনড্রোম' নামে পরিচিত।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যারা স্বেচ্ছায় সিজার করাতে চান তারা যেন এর ঝুঁকির দিকটিও সমানভাবে বিবেচনা করেন। কারণ, সিজারের ঝুঁকি বহুমুখী। মূত্রথলি ও অন্ত্রে অপারেশনজনিত আঘাতের ঝুঁকি, দীর্ঘমেয়াদি ব্যথা, মারাত্মক রক্তক্ষরণ–যাতে রক্ত পরিসঞ্চালনেরও প্রয়োজন হতে পারে, এমনকি রয়েছে প্রসূতি মায়ের মৃত্যুর ঝুঁকি। এছাড়াও অপারেশনের সময় জরায়ুতে জীবাণু সংক্রমণ হলে তা উপশমে কখনো কখনো ছয় মাস পর্যন্ত লেগে যেতে পারে। অপারেশনের ক্ষত শুকাতে জরায়ুর টিস্যুতে যে পরিবর্তন ঘটে, তাতে ভবিষ্যৎ গর্ভধারণও হয়ে ওঠে তুলনামূলক ঝুঁকিপূর্ণ। আশঙ্কার বিষয়টি হলো, সিজার-পরবর্তী জটিলতায় আক্রান্ত হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নবজাত সন্তানকে মায়ের স্তন্যদানে বিলম্ব ও বিঘ্ন ঘটে।

এছাড়াও চেতনানাশক ওষুধের ঝুঁকি এবং অন্যান্য দিক বিবেচনায় সিজারকে একটি মেজর অপারেশন বলেই গণ্য করা হয়, সাথে এর আনুষঙ্গিক ঝুঁকিগুলো তো আছেই। আর এ প্রক্রিয়ায় বাচ্চাকে মায়ের জরায়ু কেটে বের করা হয় বলে ভবিষ্যৎ গর্ভধারণও কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

প্রখ্যাত মেডিকেল জার্নাল 'ল্যানসেট'-এ বলা হয়েছে, সিজারের ঝুঁকি কমানোর অন্যতম উপায় হলো শুধুমাত্র চিকিৎসাশাস্ত্র নির্দেশিত পরিস্থিতিগুলোতেই এর দ্বারস্থ হওয়া। কারণ, স্বেচ্ছা সিজার মা ও শিশুর জীবনকে নানারকম ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিতে পারে। Caesarean Section Without Medical Indication শীর্ষক একটি প্রতিবেদনের সুরও একইরকম–স্বাভাবিক প্রসবের তুলনায় সিজারে মায়ের ঝুঁকি ও ক্ষতির শঙ্কা তিনগুণ বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০০৭ ও ২০০৮ সালে ভারত নেপাল শ্রীলঙ্কা থাইল্যান্ড ফিলিপাইন জাপান চীন কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামে একটি জরিপ চালায়। এ নয়টি দেশের ১২২টি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে স্বেচ্ছা সিজার পরবর্তী জটিলতাগুলো পর্যবেক্ষণ করা হয়। এতে দেখা যায়, এসব মায়েদের একটি বড় অংশকে হয় আইসিইউ-তে ভর্তি করতে হয়েছে অথবা অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে রক্ত পরিসঞ্চালন করতে হয়েছে, এমনকি মৃত্যুবরণও করেছে কেউ কেউ।

সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলভার্নিয়া হাসপাতালের প্রসূতি বিশেষজ্ঞ ডা. হো হন কক্ বলেন, কোনো কোনো মায়েরা স্বেচ্ছায় সিজারিয়ান বেছে নেন, এর কারণ প্রধানত মানসিক। তারা আসলে স্বাভাবিক প্রসবের ব্যথা ও অন্যান্য শারীরবৃত্তিয় পরিবর্তনগুলো নিয়ে বৃথাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কেউ-বা আবার দিন-তারিখ-রাশি মিলিয়ে নির্দিষ্ট শুভদিনে সন্তান জন্ম দিতে চান, তখন স্বাভাবিকভাবেই তিনি সিজারের প্রতি আগ্রহী হন। আর এই ইচ্ছেমতো শিডিউলিং করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯০ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে সময়ের আগে জন্ম নেয়া অপরিণত শিশুজন্মের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০ শতাংশ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, চীনে মোট প্রসবের অর্ধেকই ঘটে সিজারের মাধ্যমে, যার এক চতুর্থাংশই স্রেফ অপ্রয়োজনীয়। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে মোট এক লক্ষ প্রসবের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে।

প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমাদের দেশেও বেশ নাটকীয়ভাবেই যেন বেড়ে গেছে সিজারিয়ান প্রসবের হার। বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যে গবেষণা অনুসন্ধান শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহল থেকে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে দেশের একটি জাতীয় দৈনিকে (প্রথম আলো, ১৯ এপ্রিল ২০১১) একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তাতে রাজধানীর একটি হাসপাতালের চিত্র তুলে ধরে

বলা হয়, সেই হাসপাতালে ২০১০ সালে ১০ হাজার ২৩৬টি শিশুর জন্ম হয়, যার মধ্যে ৬৬ শতাংশই ঘটে সিজারের মাধ্যমে!

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এমন বিস্ময়কর চিত্র শুধু রাজধানীর একটি হাসপাতালের নয়, সারা দেশেই কমবেশি এমনটি ঘটছে। মাতৃমৃত্যু ও মাতৃস্বাস্থ্যসেবা জরিপ ২০১০ অনুসারে, সে বছর দেশে প্রায় চার লাখ ৩৮ হাজার শিশু সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে জন্ম নিয়েছে। ২০০১ সালের তুলনায় এ সংখ্যা পাঁচ গুণ বেশি!

রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশে শিশুজন্মের সংখ্যা ও হার বাড়ার সাথে সাথে বাড়ছে অপ্রয়োজনীয় সিজারের সংখ্যাও। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, এর জন্যে কোনো জবাবদিহির ব্যবস্থা নেই। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এতে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে। তাদের মতে, ২০১০ সালের মোট সিজারিয়ান অপারেশনের মধ্যে এক লাখ ৪০ হাজার ছিলো নিছক অপ্রয়োজনীয়। অর্থাৎ শুধু সে বছরেই অপ্রয়োজনীয় সিজারের পরিমাণ ছিলো ৩২ শতাংশ! জরিপে বলা হয়েছে, শিক্ষিত ও ধনী শ্রেণী অর্থাৎ সামর্থ্যবানদের ক্ষেত্রে এর হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। পরিসংখ্যান মতে, ব্যক্তিমালিকানাধীন হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে যত প্রসব হচ্ছে তার ৭১ শতাংশই হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় সিজারে।

সে রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন ফ্যাকাল্টির ডীন প্রফেসর ডা. এ বি এম আবদুল্লাহ বলেন, অপ্রয়োজনীয় সিজারের কারণে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ে। এছাড়াও সিজারিয়ান অপারেশনের সময় বেদনানাশক ও চেতনানাশক ব্যবহার করা হয়, এর প্রভাব পড়ে মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্যের ওপর। আইসিডিডিআরবি-র জনস্বাস্থ্য কার্যক্রমের প্রধান পিটার কিম স্ট্রিটফিল্ড-এর মতে, সিজারের ফলে নবজাত শিশুকে মায়ের দুধ শুরু করাতে সমস্যা দেখা দেয়। এতে মায়ের জরায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও বন্ধ্যাত্বের ঝুঁকি বাড়ে। প্রসব-পরবর্তীকালে মায়ের মানসিক সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আরেকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বলেন, চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রসূতি মায়ের এমন কিছু লক্ষণের কথা বলা আছে, যখন সত্যিই সিজার করা প্রয়োজন। কিন্তু চিকিৎসক যেন সেটি অবশ্যই ব্যবস্থাপত্রে উল্লেখ করেন– কেন এক্ষেত্রে সিজার করা হলো। তিনি মনে করেন, এমন জবাবদিহির ব্যবস্থা থাকলে অপ্রয়োজনীয় সিজারের হার কমে যাবে। দেশের বিশিষ্ট শিশু-চিকিৎসক প্রফেসর ডা. এম কিউ কে তালুকদার বলেন, 'প্রসবযন্ত্রণা শুরু হলে

মা-কে অবশ্যই সার্বিক নজরদারিতে রাখা নিশ্চিত করতে হবে। স্বাভাবিক প্রসবের জন্যে চিকিৎসক শেষপর্যন্ত অপেক্ষা করবেন, চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। এটাই মেডিকেল এথিকস বা নৈতিকতা।'

স্বাভাবিক প্রসব ॥ সবদিক থেকেই ভালো

২০১০-এ যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্স-এর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জীবনের প্রথম দিনগুলোতে যেসব ক্ষুদে অণুজীব আমাদের শরীরে এসে স্থান করে নেয়, তারাই পরবর্তীতে আমাদের ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলে। উপরন্তু এরা অন্যান্য ক্ষতিকর জীবাণুগুলোকে প্রতিহত করে। স্বাভাবিক প্রসবকালে মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার সময় শিশুর শরীরে এরকম প্রায় ১০০ প্রজাতির হিতকরী ব্যাকটেরিয়া এসে জমা হয়। যেমন : ল্যাকটোব্যাসিলাস, যা দুধ ও দুধ জাতীয় খাবার হজমে অন্যতম সহায়ক।

এ তুলনামূলক গবেষণাটিতে দেখা গেছে, স্বাভাবিক প্রসবজাত শিশুর ত্বক, নাক, মুখ ও পায়ুপথে যেসব উপকারী ব্যাকটেরিয়ার হদিস মেলে সে তুলনায় সিজারিয়ান শিশুর শরীরে প্রাপ্ত ব্যাকটেরিয়াগুলো একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির। কারণ, সিজারিয়ান শিশুরা মাতৃদেহের স্বাভাবিক প্রসব-পথ অতিক্রম করতে পারে না বলে এসব উপকারী অণুজীবগুলো থেকে তারা বঞ্চিত হয়।

অন্যদিকে ইউনিভার্সিটি অব পুয়ের্তো-রিকো, ইউনিভার্সিটি অব কলোরাডো এবং ভেনিজুয়েলার দুটি হেলথ ইনস্টিটিউটের যৌথ গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সিজারিয়ান শিশুদের ত্বক ও শরীরে প্রায়শই পাওয়া যায় স্ট্যাফাইলোকক্কাস এবং এসিনোব্যাকটার-এর মতো ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া। এসব বিবেচনায় গবেষকরা বলেন, সিজার শিশুর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে যেভাবে ব্যাহত করে, সেটি তার ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যের জন্যে মোটেই অনুকূল নয়। ফলে সাধারণভাবে এসব শিশু এলার্জি, এজমা এবং দুর্বল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাজনিত বিভিন্ন রোগের ঝুঁকিতে থাকে।

সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে নির্ভেজাল আর গভীরতম সম্পর্কটি হলো মা এবং সন্তানের। ইয়েল ইউনিভার্সিটির একটি গবেষণায় ব্রেন স্ক্যান পরীক্ষায় দেখা গেছে, যেসব মায়েরা স্বেচ্ছায় সিজার করিয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে এ সম্পর্কের উষ্ণতা তুলনামূলক কম। সম্ভাব্য কারণ হিসেবে

বিজ্ঞানীরা বলছেন, স্বাভাবিক প্রসবকালে যখন জরায়ুতে সংকোচন ঘটে তখন মায়ের পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে 'অক্সিটোসিন' নামক একটি হরমোন নিঃসৃত হয়। আর মা ও সন্তানের মাঝে মমতার সেতুবন্ধন ও সুষম আত্মিক যোগাযোগ রচনার ক্ষেত্রে এ হরমোনটির রয়েছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। কিন্তু সিজারের পুরো প্রক্রিয়াটিতে এ হরমোনটির কোনো ভূমিকাই নেই বলে পরবর্তীকালে এসব মায়েদের বিষণ্নতায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে।

ইয়েল ইউনিভার্সিটির গবেষক জেমস স্যাইন বলেন, আমরা সিজারের বিপক্ষে নই, কিন্তু সেটি যেন শুধুমাত্র সত্যিকার প্রয়োজনেই ঘটে। এ ব্যাপারে ডা. হো-এর মতামতও সুস্পষ্ট–'যেসব মায়েরা সিজারে আগ্রহী তাদের উচিত আগেই চিকিৎসকের সাথে খোলামেলা আলোচনা করে পুরো বিষয়টি জেনে নেয়া। তারপর একটি সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া– তিনি আসলে কোনটি বেছে নেবেন। আর আমরা যেন ভুলে না যাই যে, স্বাভাবিক প্রসবই সবদিক থেকে ভালো।'

তথ্যসূত্র : রিডার্স ডাইজেস্ট (জুলাই ২০১১)
নিউজউইক (ফেব্রুয়ারি ২০০৮)

নিরাময়ের আধুনিক ধারণা ॥ জানা চাই সবারই

বিশ্বাসে মিলায় 'নিরাময়'

জীবনে সফলতার জন্যেই শুধু নয়, বরং সুস্থতার জন্যেও বিশ্বাস একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রচলিত 'প্লাসিবো ইফেক্ট' কথাটা মূলত এই বিশ্বাসেরই আধুনিক পরিভাষা। রোগমুক্তির বেলায় রোগীর বিশ্বাসটাই এখানে মূল ভূমিকা পালন করে।

প্লাসিবো ইফেক্ট কখনো কখনো সংশ্লিষ্ট ওষুধের চেয়েও ভালো কাজ করে। হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের গবেষক টেড কেপচাক্ আইবিএস রোগীদের নিয়ে একটি গবেষণা চালান, যেখানে ওষুধ হিসেবে তাদেরকে খাওয়ানো হয় সাধারণ কিছু সুগার-পিল–আইবিএস সারানোর ক্ষেত্রে যার আসলে কোনো ভূমিকাই নেই। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এসব রোগীরা তাদের রোগ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পান, কারণ তাদেরকে জানানো হয়েছিলো যে, আইবিএস-এর সঠিক ও কার্যকরী ওষুধটিই তারা সেবন করছেন।

ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব হল-এর গবেষক আর্ভিং কির্স বলেন, একটি ওষুধ শরীরে কোন প্রক্রিয়ায় কাজ করে তা আমরা রোগীদের বুঝিয়ে দিই, যা প্লাসিবো ইফেক্টকে আরো ফলপ্রসূ করে তোলে। তার মতে, মাথাব্যথা ও ত্বকের সমস্যা দূর, ব্যথা উপশম, হৃদযন্ত্রের গতি ও রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখা এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সংহত করা–প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আমরা বিশ্বাসের এ শক্তিকে কাজে লাগাতে পারি।

ইতিবাচক হোন

'থ্রি ইডিয়ট্স' সিনেমার সেই দুরন্ত নায়কের কথা মনে আছে? সবরকম বিপদ-আপদে, জটিল পরিস্থিতিতে বুকে হাত রেখে নিজেকে সে প্রবোধ দেয়–'অল ইজ ওয়েল, অল ইজ ওয়েল'। আর মুহূর্তেই সব ঠিকও হয়ে যায়, পরিস্থিতি যেমনই হোক সেটি চলে আসে তার অনুকূলে। এবার কিন্তু

সিনেমায় নয় বরং বিস্তর গবেষণা আর অনুসন্ধানের পর বিজ্ঞানীরাও বলছেন সেই একই কথা–সবসময় নিজেকে বলুন, সবকিছু ভালোই চলছে। দৃঢ় প্রত্যয়ে নিজেকে শোনান ইতিবাচক শব্দমালা। সত্যি সত্যি তা-ই ঘটতে থাকবে তাহলে।

দৈনন্দিন জীবনের নানা স্ট্রেস শরীরের সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমকে উস্‌কে দিয়ে আমাদের মধ্যে 'ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স' সৃষ্টি করে। ক্রমাগত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকলে ডায়াবেটিস ও স্মৃতিভ্রষ্টতার মতো রোগগুলো অনিবার্য। নেতিবাচকতা ও দুশ্চিন্তা এভাবেই আমাদেরকে অসুস্থ করে তোলে। অন্যদিকে বিশ্বাস আর ইতিবাচকতা শুধু যে স্ট্রেস কমায় তা নয়, এটি ভেতরে একটি নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করে এবং সবকিছু যে শেষপর্যন্ত ভালোই হবে–এমন একটি অনুভূতিরও জন্ম দেয়।

বিজ্ঞানীরা বলেন, আশাবাদী মানুষেরা দ্রুত নিরাময় লাভ করেন। বড় ধরনের অপারেশন থেকে সেরে ওঠা, কার্যকর রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, রোগমুক্ত দীর্ঘজীবন লাভ–এসব ক্ষেত্রে তারা তুলনামূলক এগিয়ে থাকেন। শুধু তা-ই নয়, ক্যান্সার, হৃদরোগ এবং কিডনি অকার্যকারিতায় ভুগছেন যারা, তাদের মধ্যেও আশাবাদী ও বিশ্বাসী মানুষেরা অপেক্ষাকৃত সুস্থ জীবনযাপন করেন। তাই গবেষকদের পরামর্শ–আশাবাদী হোন।

ধ্যানমগ্নতায় আসুক প্রশান্তি

মুনী-ঋষি-সাধকরা নির্বাণ লাভের জন্যে ধ্যানমগ্ন হলেও, বিজ্ঞানের এ বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগে এসে বিজ্ঞানীদের অভিমত–স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যেও ধ্যানের প্রয়োজন আছে বৈকি। বেশ কয়েকটি গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ক্যান্সার রোগীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো, গুরুতর বিষণ্নতা দূর, ত্বক সুরক্ষা ও নানাবিধ রোগ এমনকি এইডসের বিরুদ্ধে লড়তেও মেডিটেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মেডিটেশন বার্ধক্য প্রক্রিয়াকে শ্লথ করে। আমাদের প্রতিটি দেহকোষে 'টেলোমেয়ার' নামক একটি উপাদান থাকে। প্রতিবার কোষ বিভাজনের সময় এই টেলোমেয়ার ক্রমাগত আকারে ছোট হতে থাকে। আর এতেই বার্ধক্য প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় বলে গবেষকদের ধারণা। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেন্টার ফর মাইন্ড এন্ড ব্রেন'-এ ক্লিফোর্ড শ্যারনের নেতৃত্বে একদল গবেষক প্রমাণ করেন এক অভূতপূর্ব তত্ত্ব। সেটি হলো, নিয়মিত যারা মেডিটেশন করেন, অন্তত টানা তিন মাস তাদের শরীরে একটি এনজাইমের

পরিমাণ বাড়ে, যা টেলোমেয়ারের আকার বৃদ্ধিতে সহায়ক। ফলে নিরন্তর কোষ বিভাজনের পরও টেলোমেয়ারের আকার অপরিবর্তিত থাকে এবং বার্ধক্য প্রক্রিয়া ঘটে তুলনামূলক ধীরে।

স্ট্রেসমুক্তির জন্যে মেডিটেশনের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক। গবেষণায় দেখা গেছে, যারা নিয়মিত মেডিটেশন করেন তাদের ব্রেনের এমিগডালা-তে কিছু গঠনগত পরিবর্তন ঘটে। উল্লেখ্য, ব্রেনের এ অংশটি ভয় এবং অন্যান্য নেতিবাচক আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়াও মেডিটেশন কর্টিসোল নিঃসরণ কমায়। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকিয়াট্রিস্ট এলিসা এপিলের মতে, শরীরের হরমোন নিঃসরণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে মেডিটেশন অত্যন্ত চমৎকারভাবে স্বাস্থ্য-সুরক্ষার কাজটি করে থাকে। তাই বিজ্ঞানীদের পরামর্শ–নিয়মিত মেডিটেশন করুন। আত্মনিমগ্নতার এ সময়টুকু আপনার জীবনকে সার্বিক দিকে সমৃদ্ধ করে তুলবে।

সমমর্মী সম্পর্কের উষ্ণতায় বাঁচুন

একাকিত্ববোধ আপনার স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ায়। এর ফলে বিষণ্নতা, স্মৃতিভ্রষ্টতা থেকে শুরু করে হার্ট অ্যাটাক পর্যন্ত হতে পারে। সামাজিক একাকিত্বের বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ গবেষণার পর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক জন ক্যাসিয়োপো বলেন, সুস্বাস্থ্যের জন্যে একাকিত্বের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসাটা ধূমপান বর্জনের চেয়ে কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আটলান্টার এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক চার্লস রেইজন বলেন, যেসব মানুষ সামাজিক জীবনযাপন করেন এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধপূর্ণ সম্পর্কের উষ্ণতায় সজীব থাকেন তারা সহজে অসুস্থ হন না এবং বাঁচেনও দীর্ঘদিন। অন্যদিকে একাকী মানুষেরা সহজেই স্ট্রেস-আক্রান্ত হন। তিনি বলেন, এসব মানুষের শরীরে কর্টিসোল নিঃসরণের হার ও প্রদাহের ঝুঁকি বেশি এবং

তাদের রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও তুলনামূলক দুর্বল। ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়াজনিত অসুস্থতায় তারা বেশি আক্রান্ত হন। তাই এসব সমস্যা এড়াতে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সঙ্ঘবদ্ধতার মাধ্যমে একাকিত্ববোধ থেকে বেরিয়ে আসাটা জরুরি।

আত্মলীন হোন উচ্চতর অস্তিত্বে

পাশ্চাত্যে হাজারেরও বেশি গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, যারা নিয়মিত প্রার্থনা করেন তাদের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভালো। হৃদরোগ, স্ট্রোক ও উচ্চ রক্তচাপজনিত অসুস্থতার হার তাদের কম। এইডস কিংবা মেনিনজাইটিসের মতো রোগের বিরুদ্ধে তাদের রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকরী। উপরন্তু তাদের ক্যান্সারের ঝুঁকি কম। নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির মেডিকেল সেন্টারের বিজ্ঞানী রিচার্ড সেলন বলেন, ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষের জীবনযাপন সাধারণত কম ঝুঁকিপূর্ণ হয়। আর ধর্ম ও আত্মিক চেতনা তো নিজেই একটি আশ্রয়স্বরূপ।

রোগমুক্তি ও সুস্থতার জন্যে ধর্মপালনকে এখন চিকিৎসা ও ওষুধের মতোই একটি সহায়ক-শক্তি হিসেবে বিবেচনা করছেন বিজ্ঞানীরা। তাদের মতে, ধর্মের নৈতিক শিক্ষা, ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসরণ এবং প্রার্থনা প্লাসিবো-ইফেক্টের মতোই সুস্থতার একটি নির্ভরযোগ্য অনুষঙ্গ। ইতালির সান-ডিয়াগো হাসপাতালের গবেষক পাওলো লিসেনি বলেন, ক্যান্সার-আক্রান্তদের নিয়ে পরিচালিত গবেষণাগুলোতে দেখা গেছে, যারা ধর্মীয় ও আত্মিক চেতনায় উদ্দীপ্ত ছিলেন তাদের ক্ষেত্রে নিরাময়ের শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়া অধিকতর জোরদার হয়েছে।

আত্মিক চেতনা নির্ভর জীবনাচরণ মানুষকে জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সহজ হয়। জীবনযাপনে স্ট্রেস কমে। মেডিটেশনের বহুমুখী উপকারের বিষয়টি তুলে ধরেছেন যিনি, সেই বিজ্ঞানী শ্যারনের ভাষায়–'এভাবেই একটি সুন্দর ও অর্থবহ জীবনে পরিপূর্ণভাবে বাঁচার সুযোগ পাই আমরা'।

তথ্যসূত্র : নিউসায়েন্টিস্ট (২৭ আগস্ট ২০১১)

প্লাসিবো ॥ বিশ্বাস রোগ নিরাময় করে

বিস্ময়কর মনোদৈহিক শক্তি : প্লাসিবো

ভাবুন তো এমন একটি ইলেক্ট্রো-কেমিক্যাল ডিভাইসের কথা–আপনার যেকোনো অসুস্থতায় যা আপনাকে দেবে তাৎক্ষণিক নিরাময়, ব্যথা-বেদনা নিমেষে দূর হবে। জানি, ভাবতেই শিহরিত হয়ে উঠছেন। কিংবা ভাবছেন, এ নিছকই কল্পনা বৈ আর কিছু নয়। কিন্তু এটিকেই এখন রোগ নিরাময়ের এক বাস্তব সম্ভাবনা হিসেবে দেখছেন চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা।

বিশ্বাস ও মনের নিরাময় শক্তি নিয়ে দীর্ঘ গবেষণার পর তারা বলছেন, রোগ নিরাময়ের আশায় শুধু গাদা গাদা ওষুধ খেয়ে দিন গুজরান করার সময় বুঝি শেষ হতে চললো। নিজের ভেতরের অফুরন্ত নিরাময় ক্ষমতা আর মনের শক্তিকে জাগিয়ে তুলুন। তাতে রোগ নিরাময় হবে সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত আর ঝঞ্ঝাটহীন। এটাই প্লাসিবো। মনোদৈহিক নিরাময় শক্তিকে যা ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে এবং যেকোনো ইলেক্ট্রো-কেমিক্যাল ডিভাইসের চেয়েও এটি অধিকতর কার্যকরী।

একবিংশ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, প্লাসিবো অর্থাৎ রোগীর বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে ঘটতে পারে অভূতপূর্ব সব নিরাময়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের জগতে সূচিত হতে পারে এক নতুন সম্ভাবনা।

প্লাসিবো ইফেক্ট : আসলে কী?

ধরা যাক, চিকিৎসকের কাছে একজন রোগী এলেন। তার সমস্যার কথা শোনার পর চিকিৎসক তাকে একটি ওষুধ সেবনের পরামর্শ দিলেন এবং বুঝিয়ে দিলেন যে, তার এই অসুস্থতায় ওষুধটি কীভাবে কাজ করবে। রোগী বাড়ি ফিরে পূর্ণ আস্থা নিয়ে ওষুধটি খেতে শুরু করলেন এবং একসময় ঠিক সুস্থ হয়ে উঠলেন। চিকিৎসক জানেন, ওষুধটি আর কিছুই নয়, সেটি একটি সুগার পিল। অর্থাৎ ওষুধ মনে করে রোগী যা খাচ্ছেন সেটি নেহাতই চিনি দিয়ে তৈরি একটি ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল। তাহলে এখানে নিরাময় করলো

কে? আসলে রোগীর আস্থা আর বিশ্বাসই তাকে নিরাময় ও সুস্থতার দিকে নিয়ে গেছে। কারণ, ওষুধ যা-ই হোক রোগী মনে করছেন, সুস্থ হওয়ার জন্যে ঠিক ওষুধটিই এবার পড়েছে। নিরাময়ের শাশ্বত এই প্রক্রিয়াটিই চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় 'প্লাসিবো ইফেক্ট' নামে পরিচিত।

গত শতাব্দীর শেষের কয়েকটি দশক থেকে একাধিক গবেষণায় প্লাসিবো ইফেক্টের কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। বিভিন্ন রকম ব্যথা-বেদনা, হজমযন্ত্রের গোলযোগ আইবিএস ইত্যাদি জটিলতায় প্লাসিবো দারুণভাবে কার্যকরী। গবেষকদের মতে, নিরাময়ের অনুঘটক হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি প্লাসিবো ইফেক্ট একজন মানুষের জীবনকেও বেশ ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন

প্রশ্ন আসতে পারে–এটা তো একটা মিথ্যা যে, রোগী মনে করছেন ওষুধ খাচ্ছেন, কিন্তু আদৌ তা নয়। অর্থাৎ রোগী তার রোগের ওষুধ মনে করে যা খাচ্ছেন সেটি তো মোটেই সে রোগের ওষুধ নয়। কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকার প্রথমসারির মেডিকেল সেন্টারগুলোর স্বাস্থ্য-গবেষকদের কাছে এ যুক্তিটা এখন আর ধোপে টিকছে না। তাদের মতে, প্লাসিবো নিয়ে যত প্রশ্নই থাকুক, এটি তো শেষপর্যন্ত রোগীকে সুস্থ করে তুলছে, রোগী ভালো বোধ করছেন। উপরন্তু, অন্যান্য অনেক ওষুধের মতো এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও নেই।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের জগতে খ্যাতনামা ও নেতৃস্থানীয় একটি জার্নাল 'ল্যানসেট'। এতে সম্প্রতি প্লাসিবোর কার্যকারিতা নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে একটি স্বাস্থ্য-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, নিরাময়ের ক্ষেত্রে ওষুধ আর প্লাসিবোর ভূমিকাতে তফাত আসলে খুব সামান্যই এবং এটি নিঃসন্দেহে চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন।

প্লাসিবোই কি তবে মূল অনুঘটক?

ইতালির তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডা. ফ্যাব্রিজিও বেনেদেত্তি বলেন, প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থা ও পুরনো ধ্যানধারণাকে প্লাসিবো সত্যিকার অর্থেই একটা ভীষণ ঝাঁকি দিয়েছে। তার মতে, প্লাসিবো অর্থাৎ রোগীর বিশ্বাস ছাড়া আসলে নিত্য-ব্যবহার্য ও বহুল প্রচলিত ওষুধগুলোও ততটা কার্যকর নয়। অপারেশনের জন্যে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া কিছু রোগীর ওপর একটি গবেষণা চালিয়ে তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন।

প্রফেসর বেনেদেত্তি প্রথমে এই রোগীদের দুটি গ্রুপে ভাগ করেন। এরা তাদের সম্ভাব্য অপারেশন নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন। তাই এদের সবাইকে প্রতিদিন ইনজেকশনের মাধ্যমে স্ট্রেস-নিরোধক ওষুধ প্রয়োগ করা হতো। এ ওষুধ প্রয়োগের বিষয়টি প্রথম গ্রুপের রোগীরা জানতেন কিন্তু দ্বিতীয় গ্রুপের রোগীদের তা জানানো হয় নি।

এছাড়াও প্রতিদিন হাসপাতালের রুটিন চেক-আপের সময় ডাক্তাররা প্রথম গ্রুপের কাছে গিয়ে স্ট্রেস-নিরোধক ওষুধ দেয়ার বিষয়টি মনে করিয়ে দিতেন। সেইসাথে তাদের বিভিন্ন আশার বাণী শোনাতেন এবং ইতিবাচক কাউন্সেলিং করতেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় গ্রুপকে হাসপাতালের নিয়মিত সেবা দেয়া হলেও কোনো কাউন্সেলিং করা হয় নি।

কিছুদিন পর দেখা গেল, যাদের পুরো বিষয়টি জানানো হয়েছিলো তারা সত্যিই আগের চেয়ে ভালো বোধ করছেন। কিন্তু যারা কিছুই জানতেন না তাদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন তো হয়ই নি বরং তাদের ব্যথাও আগের চেয়ে বেড়েছে। পরবর্তীতে তাদের ব্যথামুক্তির জন্যে নির্দেশিত মাত্রার চেয়ে দ্বিগুণ পরিমাণ মরফিন প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়েছিলো।

এ গবেষণার ফলাফল দেখে প্রফেসর বেনেদেত্তি বলেন, প্রচলিত ধারণা অনুসারে প্লাসিবোর চেয়ে সত্যিকার ওষুধই কার্যকরী। কিন্তু আসলে আমরা দেখলাম, প্লাসিবো অর্থাৎ রোগীর বিশ্বাস ছাড়া সত্যিকার ওষুধও এক্ষেত্রে কোনো কাজ করে নি।

সত্যটা এবার জানা চাই

ইংল্যান্ডের হাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজিস্ট আর্ভিং কির্স। তার সদ্য প্রকাশিত 'দি এমপেররস্ নিউ ড্রাগ্স' বইটিতে তিনি তুলে ধরেছেন পর্দার আড়ালের ভিন্ন একটি দিক। উন্মোচন করেছেন ওষুধ-বাণিজ্যের কিছু অপ্রকাশিত সত্য।

নতুন কোনো ওষুধ বাজারজাত হওয়ার আগে তার কার্যকারিতা সম্বন্ধে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। এ সময় যাদের ওপর ওষুধটি প্রয়োগ করা হয় তাদেরকে এ সম্বন্ধে কিছুই জানানো হয় না। এতে বোঝা যায়, প্লাসিবোর চাইতেও ওষুধটি বেশি কার্যকর কি না? অর্থাৎ বাজারজাত হয়ে সাধারণের কাছে পৌঁছার আগে এভাবে প্রতিটি ওষুধকেই প্লাসিবোর চেয়ে অধিকতর কার্যকারিতার প্রমাণ দিতে হয়।

আর্ভিং কির্স বলেন, বিষণ্নতার চিকিৎসায় যে ওষুধগুলো হরদম ব্যবহৃত

হচ্ছে, তাদের ল্যাবরেটরি পরীক্ষার সময় শতকরা ৭০ ভাগ ক্ষেত্রেই এ নিয়মটি অনুসরণ করা হয় নি। রোগীদের তখন জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো যে, তাদের কী ওষুধ দেয়া হচ্ছে। এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে, তাহলে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে রোগীরা যে বিষণ্নতামুক্ত হয়েছিলেন সেটি কীসের জোরে–ওষুধের কার্যকারিতা, নাকি প্লাসিবো? যদিও এ ওষুধগুলো নিয়ে ধুন্ধুমার ব্যবসা যথারীতি চলছেই।

বিশ্বজুড়ে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ বিষণ্নতারোধী ওষুধ সেবন করছে, কিন্তু এসব ওষুধের লাইসেন্স-প্রাপ্তি নিয়ে এখন প্রশ্ন তুলছেন খোদ চিকিৎসকরাই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইতোমধ্যেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে, ২০৩০ সালের মধ্যে বিষণ্নতা সবচেয়ে বড় সামাজিক অভিশাপে রূপ নিতে যাচ্ছে।

নিরাময়ের জন্যে চাই আত্মশক্তিতে বিশ্বাস

রোগ নিরাময়ে প্লাসিবোর ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করেছেন হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের প্রফেসর টেড কেপচাক্। আইবিএস রোগীদের নিয়ে পরিচালিত একটি গবেষণায় তিনি দেখান, প্রচলিত পদ্ধতিতে চিকিৎসায় এদের ক্ষেত্রে উপকার পাওয়া যায় ৪০ শতাংশ আর এর সাথে প্লাসিবো যোগ করে রোগীর সমস্যামুক্তি ঘটেছে ৬০ শতাংশ। তিনি বলেন, সবচেয়ে ভালো ওষুধের কার্যকারিতাও এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

আমরা মানুষ। সমাজে বাস করি। আমাদের রয়েছে সংবেদনশীল মন আর অনুভূতিপ্রবণ একটি অস্তিত্ব। অস্বীকার করার কিছু নেই যে, চারপাশের সব বিষয়েই–ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়–আমাদের আবেগীয় প্রতিক্রিয়া ঘটে। মূলত সে কারণেই নিরাময় প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস আর মনের শক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর একে অস্বীকার করা মানে মানব অস্তিত্বের একটি মূল্যবান অধ্যায়কে অন্ধকারে সরিয়ে রাখা। তাই নিরাময় ও সুস্থতার জন্যে বিশ্বাসী হোন, জেগে উঠুক আপনার ভেতরের শক্তি–এমনই অভিমত চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের।

তথ্যসূত্র : রিডার্স ডাইজেস্টে (সেপ্টেম্বর ২০১২) প্রকাশিত
'The Healing Power of Nothing'

ধর্মবিশ্বাস রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে

অল্টারনেটিভ মেডিসিন থেরাপি বা বিকল্প চিকিৎসাব্যবস্থা। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের নিরন্তর অগ্রগতি ও বিকাশের ধারায় বিশ্বজুড়ে দিন দিন বিজ্ঞানীদের আগ্রহ ও উৎসাহের বিষয়ে পরিণত হচ্ছে এ বিষয়টি। যার ধারাবাহিকতায় গত কয়েক দশকের গবেষণা আর পর্যবেক্ষণের ফলে তারা উপলব্ধি করেছেন এক চিরায়ত সত্য। সেটি হলো, সুস্থতা ও নিরাময়ের ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাস, ধর্মীয় আচার পালন ও প্রার্থনার ভূমিকা রয়েছে।

বিজ্ঞানের জগতে সমাদৃত ও জনপ্রিয় পত্রিকা নিউসায়েন্টিস্ট-এ প্রকাশিত 'পার্টিকেলস অব ফেইথ' শীর্ষক একটি নিবন্ধে বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনকারী মানুষেরা তুলনামূলক দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনযাপন করেন। এতে আরো বলা হয়েছে, বিজ্ঞানীরা তাদের গুরু চার্লস ডারউইনের কাছ থেকে সঠিক ইঙ্গিত পেয়েছেন বলেই মনে করেন এবং মূলত এ কারণেই তারা স্রষ্টা বিষয়ক সব ধারণা থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। কিন্তু অবস্থা এখন বদলাতে শুরু করেছে।

সাম্প্রতিককালে পরিচালিত সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে, যারা ধর্ম অনুসরণ করেন না, তাদের চেয়ে যারা ধর্ম অনুসরণ করেন তারা অধিক সুখী এবং তারা বাঁচেনও বেশিদিন। উপরন্তু তাদের দৈহিক ও মানসিক ব্যাধির পরিমাণ কম। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপারটি হলো, দেখা গেছে, যেকোনো ধরনের অপারেশনের পর ধর্ম কিংবা উচ্চতর অস্তিত্বে বিশ্বাসী মানুষেরা তুলনামূলক দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন। যারা ধর্ম অনুসরণ করেন না, তাদের জন্যে এটা দুঃসংবাদ বটে।

আছে আরো সুখবর। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আর প্রভুতে বিলীন হওয়ার সুখানুভূতি ও প্রশান্তি মস্তিষ্কের পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে এন্ডোরফিন নিঃসরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এন্ডোরফিন দেহের একটি প্রাকৃতিক ব্যথানাশক উপাদান, যা ব্যথা নিরাময়ের পাশাপাশি এক ধরনের আনন্দ-অনুভূতির জন্ম দেয় এবং শরীরের ইমিউন সিস্টেম বা রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাকেও করে

তোলে অধিকতর কার্যকর। উল্লেখ্য, এন্ডোরফিন নিঃসরণে শুধু যে ধর্মাচারের ভূমিকা আছে তা নয়; জগিং, সাঁতার আর ব্যায়ামেও এ সুফল পাওয়া যায়। তবে ধর্ম আমাদের দিয়ে থাকে আরো একটু বেশি কিছু–এমন কথা বলছেন খোদ বিজ্ঞানীরাই।

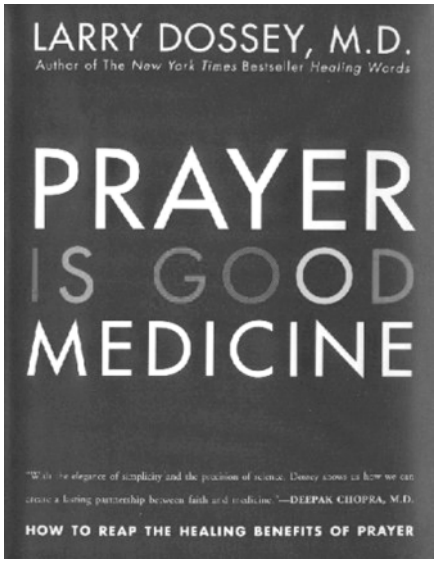

যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী ও আধুনিক ধারার চিকিৎসক ডা. ল্যারি ডসি-র লেখা আলোচিত গ্রন্থ 'প্রেয়ার ইজ গুড মেডিসিন'

শুধু তা-ই নয়, বিশ্বাস আমাদের শরীরে সূচনা করে প্লাসিবো নিরাময় প্রক্রিয়া, যা চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি আধুনিক ও অনন্য সংযোজন। প্লাসিবো নিরাময়ে প্রচলিত ওষুধ ও চিকিৎসাব্যবস্থার পাশাপাশি সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে রোগীর বিশ্বাস ও নিরাময় আকাঙ্ক্ষা। অদম্য বিশ্বাস শরীর-মনে সৃষ্টি করে ইতিবাচক শক্তির প্রাবল্য, যাতে নিরাময় প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে আরো ত্বরান্বিত।

বিজ্ঞানীদের ভাষায়, প্লাসিবো হচ্ছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশ্বাসের জৈবিক প্রভাব। আর এটি যে একটি বাস্তব ও দুর্দান্ত শক্তি–এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা এখন নিশ্চিত। কিন্তু প্রশ্ন হলো, নিরাময়ের ক্ষেত্রে কীভাবে কাজ করে এই প্লাসিবো? মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায়, চোয়াল ব্যথা নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ১৪ জন রোগীকে ব্যথা নিরাময়ের ওষুধ দেয়ার পর তারা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন। কিন্তু তারা জানতেন না যে, ওষুধটি আর কিছুই নয়, ওটা ছিলো কেবল স্যালাইন। অর্থাৎ শুধু স্যালাইন খেয়েই তাদের ব্যথা ভালো হয়ে গেল। কারণ তাদের বিশ্বাস ছিলো যে, নিরাময়ের জন্যে উপযুক্ত ওষুধটিই তারা পাচ্ছেন।

পরবর্তীতে গবেষকরা প্লাসিবো চিকিৎসায় সুস্থ হওয়া সেইসব রোগীদের মস্তিষ্কের পেট-স্ক্যান (PET SCAN) করে দেখেছেন, তাদের মস্তিষ্কে অধিক

পরিমাণ এন্ডোরফিন নিঃসরিত হয়েছে। আর ওষুধের ক্রিয়ায় যারা বিশ্বাস করেছেন এবং যারা সন্দেহ পোষণ করেছেন–এই দুয়ের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। দেখা গেছে, নিরাময় প্রত্যাশীদের ক্ষেত্রে প্লাসিবো ইফেক্ট সৃষ্টি হওয়ায় তাদের মস্তিষ্কে এন্ডোরফিন নিঃসরণের পরিমাণ তুলনামূলক বেশি এবং তাদের ব্যথা নিরাময়ের হারও অন্যদের চেয়ে দ্রুত।

অপেক্ষা করছে আরো বিস্ময়। একাধিক গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিষণ্নতারোধী ওষুধের শতকরা ৮০ ভাগ সুফলই এজন্যে পাওয়া যায় যে, রোগীরা বিশ্বাস করেন এতে কাজ হবে। বিকল্প ওষুধের ক্ষেত্রে এ বিশ্বাসের প্রভাব অনেক বেশি। যেমন, অনেকের মতে আকুপাংচার চিকিৎসায় বিশ্বাসী রোগীর শরীরের যে স্থানেই সুঁই ঢোকানো হোক না কেন, তার মাথাব্যথা ভালো হবেই। অন্যদিকে দেখা গেছে, আকুপাংচারের নিরাময় ক্ষমতা সম্বন্ধে যার কোনোরকম ধারণা বা ন্যূনতম বিশ্বাসটুকুও নেই, আকুপাংচার চিকিৎসায় তার খুব একটা উপকার হয় নি।

দীর্ঘ গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন যে, কোনো চিকিৎসায় কাজ হবে কি না তা নির্ভর করবে চিকিৎসা-গ্রহণকারীর বিশ্বাস ও নিরাময়-প্রত্যাশার ওপর। কারণ, রোগী যে চিকিৎসা গ্রহণ করছেন তাতে কাজ হবে–এমন বিশ্বাস ও নিরাময়ের আকুতি রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে যথাযথভাবে উজ্জীবিত করে, কাজে লাগায়। নিরাময় প্রক্রিয়াকে দারুণভাবে বেগবান করে তোলে। যেমন, ব্যথার রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যথামুক্তির জন্যে রোগী যতটা উন্মুখ হয়েছেন, এন্ডোরফিন নিঃসরণও ততটাই বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাই নিরাময়ের জন্যে প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থার ওষুধ ও ডাক্তারের পাশাপাশি অনুভব করুন স্রষ্টার অফুরন্ত নেয়ামত সুস্থতার গুরুত্ব। সুস্থতার আকুতিতে আচ্ছন্ন হোক আপনার সমগ্র অস্তিত্ব। আর বিশ্বাস করুন–নিরাময়ের অসীম ক্ষমতা দেয়া আছে আপনার মধ্যেই, যা সংরক্ষিত আছে আপনার জেনেটিক কোডের সুবিন্যস্ত তথ্যমালায়। এ বিশ্বাসই আপনার ভেতরে সৃষ্টি করবে প্লাসিবো নিরাময় তরঙ্গ। আপনি অনুভব করবেন নিরাময় ও সুস্থতার এক অভূতপূর্ব অনুরণন। এগিয়ে যাবেন কাঙ্ক্ষিত সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর পথে।

তথ্যসূত্র : ওয়েব-এমডি ডটকম
মাসিক গণস্বাস্থ্য

প্রার্থনায় ওজন কমে

শিরোনাম দেখে অবাক হবেন না। বরং অহোরাত্র কষ্টকর ডায়েটিং না করে খাবার গ্রহণের আগে স্থির হয়ে, কৃতজ্ঞচিত্তে প্রার্থনা করুন। ওজন কমবে। খোদ পাশ্চাত্যে পরিচালিত গবেষণায় পাওয়া গেছে এমন বিস্ময়কর তথ্য।

ইনস্টিটিউট ফর দি সাইকোলজি অব ইটিং-এর প্রতিষ্ঠাতা মার্ক ডেভিড একজন নিউট্রিশনাল সাইকোলজিস্ট বা পুষ্টি মনোবিজ্ঞানী। 'দি স্লো ডায়েট : ইটিং ফর প্লেজার, এনার্জি এন্ড ওয়েট লস' বইতে তিনি বলতে চেয়েছেন, ক্যালরি হিসাব করে ডায়েটিং করার চাইতেও বিশ্বাস ও প্রার্থনা ওজন কমানোর ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

দুই দশকের পেশাগত জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছেন, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের অন্যতম জরুরি বিষয়টি হলো, আমরা 'কীভাবে খাচ্ছি', অথচ প্রচলিত ডায়েটিং চার্টগুলো পূর্ণ মনোযোগটা দেয় কেবল 'কী খাওয়া হচ্ছে' সে বিষয়েই। মার্ক ডেভিড বলেন, কী খাচ্ছি–এটি হলো খাদ্যাভ্যাসের অর্ধেক আর বাকিটা হলো কে কোন খাবারটি কখন খাচ্ছেন?

মার্ক ডেভিড বলেন, আমাদের মানসিক অবস্থা অর্থাৎ টেনশন বা প্রশান্তি, খাদ্য সচেতনতা অর্থাৎ যা খাচ্ছি সেটা সম্পর্কে আমাদের ধারণা এবং আমাদের খাদ্যছন্দ অর্থাৎ আমরা কখন কীভাবে খাই–এ সবকিছুই হজম প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। যেমন, আমরা যখন স্ট্রেস বা মানসিক চাপের শিকার হই তখন আমাদের দেহে চালু হয় ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স নামের একটি দুষ্টচক্র। তখন হার্টবিট ও রক্তচাপ বেড়ে যায়, হাত-পা ও ব্রেনে রক্ত সঞ্চালন দ্রুত হয়। এ সময় ব্রেনের সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম নিয়ন্ত্রণকারী অংশটি হজম প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। এমনকি মানসিক চাপ যখন তুঙ্গে পৌঁছে তখন দেহের হজম প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় আরো বেশি।

গবেষণায় দেখা গেছে, স্ট্রেসের ফলে দেহে কর্টিসোল নামের একটি হরমোন বেশি বেশি তৈরি হয়, যা শরীরকে মুটিয়ে দেয়। কারণ, কর্টিসোল এমন একটি উপাদান, যা খাবার থেকে মাংসপেশি তৈরির বদলে ফ্যাট বা চর্বি তৈরিতেই দেহকে বেশি প্রভাবিত করে। আসলে মানসিক চাপ এমন একটি

ব্যাপার, যা সারাক্ষণ এমনকি খাওয়ার সময়ও আমাদের পিছু ছাড়ে না। আমাদের অজান্তেই হয়তো পারস্পরিক সম্পর্ক, পেশাগত কাজ সংক্রান্ত নানারকম মানসিক জটিলতা ও অশান্তিকে আমরা বয়ে নিয়ে যাই খাওয়ার টেবিলে। আর এখানেই মার্ক ডেভিডের পরামর্শ হলো, খাওয়ার প্রচলিত প্যাটার্নটি বদলে দেয়া। তিনি বলেন, হুড়মুড় করে খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন না, একটু সুস্থির হয়ে বসুন। ১০/১২ বার গভীরভাবে দম নিন। তারপর কৃতজ্ঞচিত্তে প্রার্থনা করে খেতে শুরু করুন। আর এভাবেই দেহে তৈরি হয় রিলাক্সেশন রেসপন্স। তাতে দেহে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের উদ্দীপনা কমে। হজম প্রক্রিয়া ভালো হয়।

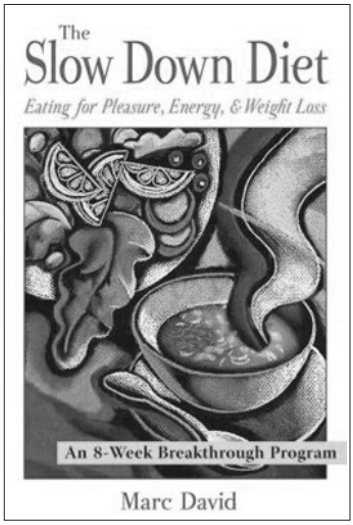

এই রিলাক্সেশন রেসপন্স এক মিনিটেরও কম সময়ে পুরো হজম প্রক্রিয়াকেই বদলে দেয়। খাদ্যের পুষ্টি উপাদানগুলো শরীর সহজেই গ্রহণ করতে থাকে। অন্ত্রে অক্সিজেন ও রক্তসঞ্চালন সুষম হয়। হজম প্রক্রিয়ায় সহায়ক পাচকরস বা এনজাইমগুলোর উৎপাদন ও কর্মক্ষমতা বেড়ে যায়। আর খাদ্যের হজমটা ভালো হওয়ার ফলে অযাচিত ফ্যাট তৈরি হয় না, শরীরও মুটিয়ে যায় না।

আসলে প্রার্থনার সাথে প্রশান্তির সম্পর্কটা খুব নিবিড়। কারণ, প্রার্থনা মানেই হলো সমর্পণ, যা প্রার্থনাকারীকে প্রেরণা যোগায়। দেয় শান্তি ও পরিতৃপ্তি। আর এ মানসিক পরিবর্তনের সাথে সাথে দেহও সাড়া দেয় ইতিবাচকভাবে। মার্ক ডেভিড তার ২০ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, বছরের পর বছর ধরে ওজন কমাতে ব্যর্থ হয়েছেন এমন ব্যক্তিরাও খাদ্যগ্রহণের সময় এভাবে সচেতন হয়ে ওঠার ফলে ওজন কমাতে সমর্থ হয়েছেন এবং হজম সংক্রান্ত জটিলতা থেকে পেয়েছেন মুক্তি ও স্বস্তি।

তাই, আসুন খাবারের আগে প্রার্থনা করি। ওজন কমাই, সুস্থ থাকি।

তথ্যসূত্র : হাফিংটন পোস্ট (২৮ জুলাই ২০১১)
নিউজউইক (২৪ জুন ২০০৫)

ক্যান্সার প্রতিরোধ করুন

'ক্যান্সার' শব্দটি শুনেই এতকাল হাল ছেড়ে দিতেন সবাই। ভাবতেন, ক্যান্সার হলে রক্ষা তো আর নেই-ই, এটি ঠেকানোর কোনো উপায়ও বুঝি নেই। কিন্তু নানা গবেষণা আর একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছে– আছে, ক্যান্সার প্রতিরোধের উপায় আছে বৈকি। সহজ কিছু জীবনাচার অনুসরণ করে ক্যান্সার-ঝুঁকি কমাতে পারেন আপনিও।

ধূমপান আর নয়

ধূমপান শুধু যে ফুসফুসের ক্যান্সারের অন্যতম কারণ তা নয়, এটি খাদ্যনালী স্বরযন্ত্র মুখ-গহ্বর গলা কিডনি মূত্রথলি অগ্ন্যাশয় পাকস্থলী এমনকি জরায়ুমুখের ক্যান্সার-ঝুঁকিও বাড়ায়। আমেরিকান ক্যান্সার-বিশেষজ্ঞ রিচার্ড ডেল ও রিচার্ড পেটোর মতে, মানবদেহে যত ধরনের ক্যান্সার হতে পারে তার ৩০ শতাংশের ক্ষেত্রেই ধূমপান ও তামাকের সরাসরি ভূমিকা রয়েছে।

তাই আর দেরি নয়, ক্যান্সার প্রতিরোধের প্রথম ধাপ হিসেবে আজই ধূমপান ছাড়ুন। কোনো ধরনের তামাকের প্রতি আসক্তি থাকলে আজই বেরিয়ে আসুন এ প্রাণঘাতী অভ্যাস থেকে। কারণ, ধূমপানের মাধ্যমে নিজের শরীরটাকেই শুধু যে বিষময় করে তুলছেন তা নয় বরং আপনার সিগারেটের ধোঁয়া আপনার প্রিয়জন ও পরিবারের সদস্যদের ক্যান্সার-ঝুঁকিও একই হারে বাড়াচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, পরোক্ষ ধূমপান সারা বিশ্বে প্রতিবছর অসংখ্য ক্যান্সারজনিত অকালমৃত্যুর কারণ।

ওজন থাকুক নিয়ন্ত্রণে

মেদস্থূল আছেন যারা, সচেতন হোন এখনই। অতিরিক্ত ওজন নীরবে আপনার খাদ্যনালী গলব্লাডার লিভার অন্ত্র লসিকাগ্রন্থি ও ব্লাড ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে চলেছে। এছাড়াও মেনোপজের পর বাড়তি ও অতিরিক্ত ওজন জরায়ু ও স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, মেদস্থূলতা প্রায়ই দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহ সৃষ্টি করে, যা পরবর্তীতে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়।

চাই স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস

ঠিক কোন ধরনের খাবার ক্যান্সার প্রতিরোধ করে–এর উত্তরে বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন সেই চিরাচরিত সহজ উত্তরটিই। তা হলো, সবরকম ফলমূল ও শাক-সব্জির সমন্বয়ে একটি প্রাকৃতিক খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন। প্রচুর পরিমাণ আঁশ-জাতীয় খাবার থাকুক আপনার প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায়। প্রক্রিয়াজাত শস্যদানার বদলে পূর্ণ শস্যদানা খান।

এড়িয়ে চলুন লাল মাংস (গরু মহিষ খাসি ভেড়া)। প্রক্রিয়াজাত মাংস তো একেবারেই নয়। আর অতিরিক্ত লবণ ও চিনিযুক্ত খাবার থাকুক শত হস্ত দূরে। এমন খাদ্যাভ্যাস ক্যান্সার প্রতিরোধে রাখবে নিশ্চিত ভূমিকা।

রান্না করুন অল্প আঁচে

সবসময় কম আঁচে খাবার রান্না করুন। কারণ, উচ্চ আমিষযুক্ত খাবার যেমন, মাছ মাংস ইত্যাদি অতিরিক্ত তাপে রান্না করলে খাবারে দুটি রাসায়নিক উপাদান (এইচসিএ ও পিএএইচ) সৃষ্টি হয় এবং মনে করা হচ্ছে যে, এগুলো ক্যান্সারের কারণ। গবেষকরা বলেন, এর পাশাপাশি যারা অতিরিক্ত ভাজা-পোড়া ও বার-বি-কিউ করা মাংস এবং এ জাতীয় খাবারে অভ্যস্ত তারা অগ্ন্যাশয়, কোলোরেক্টাল ও প্রোস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকিতে থাকেন।

এলকোহল সমাধান নয়

পরিমিত এলকোহল হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়–এ আশায় (নাকি অজুহাতে?) অনেকেই দিব্যি এলকোহল পান চালিয়ে যান বটে; কিন্তু চিকিৎসকদের বক্তব্যটা এবার তাদের প্রতি সরাসরিই–'সঠিক জীবনযাপন পদ্ধতি ও সুস্থ খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করেই যখন আপনি হৃদরোগের ঝুঁকিমুক্ত থাকতে পারেন, এলকোহলের কোনো প্রয়োজন সেখানে আদৌ নেই।' উপরন্তু, এলকোহল খাদ্যনালী মুখগহ্বর গলা স্বরযন্ত্র লিভার ও স্তন ক্যান্সার এবং উচ্চ কোলেস্টেরলের ঝুঁকি বাড়ায়।

ব্যায়াম হোক নিত্যদিনের করণীয়

ব্যায়াম ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। কারণ, যারা নিয়মিত ব্যায়াম করেন–দেখা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা সুস্থ জীবনাচারী। এছাড়াও নিয়মিত ব্যায়ামে শরীরের হরমোন প্রবাহ, কোষবৃদ্ধির হার, ইনসুলিন সংবেদনশীলতা থাকে স্বাভাবিক। সেইসাথে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে সংহত ও অটুট।

শুধু তা-ই নয়, ক্যান্সার রোগীদের বিশেষত অন্ত্রের ক্যান্সারে ভুগছেন যারা, নিয়মিত ব্যায়ামে তাদের নিরাময় প্রক্রিয়া ও ভালো থাকার হারও তুলনামূলক সন্তোষজনক বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। এছাড়াও স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ব্যায়ামের ভূমিকা নিয়ে যতগুলো গবেষণা পরিচালিত হয়েছে তার প্রায় সবকটিতেই ইতিবাচক ফল পাওয়া গেছে। ফুসফুস, প্রোস্টেট ও জরায়ুর ক্যান্সার প্রতিরোধের বেলায়ও এটি সত্য।

তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবমুক্ত থাকুন, যতটা সম্ভব

দেহাভ্যন্তরে কোনো টিউমার সন্দেহে কিংবা অন্যান্য রোগের বেলায়ও এখন ব্যাপকভাবে করা হচ্ছে সিটি স্ক্যান। কিন্তু চিকিৎসক ও রোগী–সবারই জানা জরুরি যে, একবার সিটি স্ক্যান করতে গিয়েই আপনাকে বেশ ভালোরকম তেজস্ক্রিয়তার সম্মুখীন হতে হয়, যা আপনার ক্যান্সার-ঝুঁকি বাড়ায়। গবেষকরা বলেন, রোগ নির্ণয়ের জন্যে সম্ভব হলে তেজস্ক্রিয়তামুক্ত পদ্ধতি যেমন : আল্ট্রাসনোগ্রাম, এমআরআই এসব পদ্ধতি বেছে নেয়াই নিরাপদ। পারতপক্ষে এড়িয়ে চলুন সিটি স্ক্যানের মতো পদ্ধতিগুলো। আর যদি তা করতেই হয়, তবে এর সম্ভাব্য ক্ষতির চেয়ে লাভের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে তারপর করুন।

আর, আপনার সেলফোনটিও কিন্তু আপনার মধ্যে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব বাড়ায়। অতএব, এক্ষেত্রে আপনার নিজস্ব সচেতনতা জরুরি।

তথ্যসূত্র : হেলথ এন্ড নিউট্রিশন

নার্ভ সেলের পুনর্জন্ম ॥ চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিস্ময়

Where mind goes, energy flows. মনের শক্তি সর্বত্রগামী। মনের শক্তি দিয়ে সম্ভব হয়েছে অসাধ্য সাধন, এমন উদাহরণ অসংখ্য। এমনকি দুরারোগ্য ব্যাধিও মনের শক্তি দিয়ে সারানো সম্ভব। চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতি এ সত্যকে দিন দিন আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

এতদিন একটি প্রচলিত ধারণা ছিলো, কোনো কারণে যদি নার্ভ টিস্যু, হৃৎপিণ্ডের টিস্যু ও স্কেলিটাল মাসল টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে তা আর রিজেনারেট করে না বা নতুন করে জন্মাতে পারে না। অনেকদিন থেকেই বিজ্ঞানীরা এটিকে সত্য বলে জেনে এসেছেন, বিশ্বাস করেছেন। সম্প্রতি এটি ভুল প্রমাণিত হতে শুরু করেছে।

প্রথমত, ক্যালিফোর্নিয়ার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. ডিন অরনিশ প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, নিয়মিত মেডিটেশন, যোগ ব্যায়াম, স্বল্প চর্বিজাত খাবার হৃদরোগ প্রতিরোধ করতে পারে তো বটেই, এমনকি হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পরও একজন মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানের জগতে বহুল-সমাদৃত সাময়িকী 'নিউসায়েন্টিস্ট'-এ প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, সুইডেনের ক্যারোলিন্স্কা হাসপাতালের একটি ঘটনা চিকিৎসক-মহলে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে। যাতে প্রমাণিত হয়েছে, নার্ভ টিস্যু পুনরায় তৈরি হতে পারে।

২৫ বছরের এক দুরন্ত তরুণ থমাস ওয়েস্টবার্গ। মোটর-সাইকেল দুর্ঘটনার পর ক্যারোলিন্স্কা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলো সে। তার আঘাতটা ছিলো বেশ গুরুতর। ঘাড়ের কাছে বামদিকের শোল্ডার-ব্লেডটি ভেঙে যায় এবং মেরুদণ্ডের স্পাইনাল কর্ড থেকে বের হওয়া চারটি স্পাইনাল নার্ভ ছিঁড়ে যায়। ফলে তার শরীরের বাম দিক পুরোপুরি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আক্রান্ত হয় ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস (বাহুর কাছাকাছি অবস্থিত একটি স্নায়ুগুচ্ছ)। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এ ধরনের প্যারালাইসিস রীতিমতো দুরারোগ্য ও চিরস্থায়ী।

ক্যারোলিন্স্কা হাসপাতালের নিউরোসার্জন ডা. থমাস কার্লসডেট দুর্ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যেই ওয়েস্টবার্গের অপারেশন করেন। তিনি ছিঁড়ে যাওয়া চারটি নার্ভের মধ্যে দুটিকে জোড়া লাগাতে সক্ষম হন, যার একটি জোড়া লাগানোর জন্যে আবার পায়ের একটি নার্ভ কেটে এনে নার্ভ গ্রাফটিং করা হয়। সার্জন সম্ভাব্য সব চিকিৎসা করেছিলেন বটে, কিন্তু ওয়েস্টবার্গ যে কখনো তার বাম হাতের বোধশক্তি ফিরে পাবে, আগের মতো সবকিছু করতে পারবে, এতটা তারা আশা করেন নি। অবশ্য এক্ষেত্রে তেমনটা আশা না করাটাই ছিলো তখন স্বাভাবিক।

বিস্ময়কর ব্যাপারটি ঘটে অপারেশনের কদিন পরেই। দেখা যায়, পুনরায় জোড়া লাগানো দুটি নার্ভের একটি নিউরোন সেল-বডি অর্থাৎ স্নায়ুর মূল অংশ থেকে বাহুর মাংসপেশির দিকে নতুন এক্সন তৈরি হতে শুরু করেছে। উল্লেখ্য, এক্সন হলো নিউরোনের এমন একটি অংশ, যা একটি নিউরোন থেকে আরেকটি নিউরোনে প্রয়োজনীয় তথ্য পৌঁছে দেয়। ওয়েস্টবার্গের ক্ষেত্রে এই এক্সন প্রতিদিন প্রায় এক মিলিমিটার করে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং স্পাইনাল কর্ড থেকে মাংসপেশি পর্যন্ত পৌঁছতে বেশ কয়েক মাস পর্যন্ত লেগে যায়।

অপারেশনের নয় মাস পর ওয়েস্টবার্গ প্রথম তার মাংসপেশিতে অনুভূতি বুঝতে পারে। তার পেশি সংকুচিত করার শক্তি ফিরে পায়। একপর্যায়ে দেখা গেল, বাম হাত দিয়ে সে এক কেজি পর্যন্ত ওজন তুলতে পারে। এবং তার হাতের স্বাভাবিক নড়াচড়ার শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ পুনরুদ্ধার হয়।

বিজ্ঞানী মহলে এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অনেকেই এই ঘটনায় তাদের উচ্ছ্বসিত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন। তাদের মধ্যে লন্ডন রয়েল হাসপাতালের অর্থোপেডিক সার্জন ডা. রুল্ফ বার্ক একে একটি যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

এদিকে ডা. কার্লসডেট ছয়টি বানরের একই অপারেশন করেন যাদের প্রত্যেকটিই স্পাইনাল কর্ডে একই ধরনের আঘাতপ্রাপ্ত ছিলো। এর মধ্যে তিনটি বানর তাদের অক্ষম বাহু পুনরায় ব্যবহার করার শক্তি ফিরে পায়। পরবর্তীতে বানরগুলোর পোস্টমর্টেম পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, নিউরোনের সেল-বডি থেকে মাংসপেশির দিকে নতুন এক্সন তৈরি হয়েছিলো।

তথ্যসূত্র : নিউসায়েন্টিস্ট

মেডিটেশন ও সুস্থ জীবনচর্চা ॥ জিনগত পরিবর্তনের সূচনা করে

জিনবিজ্ঞানে আশার আলো

আপনার জেনেটিক কোডে যে তথ্য দেয়া আছে, বছরের পর বছর ধরে আপনি ঠিক তেমনই থাকবেন–এমনটি ভাবা কিংবা অবধারিতভাবে মেনে নেয়ার দিন বোধহয় শেষ হতে চললো। জিনবিজ্ঞানীরা সম্প্রতি জেনেটিক কোড, জিনের কর্মপদ্ধতি এবং মানুষের আচরণের ওপর জিনের প্রভাব নিয়ে সুদীর্ঘ গবেষণার পর এমন ধারণাই আমাদের দিচ্ছেন।

ডারউইন-এর তত্ত্ব অনুসারে, বিবর্তন ঘটতে বা মানুষের জেনেটিক কোডে কোনো পরিবর্তন আসতে কয়েক প্রজন্ম সময় লাগে। কখনো কখনো তা কয়েক লক্ষ বছর পর্যন্ত। কিন্তু উচ্চতর জিনবিজ্ঞানের (এপিজেনেটিক্স) দীর্ঘ গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা বলছেন, কোনো শক্তিশালী পারিপার্শ্বিক নিয়ামকের মাধ্যমে জিনকে এমনভাবে প্রভাবিত করা যায় যে, মাত্র এক প্রজন্মেই জিনগত পরিবর্তন সম্ভব। তাই উচ্চতর জিনবিজ্ঞানকে ডারউইন মতবাদের বিরুদ্ধে মনে করা হচ্ছে একটি ট্রাম্প কার্ড। জিনবিজ্ঞানীদের ভাষায়, জিন নিয়ে গবেষণা শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হলো এপিজেনেটিক্স বা উচ্চতর জিনবিজ্ঞান।

১৯৮০ সাল থেকে শুরু করে গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে উচ্চতর জিনবিজ্ঞান বিষয়টি ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে। এটি হলো জেনেটিক কোড অক্ষুণ্ন রেখেই জিনের কার্যকারিতা পরিবর্তনের একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে জিনের চেয়ে সূক্ষ্মতর অস্তিত্ব এপিজেনোম (যা নিয়ে এই উচ্চতর জিনবিজ্ঞান বা এপিজেনেটিক্স) জিনকে প্রভাবিত করে, নিয়ন্ত্রণ করে জিনের কাজ। অর্থাৎ জিন (Gene) প্রভাবিত হয় এপিজেনোম-এর (Epigenome) মাধ্যমে। আর এপিজেনোম প্রভাবিত হয় আমাদের খাদ্যাভ্যাস, মানসিক অবস্থার ধরন ও গর্ভকালীন পুষ্টি দ্বারা–বলছেন গবেষকরা। এ থেকে

বিজ্ঞানীদের ধারণা হলো, জিন হলো হার্ডওয়্যার আর এপিজেনোম হচ্ছে সফটওয়্যার। অর্থাৎ এপিজেনোম-এর মাধ্যমে জিনকে প্রভাবিত করে যেভাবে ইচ্ছে কাজ করানো সম্ভব। আবার এই এপিজেনোম প্রভাবিত হয় মূলত জীবনযাপনের ধরন ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দ্বারা। গবেষকদের মতে, এই পরিবর্তন স্থায়ী।

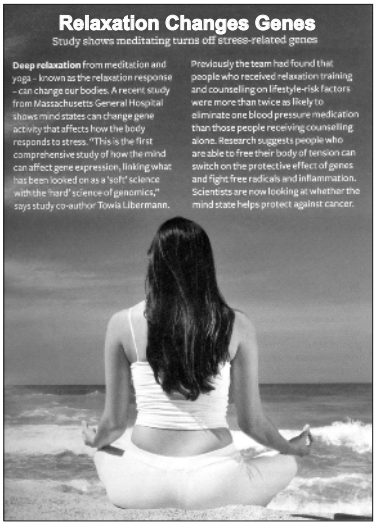

রিডার্স ডাইজেস্ট-এ (জানুয়ারি ২০১০) প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদন : Relaxation Changes Genes

এপিজেনোম ॥ খুলছে রহস্যের জট

মানব শরীরে কোষ বিভাজনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটি (১টি থেকে ২টি, ২টি থেকে ৪টি, ...) এপিজেনোমের নির্দেশ অনুসারেই পরিচালিত হয়। আর দেহকোষগুলো কীভাবে কাজ করবে তা-ও নির্ধারণ করে দেয় সেই কোষের এপিজেনোম। শরীরে মোট ২১০ ধরনের কোষ রয়েছে। জিনবিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত মোটে দু-ধরনের কোষের এপিজেনোমের মানচিত্র আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছেন। প্রচলিত জিনবিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় এমন রহস্যময় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো বিজ্ঞানীরা এখন ব্যাখ্যা করছেন উচ্চতর জিনবিজ্ঞানের মাধ্যমে। যেমন, যমজদের মধ্যে একজন সুস্থ থাকলে অন্যজন কেন মানসিক রোগ কিংবা এজমায় আক্রান্ত হয়। এছাড়াও অটিজম কেন মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের বেশি হয় কিংবা খাদ্যাভ্যাস কীভাবে দীর্ঘায়ুকে প্রভাবিত করে।

উচ্চতর জিনবিজ্ঞানের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা যে উল্লেখযোগ্য তথ্যগুলো পেয়েছেন, সেগুলো হলো–গর্ভাবস্থায় মায়ের টেনশন শিশুর পরিণত বয়সে এজমার কারণ হতে পারে। গর্ভাবস্থায় মায়ের যেকোনো আচরণগত প্রভাব কেবল সন্তান গর্ভে থাকা পর্যন্তই নয়, পরিণত বয়সেও বাচ্চার ওপর এর প্রভাব রয়েছে। গর্ভকালীন সময়ে মায়ের পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাব পরবর্তীতে বাচ্চার হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। আমাদের পছন্দ-অপছন্দ ও চিন্তার

টাইম ম্যাগাজিনের (৬ জুন ২০১০) বিশেষ প্রচ্ছদ প্রতিবেদন :
Why Your DNA isn't Your Destiny

গতিপ্রকৃতি প্রভাবিত করে আমাদের স্মৃতিকে। অতিভোজনে অভ্যস্ত যারা, তাদের পরবর্তী দুই প্রজন্মের আয়ু কমে যেতে পারে আশঙ্কাজনকহারে– গড়ে কমপক্ষে ছয় বছর, কখনো কখনো তা ৩২ বছর পর্যন্ত হতে পারে।

মেডিটেশন ও সুস্থ জীবনচর্চা ॥ আপনার জিন-এ ঘটাবে ইতিবাচক পরিবর্তন

মেডিটেশনে সৃষ্ট গভীর শিথিলায়ন আমাদের মনোদৈহিক অস্তিত্বের অতলান্তে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করে। সদ্য প্রকাশিত (সেপ্টেম্বর ২০১৩) একটি গবেষণা-প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও স্পেনের একদল মনোবিজ্ঞানী বলেছেন, মেডিটেশনে মানসিক স্থিরতা ও প্রশান্তি অর্জনের পাশাপাশি আমাদের জিনগত অভিব্যক্তিতে-ও ঘটে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন।

তাদের মতে, মেডিটেশন মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধির জন্যে দায়ী জিনগুলোকে স্তিমিত করে রাখতে পারে। এ গবেষণা-কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেন বার্সেলোনা-র ইনস্টিটিউট অব বায়োমেডিকেল রিসার্চ-এর গবেষক ড. পার্লা ক্যালিমান। তিনি বলেন, মেডিটেশনের প্রভাবে কয়েকটি নির্দিষ্ট জিন-এ আমরা কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। এ ধরনের পরিবর্তনের লক্ষ্যে আগে মানসিক উত্তেজনা প্রশমনকারী ওষুধ ব্যবহার করা হতো কিন্তু আমরা এখন আশা করছি, মেডিটেশনের মাধ্যমেই এর দীর্ঘস্থায়ী সমাধান সম্ভব।

এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্স হাসপাতালে পরিচালিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার পর জিনবিজ্ঞানীরা বলছেন, দিনের পর দিন ক্রমাগত স্ট্রেসের ফলে মানুষের জিন-এ কিছু অযাচিত প্রতিক্রিয়া ঘটে, মেডিটেশন ও শিথিলায়ন দেহ-মনকে স্ট্রেসমুক্ত করার পাশাপাশি সেই জিনগত ক্ষতিটি-ও পূরণ করতে সক্ষম। বিজ্ঞানীরা মনোদৈহিক এ পরিবর্তনকে অভিহিত করেছেন 'রিলাক্সেশন রেসপন্স' নামে।

এ গবেষণাটির ফলাফল নিয়ে বিজ্ঞানীদের মন্তব্য হলো, জিনবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার সমন্বয়ে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা। যাতে দেখা যায়, যারা নিয়মিত শিথিলায়ন করেন ও সুস্থ জীবন-অভ্যাস চর্চা করেন তাদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের হার কম। আর যারা উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ খান তাদের ক্ষেত্রেও ওষুধের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে। গবেষকদের মতে, জিনের ওপর শিথিলায়নের প্রভাব এতটাই যে, যারা মেডিটেশনের মাধ্যমে দেহ-মনে টেনশনমুক্ত শিথিল অবস্থা সৃষ্টি করেন তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমশ উজ্জীবিত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাই জিনবিজ্ঞানীরা এখন একে ক্যান্সার-জয়ের অন্যতম উপায় হিসেবেও ভাবতে শুরু করেছেন।

আবার ক্ষতিকর জীবনধারা যেমন : ধূমপান, অতিভোজন ইত্যাদি এপিজেনোমকে প্রভাবিত করে, যা মেদস্থূলতার জন্যে দায়ী জিনগুলোকে উস্কে দেয় ও দীর্ঘায়ু সৃষ্টিকারী জিনগুলোকে করে তোলে দুর্বল। আর অন্যদিকে এপিজেনোম-এর মাধ্যমে জিনকে প্রভাবিত করে ক্যান্সার, সিজোফ্রেনিয়া, অটিজম, আলঝেইমার্স, ডায়াবেটিসসহ অনেক দুরারোগ্য রোগ প্রতিরোধ সম্ভব বলে বিজ্ঞানীরা গবেষণায় প্রমাণ পেয়েছেন।

২০০৯-এর ফেব্রুয়ারিতে জার্নাল অব নিউরোসায়েন্স-এ প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে বলা হয়, উচ্চতর জিনবিজ্ঞানের মাধ্যমে মস্তিষ্কের মতো জটিল অঙ্গকেও প্রভাবিত করা যায়। ইতিবাচক পরিবেশ, ব্যায়াম, বাড়তি মনোযোগ (মেডিটেশন) ও সচেতনতার মাধ্যমে এটি সম্ভব। একে কাজে লাগিয়ে স্মৃতিদৌর্বল্যে আক্রান্ত মানুষকেও করে তোলা যাবে প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। বিষয়গুলো জানার পর বিজ্ঞানীমহল এখন রীতিমতো শিহরিত (Nervously Excited) বোধ করছেন।

তথ্যসূত্র : টাইম ম্যাগাজিন (৬ জুন ২০১০)
রিডার্স ডাইজেস্ট (জানুয়ারি ২০১০)
হাফিংটন পোস্ট (১২ সেপ্টেম্বর ২০১৩)

নেতিবাচকতার বৃত্ত ভাঙতে চাই মেডিটেশন ও আনন্দ-অনুরণন

আপনি কি খুব বেশি আবেগকাতর, নেতিবাচক আবেগগুলো কি খুব বেশি ভোগায় আপনাকে? বৈচিত্র্যময় মানব-মনের এমনি নানা অনুভূতির সাথে মস্তিষ্কের সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করেছেন নিউরোসায়েন্টিস্টরা। তারা জানাচ্ছেন, এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারেন আপনি নিজেই।

মানুষ যত, বিচিত্র তত আবেগ

প্রতিটি ঘটনার প্রেক্ষিতে মানুষ হিসেবে আমরা কিছু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি, সাধারণভাবে যা ব্যক্তি ও পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রকম। যেমন, চাকরি হারানো বা বিয়ে-বিচ্ছেদের মতো ঘটনায় একজন হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করে, কিন্তু একই ধরনের ঘটনায় আরেকজন বছরের পর বছর আত্মধিক্কার আর হতাশায় কর্মবিমুখ দিন কাটায়।

কেন এমনটা হয়? বিজ্ঞানীরা বলছেন, একেকজন মানুষের আবেগীয় চরিত্র ও আবেগের ধরন একেকরকম, তাই একই ঘটনায় একেকজন মানুষের প্রতিক্রিয়াও হয় ভিন্ন। প্রত্যেকের চেহারা ও আঙুলের ছাপ যেমন আলাদা, মানুষ ভেদে আবেগের প্রতিক্রিয়াও তেমনি ভিন্ন। শুনে মনে হতে পারে, এ আর এমন কী? এ তো নতুন কিছু নয়।

চিন্তা ও আবেগ : দুই ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা?

নিউরো-ইমেজিং গবেষণায় দেখা গেছে, একজন মানুষের আবেগের প্রকাশ ও ধরনের সাথে তার মস্তিষ্কের কাঠামো ও কর্মপ্রক্রিয়ার সম্পর্ক রয়েছে। বিজ্ঞান এতকাল মনে করতো, মানুষের চিন্তা ও আবেগ–এ দুটো ভিন্ন মেরুর ব্যাপার, যার একটার সাথে আরেকটার কোনো সম্পর্ক নেই এবং চিন্তা হলো একটা উচ্চস্তরের ব্যাপার আর আবেগ হলো নিম্নস্তরের ও পাশবিক কিছু একটা।

নিউরোসায়েন্স বলে, মানুষের চিন্তা ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের ভিন্ন দুটো অংশ। চিন্তা নিয়ন্ত্রিত হয় মস্তিষ্কের সামনের দিকে অবস্থিত ফ্রন্টাল কর্টেক্স থেকে, যা চিন্তাশক্তির পাশাপাশি মনোযোগ, কার্যকারণ ও বিচারবুদ্ধির ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। উল্লেখ্য, অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানব-মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল কর্টেক্স বেশ আলাদা এবং উন্নততর।

আর আবেগের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কে তুলনামূলক ভেতরের দিকে অবস্থিত লিম্বিক সিস্টেম (এমিগডালা ও হিপোক্যাম্পাস নিয়ে গঠিত), যা মানুষের রাগ ক্ষোভ দুঃখ দুশ্চিন্তা ভয়ের অনুভূতির সাথেও সম্পর্কযুক্ত। মজার ব্যাপার হলো, কাঠামোগত দিক থেকে মানুষের লিম্বিক সিস্টেম অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় খুব বেশি আলাদা নয়।

আবেগের ধরন বদলে দিতে পারেন আপনি নিজেই

এতদিন বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিলো, মানুষের আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের লিম্বিক সিস্টেমের ভূমিকাই আসল, ফ্রন্টাল কর্টেক্সের কোনো ভূমিকা এখানে নেই এবং কাজের দিক থেকেও মস্তিষ্কের এ দুই অংশ পরস্পর সম্পর্কহীন। কিন্তু নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিউরোসায়েন্টিস্টদের সাম্প্রতিক অভিমত হলো, আবেগ নিয়ন্ত্রণের বেলায় বেশ ভালোভাবেই আছে মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল কর্টেক্সের ভূমিকা। শুধু তা-ই নয়, একাধিক গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন, আবেগের ধরন আপনার যা-ই হোক না কেন, একে আপনি পাল্টাতে পারেন। চাই শুধু কিছু অনুশীলন। এ ধারণাকে একটি যুগান্তকারী তত্ত্ব হিসেবে উল্লেখ করেছেন বিজ্ঞানীরা।

নিউরোনে নিউরোনে সহযোগ

আবেগের বিভিন্ন ধরন ও প্রতিক্রিয়ার সাথে মানব-মস্তিষ্কের কোন অংশের কী সম্পর্ক, তা নিয়ে অসংখ্য গবেষণা করেছেন নিউরোসায়েন্টিস্টরা। তারই একটিতে একদল স্বেচ্ছাসেবককে বিভিন্ন ধরনের কিছু স্নায়ু-উদ্দীপক আর বিষাদপূর্ণ ছবি ও ভিডিও দেখানো হয়। এরপর তাদের আবেগীয় প্রতিক্রিয়াগুলোকে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

অবাক হয়ে গবেষকরা লক্ষ করলেন, দুঃখপূর্ণ ও নেতিবাচক আবেগ থেকে একজন মানুষ কত দ্রুত পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে তার সাথে মস্তিষ্কের লিম্বিক সিস্টেমের কোনো সম্পর্ক নেই, বরং এটি মূলত নির্ভর করে প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্সের কার্যকারিতা এবং প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স ও

লিম্বিক সিস্টেমের মধ্যবর্তী নিউরোনগুলোর সুদৃঢ় যোগাযোগ অর্থাৎ সংযোগায়নের ওপর।

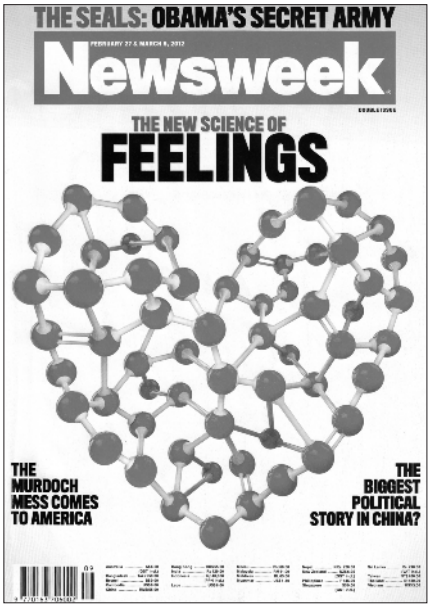

গবেষকদের মতে, যত মজবুত হবে এ সংযোগায়ন, আবেগের যেকোনো অবস্থা থেকে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সম্ভাবনাও তত বেশি। কারণ, আমাদের চিন্তা নিয়ন্ত্রণকারী অংশ প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স প্রভাবিত করে আমাদের আবেগ-অনুভূতি নিয়ন্ত্রণকারী অংশ লিম্বিক সিস্টেমের এমিগডালা-কে। আর এ দুয়ের মধ্যবর্তী নিউরোনগুলোর মধ্য দিয়ে প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স থেকে এমিগডালা-তে এমন কিছু বার্তা পৌঁছায়, যা লিম্বিক সিস্টেমের উদ্দীপনাকে স্তিমিত করে এবং যেকোনো নেতিবাচক আবেগ থেকে আমরা দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারি। আর এজন্যে চাই এ দুয়ের মধ্যবর্তী নিউরোনগুলোর পারস্পরিক সুদৃঢ় সংযোগায়ন।

নিউরোপ্লাস্টিসিটি ॥ নিউরোসায়েন্সের নতুন সম্ভাবনা

এখন প্রশ্ন হলো, নির্দিষ্ট একটি বয়স পেরিয়ে গেলে মস্তিষ্কে নতুন নতুন সংযোগ-সম্ভাবনা বা সংযোগায়ন বাড়ানোর কোনো উপায় আছে কি না। বিজ্ঞানীরা শোনাচ্ছেন আশার কথা। তারা বলছেন, উপায় আছে বৈকি। তা হলো, মস্তিষ্কের নিউরোনগুলোর একটি অনন্য ও চমৎকার গুণ আছে, যার নাম নিউরোপ্লাস্টিসিটি। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় উদ্দীপনা পেলে জীবনের যেকোনো সময়েই মস্তিষ্ক নিজের গঠন ও কর্মপ্রক্রিয়া বদলে নিতে পারে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, মস্তিষ্কে এ উদ্দীপনা যোগানোর অন্যতম উপায় হলো মেডিটেশন বা নিমগ্ন কল্পনা ও মনোযোগ। একটি গবেষণায় দেখা গেছে,

যারা একাগ্র মনোযোগে খুব ভালো ভায়োলিন বাজায়, তাদের মস্তিষ্কের যে অংশটি তা নিয়ন্ত্রণ করে সেই অংশের আকার বেড়ে গেছে এবং সেইসাথে এর কার্যকারিতায় এসেছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন।

শুধুমাত্র চিন্তাই বদলে দিতে পারে বাস্তবতা

শুধু এমন বাহ্যিক উদ্দীপনাতেই নয়; বিজ্ঞানীদের মতে, আমাদের চিন্তা কল্পনা ইচ্ছাও মস্তিষ্কে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে। চিন্তা ও কল্পনা কীভাবে নিউরোনের মৌলিক গঠন ও কর্মকাঠামোকে প্রভাবিত করতে পারে তা বোঝা যায় চমৎকার একটি গবেষণায়।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী আলভারো পাসকুয়েল লিয়ন। তিনি একটি ভিন্নধর্মী গবেষণা-কার্যক্রম পরিচালনা করেন, যেখানে একদল স্বেচ্ছাসেবক নিয়মিত গভীর মনোযোগে কল্পনা করতেন যে, ডান হাতের পাঁচটি আঙুল দিয়ে তারা কি-বোর্ড বাজাচ্ছেন। ক্রমাগত এক সপ্তাহ চললো এ কাল্পনিক কি-বোর্ড বাদন। এক সপ্তাহ পর দেখা গেল অদ্ভুত ব্যাপার। নিউরো-ইমেজিং পরীক্ষায় প্রমাণিত হলো, মস্তিষ্কের যে অংশটি ডান হাতের আঙুলের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে সে অংশটির প্রসারণ ঘটেছে। অর্থাৎ চিন্তা, শুধুমাত্র চিন্তাই মস্তিষ্কে এমন গঠনগত পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে।

নিউরোসায়েন্টিস্টরা এখনো বলতে পারছেন না যে, মস্তিষ্কের নিউরোপ্লাস্টিসিটি বা গঠনগত পরিবর্তনের এই সম্ভাবনা কী পরিমাণ। কিন্তু তারা এটা বলছেন–মেডিটেশন, চিন্তাশক্তির অনুশীলন, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, পর্যাপ্ত মনোযোগ ও আনন্দ-অনুরণন চর্চার (Well-being therapy) মাধ্যমে বেশ ভালোভাবেই সম্ভব আমাদের আবেগের ধরনকে কাঙ্ক্ষিত উপায়ে পরিবর্তন করা। অযাচিত বিষাদ বিষণ্নতা হতাশা দুঃখ-বিলাসিতার মতো নেতিবাচকতার বৃত্ত থেকে মুক্তির উপায়ও এটাই বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

তথ্যসূত্র : নিউজউইক (২৭ ফেব্রুয়ারি ও ৫ মার্চ, ২০১২)

মেডিটেশন ও ইতিবাচক চিন্তায় প্রভাবিত হয় আপনার অনাগত সন্তান

প্রশান্তিময় সুখী সুন্দর জীবনযাপনের জন্যে মেডিটেশন ও ইতিবাচক চিন্তার কার্যকারিতা এখন সচেতন মানুষ মাত্রই জানেন। সাম্প্রতিককালে এর কার্যকারিতার প্রমাণ মিলেছে মাতৃগর্ভে থাকা অনাগত সন্তানের ক্ষেত্রেও। একাধিক গবেষণায় গর্ভস্থ শিশুর ওপর মায়ের চিন্তা-চেতনা, ধ্যানধারণা, ইতিবাচকতা ও মেডিটেশনের প্রভাব খুঁজে পেয়েছেন চিকিৎসাবজ্ঞানীরা।

গবেষকরা বলেন, গর্ভাবস্থায় মায়ের চিন্তা আবেগ অনুভূতি তার অনাগত সন্তানের বিকাশকে সরাসরি প্রভাবিত করে। শতাধিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বিভিন্ন ধরনের আবেগের প্রভাবে মায়ের শরীর থেকে নিঃসৃত হরমোন ও নিউরোট্রান্সমিটার গর্ভস্থ শিশুর শরীরে প্রবেশ করে এবং শিশুকে সরাসরি প্রভাবিত করে। মায়ের যেকোনো আনন্দে নিঃসৃত এন্ডোরফিন, সেরোটনিন, অক্সিটোসিন ইত্যাদি আনন্দবর্ধক রাসায়নিক উপাদান গর্ভস্থ শিশুকেও উৎফুল্ল করে তোলে সমানভাবে। এর পাশাপাশি যেসব মা এ সময় নিয়মিত মেডিটেশন করেন তাদের গর্ভস্থ সন্তানের হার্টবিটসহ পুরো কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেম স্বাভাবিকভাবে কাজ করে।

অন্যদিকে, মায়ের স্ট্রেস দুশ্চিন্তা হতাশা ইত্যাদি নেতিবাচক আবেগ শিশুর শারীরিক-মানসিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, গর্ভাবস্থায় যেসব মা খুব বেশি স্ট্রেস-আক্রান্ত ছিলেন পরবর্তীতে তারা অস্থিরমতি, অপরিণত ও স্বল্প ওজনধারী সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। কারণ, মায়ের নেতিবাচক আবেগ ও স্ট্রেসের প্রভাবে নিঃসৃত কর্টিসোল হরমোন গর্ভস্থ শিশুকেও মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়।

তাই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ–এ সময় অযাচিত মানসিক চাপ সামলাতে এবং আনন্দবর্ধক এন্ডোরফিনের প্রবাহ স্বাভাবিক রাখতে মায়েদের প্রশান্ত ও চাপমুক্ত জীবনযাপন করা চাই, যা খুব সহজেই সম্ভব মেডিটেশন ও ইতিবাচক জীবনচর্চার মধ্য দিয়ে। এতে শিশুর নার্ভাস সিস্টেম ও রোগ

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চমৎকারভাবে গড়ে উঠবে। এজন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলো ইতিবাচক মনছবি– মায়েরা তাদের চিন্তায় আর কল্পনায় বার বার অবলোকন করবেন একটি সুস্থ সুন্দর ও প্রাণোচ্ছল শিশু।

বিষয়টি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক ব্যাপক আকারের একটি গবেষণা পরিচালনা করেন, যেখানে ১৯৭৩ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত টানা ২২ বছর ধরে ১.৩৮ মিলিয়ন শিশুর ওপর তাদের মায়ের চিন্তা, কথা ও মানসিক অবস্থার প্রভাব লক্ষ করা হয়। গবেষকদলের মতে, মায়ের সব ধরনের চিন্তার প্রভাবই রয়েছে তার গর্ভস্থ শিশুর ওপর, তাই এ সময় পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি যেমনই হোক, গর্ভধারী মায়েদের উচিত সচেতনভাবেই ইতিবাচক চিন্তাভাবনা ও জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করা। তাদের অনাগত সন্তানের সুষম মনোদৈহিক বিকাশের সম্ভাবনা তাতে বাড়ে।

গবেষকরা বলছেন, গর্ভকালীন সময়ে মেডিটেশন, গভীর শিথিলায়ন, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি শেষপর্যন্ত গর্ভস্থ শিশুর প্রতি মায়ের যথাযথ মনোযোগ দেয়ার বিষয়টিকেই সুনিশ্চিত করে। আর এর ফলে মায়ের সাথে সন্তানের আত্মিক যোগাযাগের ভিত্তিটাও হয় সুদৃঢ়।

এ প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী ও জিনতত্ত্ববিদ ড. ব্রুস লিপটন তার আলোচিত 'বায়োলজি অব বিলিফ' বইটিতে লিখেছেন, গর্ভস্থ শিশুর সুস্থ সুন্দর বিকাশের জন্যে মায়ের যত্ন ও পুষ্টিকর খাবার গুরুত্বপূর্ণ বটে, এর পাশাপাশি ইতিবাচকতায় উজ্জীবিত থাকার বিষয়টিও সমান গুরুত্ববহ। তাই সব চিকিৎসকেরই উচিত এ ব্যাপারে গর্ভবতী মা ও তার পুরো পরিবারকেই একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া।

তথ্যসূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া, বেবি সেন্টার ডটকম

মেডিটেশন করুন ॥ বাড়বে আপনার নিরাময় ক্ষমতা

বিজ্ঞানের জগতে একের পর এক ঘটে চলেছে অভাবনীয় সব অগ্রগতি। এই ধারাবাহিকতায় গত কয়েক দশকে ঘটেছে নিউরোসায়েন্সের অভূতপূর্ব বিকাশ। দুর্জ্ঞেয় মস্তিষ্কের শক্তিরহস্য একটু একটু করে উন্মোচিত হচ্ছে আমাদের সামনে। ক্রমান্বয়ে বোঝা সম্ভব হচ্ছে মস্তিষ্কের বিচিত্র গঠন আর গতি-প্রকৃতি। মস্তিষ্ক নিয়ে বিজ্ঞানীদের অহর্নিশ গবেষণা তাই চলছেই।

সাম্প্রতিক এমনই কিছু গবেষণার ফলাফল থেকে বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, মস্তিষ্কের ক্ষমতার সাথে মনের শক্তির সংযোগ ঘটিয়ে নিরাময়ের জগতে সূচিত হতে পারে এক অফুরন্ত সম্ভাবনা।

মস্তিষ্কের জিন ম্যাপিং ॥ সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত

মাইক্রোসফ্‌টের সহ-প্রতিষ্ঠাতা পল অ্যালেন। গত দশকের শুরুর দিকে ১০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'অ্যালেন ইনস্টিটিউট ফর ব্রেন সায়েন্স'। বিশ্বের প্রথমসারির কজন নিউরোসায়েন্টিস্টকে এখানে জড়ো করেন তিনি। শুরু হয় গবেষণা।

এ উদ্যোগের ফলেই ২০০৬ সালে প্রথমবারের মতো আবিষ্কৃত হয় অ্যালেন

ব্রেন এটলাস ও ব্রেনের জিন ম্যাপিং। এ প্রকল্পটিতে সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করেন ৬০ জন গবেষক। বিশেষ প্রযুক্তি ও সফটওয়্যারের সাহায্যে তারা মানব মস্তিষ্কে ২১,০০০ জিনের সন্ধান পান, যাদের প্রত্যেকটিই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মস্তিষ্ক কোষ দ্বারা পরিচালিত হয় এবং প্রত্যেকেরই রয়েছে আলাদা আলাদা রকমের কাজ।

অ্যারিজোনার ট্রান্সলেশনাল জিনোমিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. ডাইট্রিচ স্টিফেনের মতে, মস্তিষ্কের জিন ম্যাপ উদ্‌ঘাটন বিজ্ঞানের জগতে এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে।

মস্তিষ্ক-জটিলতা থেকে মিলবে মুক্তি

৭১ বছর বয়সী অ্যানা হিকারসন। থাকেন যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমায়। বছর কয়েক আগে কিছু সমস্যায় ভুগতে শুরু করেন তিনি। দিন-তারিখ ভুলে যাচ্ছিলেন, স্বামী জেম্‌স হিকারসনের সাথে প্রতিদিন ফ্লাওয়ার-শপে যেতেন যে পথে, সেই রাস্তাটিও তিনি প্রায়ই ভুলে যাচ্ছিলেন। অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ালো যে, তিনি একসময় ড্রাইভিংও ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। একপর্যায়ে তারা স্বামী-স্ত্রী মিলে দেখা করেন ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব মেডিসিনের নিউরোলজিস্ট প্রফেসর র‍্যাঙ্ক রিচার-এর সাথে। জানা গেল, অ্যানা হিকারসন আলঝেইমার্স রোগে ভুগছেন।

বয়সজনিত স্মৃতিভ্রম রোগ আলঝেইমার্স। এ রোগে বিটা-এমাইলয়েড নামক একটি রাসায়নিক উপাদান পর্যায়ক্রমে মস্তিষ্কের কোষগুলোর মৃত্যু ঘটায়। রোগীরা ওষুধ সেবন করে ঠিকই, কিন্তু তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় না।

মস্তিষ্কের জিন ম্যাপিং-এর সূত্র ধরে তাই বিজ্ঞানীরা আলঝেইমার্স-এর একটি নতুন ওষুধ উদ্ভাবনের চেষ্টা করছেন। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে ওষুধটি টানা দুবছর অ্যানা-র ওপর প্রয়োগ করা হয়। দেখা গেছে, অ্যানা-র অবস্থার যে ক্রম-অবনতি ঘটছিলো তা তো রোধ হয়েছেই, সেইসাথে তিনি এতদিন যেসব কথা ভুলে যাচ্ছিলেন তা-ও প্রায় আগের মতোই মনে করতে পারছেন। শুধু তা-ই নয়, সম্প্রতি তিনি নিজেই ড্রাইভ করেছেন ৩৭ মাইলেরও বেশি পথ। অ্যানার ভাষায়, এখন আমি আগের চেয়ে অনেক ঝরঝরে আর ভালো বোধ করছি। অ্যানার স্বামী জেম্‌সের মতে, এটা সত্যিই একটা আশীর্বাদ।

এই ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞানীরা এখন মনে করছেন, সেদিন খুব বেশি দূরে নয় যেদিন সব ধরনের মস্তিষ্ক-জটিলতার সমাধান করা সম্ভব হবে। এছাড়াও

শরীরের যেকোনো অঙ্গের অসুস্থতায় প্রয়োজনে শুধু সে নির্দিষ্ট অঙ্গের ওপর ওষুধ প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে সরাসরি বা রক্তের মাধ্যমে কোনো ওষুধ মস্তিষ্কে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। নিউরোসায়েন্টিস্টরা এখন আশাবাদী হয়ে উঠেছেন যে, মস্তিষ্কের যেকোনো সমস্যায় সরাসরি ওষুধ প্রয়োগের প্রযুক্তিটিও এখন সহজ হয়ে উঠবে।

রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হবে সংহত

মস্তিষ্ক নিয়ে নিরন্তর গবেষণায় প্রতিনিয়ত আবিষ্কৃত হচ্ছে এর অভাবনীয় সব ক্ষমতা। এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন হলো, মস্তিষ্ক আমাদের রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সংহত ও উজ্জীবিত করে তোলার মাধ্যমে যাবতীয় রোগব্যাধি-জীবাণুর বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

বিষয়টি নিয়ে দুই দশক দীর্ঘ গবেষণা করেছেন নিউইয়র্কের ফেইনস্টেইন ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল রিসার্চের পরিচালক নিউরোসার্জন ও ইমিউনোলজিস্ট ড. কেভিন ট্রেসি। তার মতে, শরীরের রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে উদ্দীপ্ত করে তোলার মাধ্যমে রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস ও হৃদরোগসহ দীর্ঘমেয়াদি রোগগুলোর চিকিৎসায় ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হবে।

নিরাময়, এমনকি ক্যান্সার ঠেকাতে চাই ধ্যানমগ্ন প্রশান্তি

মেডিটেশন এক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা পালন করতে পারে, বলেন ড. ট্রেসি। তার মতে, মেডিটেশন শরীরের সব স্নায়ুকোষগুলোকে শান্ত সুস্থির অবস্থায় নিয়ে আসে। আমাদের হৃৎস্পন্দনের গতি হয়ে ওঠে স্বাভাবিক। মস্তিষ্ক তখন রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে চমৎকারভাবে প্রভাবিত করতে পারে, যার ফলে রোগব্যাধি, সংক্রমণ ও প্রদাহের বিরুদ্ধে গড়ে তোলে একটি কার্যকর প্রতিরোধ। এ নিয়ে ড. কেভিন ট্রেসির উচ্ছ্বসিত মন্তব্য—'এ পর্যন্ত যত ধরনের বিষয় নিয়ে আমি কাজ করেছি তার মধ্যে সত্যিই এটা সবচেয়ে দারুণ।'

গবেষণাটিতে দেখা গেছে, নিয়মিত মেডিটেশনের ফলে শরীর-মনে যে প্রশান্তি আসে, তাতে ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে। ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারের ভাইরোলজিস্ট ড. রোনাল্ড গ্ল্যাসার। ল্যাবরেটরি টেস্টে তিনি প্রমাণ করেছেন, স্ট্রেস হরমোন নর-এপিনেফ্রিন ক্যান্সার সেলকে উদ্দীপিত করার মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ক্যান্সার ছড়িয়ে দেয়। তার

মতে, তাই ক্যান্সারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফল হতে চাই স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণ। আর স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে মেডিটেশনের ভূমিকা এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত।

নিরাময়ের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি : মনছবি

মানব মন আর মস্তিষ্কের বিস্ময়কর নিরাময়শক্তি বিজ্ঞানীদের আরো নিত্যনূতন গবেষণায় উৎসাহী করে তুলছে। আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিসহ আরো দুটি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা এমনই একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। ক্রনিক ব্যথায় ভুগছেন এমন কয়েকজন রোগীকে বিশেষ কম্পিউটার প্রযুক্তির সাহায্যে তাদের নিজ নিজ মস্তিষ্কের ছবি দেখানো হয় ও এর কর্মপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে একটি ধারণা দেয়া হয়। তারপর তাদের বলা হয়, মস্তিষ্ক তার নিজস্ব নিরাময় প্রক্রিয়ায় ব্যথা নিরাময় করছে–এ দৃশ্যটি কল্পনা করতে।

এ গবেষণায় নেতৃত্বদানকারী ড. সিয়েন ম্যাকি বলেন, 'পরবর্তীতে দেখা গেছে, এদের অনেকেরই ব্যথার তীব্রতা শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত কমে গেছে।' তার ভাষায়, ভবিষ্যতে এমন দিন আসছে যখন একজন চিকিৎসক তার রোগীদের কল্পনাশক্তি শাণিত করার পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দেবেন– যাতে বিষণ্নতা, বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর আসক্তি ও ভয় থেকে তারা নিজেরাই মুক্ত হতে পারে। তখন হয়তো ফিটনেস সেন্টারের বদলে গড়ে উঠবে ব্রেন-ইমেজিং সেন্টার, যেখানে গিয়ে একজন মানুষ নিজের কল্পনাশক্তি ব্যবহার করে তার দরকার মতো মস্তিষ্কের যেকোনো অংশকে আরো কার্যকর করে তুলতে পারবে। আর এভাবেই সে হয়ে উঠবে অধিকতর দক্ষ, চৌকস, উন্নত স্মৃতিশক্তি ও উচ্চতর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন একজন মানুষ।

একবিংশ শতাব্দীর শুরুর দশকে মস্তিষ্ক-গবেষণায় এমন বিস্ময়কর সব ফলাফল আমূল বদলে দিচ্ছে চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের পুরনো সব ধ্যানধারণা। এ প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেন্টাল হেলথের ইন্টিগ্রেটিভ নিউরাল ইমিউন প্রোগ্রামের পরিচালক ড. এস্থার স্টার্নবার্গ বলেন, বিজ্ঞান ও আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থায় মনোদৈহিক নিরাময়ের যে দৃষ্টিভঙ্গিটি এতদিন উপেক্ষিত ছিলো, সব কৃতিত্ব বুঝি এবার তাকেই দিতে হবে।

তথ্যসূত্র : রিডার্স ডাইজেস্ট (মে ২০০৭)

মেডিটেশন ॥
হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় করে

আরমান আহমেদ (ছদ্মনাম)। পেশায় ডেন্টাল সার্জন। নিজে চিকিৎসক ছিলেন বলে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন বরাবরই। প্রতিদিন নিয়ম করে এক ঘণ্টা হাঁটতেন, খাবারেও অতিরিক্ত তেল-চর্বি এড়িয়ে চলতেন সবসময়। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, মাত্রাতিরিক্ত কোলেস্টেরল কিছুই তার ছিলো না। ওজনও ছিলো শতভাগ নিয়ন্ত্রণে। হঠাৎ একদিন শোনা গেল, তার হার্ট অ্যাটাক করেছে। তিনি সিসিউতে ভর্তি আছেন।

আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব কারোরই বিশ্বাস হতে চাইলো না খবরটা। এমন পরিমিত আর নিয়মনিষ্ঠ জীবনযাপন যার, তার কীভাবে হার্ট অ্যাটাক হলো। দিন কয়েক বাদে ধীরে ধীরে একটু সুস্থ হতে শুরু করলে ডাক্তার তার কেস-হিস্ট্রি নিতে গিয়ে বুঝলেন, আরমান সাহেবের হার্ট অ্যাটাকের কারণ মূলত তার মানসিক চাপ। পারিবারিক কিছু অশান্তিতে ভুগছিলেন, মাস কয়েক ধরে একটা অসহনীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। এতটাই ভেঙে পড়েছিলেন যে, অসহ্য এক স্ট্রেস প্রতিনিয়ত কুরে কুরে খাচ্ছিলো তাকে। যার অন্যতম পরিণতি এই আকস্মিক হার্ট অ্যাটাক।

ধূমপান, মেদস্থূলতা, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগের পারিবারিক ইতিহাস, অতিরিক্ত কোলেস্টেরলযুক্ত খাবার ইত্যাদির পাশাপাশি টেনশন ও স্ট্রেস হৃদরোগের অন্যতম প্রধান কারণ। গত শতকের শেষভাগে বিশ্বজুড়ে ব্যাপক গবেষণার ফলে বিভিন্ন প্রাণঘাতী রোগ, বিশেষত হৃদরোগের সাথে স্ট্রেসের যোগসূত্রের বিষয়টি তো এখন স্পষ্ট।

মার্কিন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. ক্রিচটন বলেন, হৃদরোগের অন্যতম প্রধান কারণ মানসিক চাপ। দীর্ঘ গবেষণার পর তিনি দেখিয়েছেন যে, কোলেস্টেরল বা চর্বিজাতীয় পদার্থ জমে করোনারি আর্টারিতে রক্ত চলাচল কমিয়ে দিলেই যে হার্ট অ্যাটাক হবে এমন কোনো কথা নেই। দেখা গেছে, করোনারি আর্টারির ৮৫% বন্ধ অবস্থা নিয়েও একজন ম্যারাথন দৌড়ে অংশ নিয়েছে;

আবার শুধুমাত্র স্ট্রেস, টেনশন বা মানসিক চাপের কারণে একেবারে পরিষ্কার আর্টারি নিয়ে আরেকজন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মেয়ার ফ্রেডম্যান তার সহকর্মী রোজেনম্যানকে নিয়ে পঞ্চাশের দশকে একটি গবেষণা-প্রতিবেদন তৈরি করেন। তাতে বলা হয়, হৃদরোগের সাথে অস্থিরচিত্ততা, বিদ্বেষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি, তীব্র অনুভূতিপ্রবণতা–অর্থাৎ নেতিবাচক জীবনদৃষ্টির সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। আর এ ধরনের ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যাদের মধ্যে তাদেরকে গবেষকদ্বয় অভিহিত করেন টাইপ এ ব্যক্তিত্ব (Type A Personality) হিসেবে। ১৯৭৪ সালে তারা এ নিয়ে একটি বইও লেখেন–'টাইপ এ বিহেভিয়ার এন্ড ইয়োর হার্ট'। বইটি তখন বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলো। মূলত তখন থেকেই টাইপ এ পার্সোনালিটি বাক্যটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূলধারায় ব্যাপক পরিচিতি পায়।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, সুস্থ হৃদযন্ত্রের জন্যে চাই মানসিক প্রশান্তি ও সঠিক জীবনদৃষ্টি। আর মানসিক প্রশান্তি ও চাপমুক্ত জীবনের জন্যে মেডিটেশনের ভূমিকা এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে হৃদরোগ চিকিৎসার পথিকৃৎ ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ-এর মহাসচিব জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) ডা. আব্দুল মালিক তার আত্মজীবনী 'জীবনের কিছু কথা' বইয়ে

লিখেছেন, 'শরীরের ওপর মনের প্রভাব অপরিসীম। তাই দেহের পাশাপাশি মনের যত্ন নেয়াও খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মন বা আত্মা ভালো না থাকলে শরীরও ভালো থাকে না। কাজেই আমাদের দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনযাপনের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এজন্যে নিয়মিত নামাজ, প্রার্থনা ও মেডিটেশন করা উচিত। চাপমুক্ত জীবনযাপন, মানসিক সুস্বাস্থ্য ও সুস্থ হৃদযন্ত্রের জন্যে রিলাক্সেশন বা শিথিলায়নের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সারা বিশ্বে তাই এটি দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে'।

একাধিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এটি এখন প্রমাণিত সত্য যে, মেডিটেশন হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় দুক্ষেত্রেই কার্যকর ভূমিকা রাখে। সাধারণভাবে, রক্তের উচ্চ কোলেস্টেরল হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম কারণ। মেডিটেশন এই অস্বাভাবিক বেশি কোলেস্টেরলের মাত্রাকে কমিয়ে আনতে পারে।

মেডিকেল কলেজ অব জর্জিয়ার ফিজিওলজিস্ট ডা. বার্নেস ১১১ জন তরুণ স্বেচ্ছাসেবীর ওপর একটি গবেষণা চালান। তিনি বলেন, কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধ ব্যবহার করে আগে যে ফল পাওয়া যেত, তা-ই পাওয়া সম্ভব মেডিটেশনে। ২০০৭ সালে আমেরিকান সাইকোসোমাটিক সোসাইটির বার্ষিক কনফারেন্সে তিনি এ রিপোর্টটি পেশ করেন।

এছাড়াও ১৯৭৯ সালে দুজন গবেষক এম জে কুপার এবং এম এম আইজেন ২৩ জন উচ্চ কোলেস্টেরল রোগীর মধ্যে ১২ জনকে মেডিটেশন করান। ১১ মাস পর দেখা যায় যে, মেডিটেশনকারী দলের কোলেস্টেরল ২৫৫ থেকে ২২৫-এ নেমে এসেছে।

মেডিটেশন করোনারি ধমনীর ব্লকেজ ও রক্তচাপ কমায়– বিজ্ঞানীরা এতদিন জানতেন শুধু এটুকুই। কিন্তু মেডিটেশনের মনোদৈহিক প্রভাব সম্বন্ধে সাম্প্রতিক যে তথ্যটি এখন তাদের আলোচনার বিষয় তা হলো, হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক প্রতিরোধসহ হৃদরোগজনিত যেকোনো অকালমৃত্যু ঠেকাতে মেডিটেশন অত্যন্ত কার্যকরী।

আমেরিকায় ২০১ জন আফ্রো-আমেরিকান হৃদরোগীকে নিয়ে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায়, যারা নিয়মিত মেডিটেশন করেন তাদের ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি অন্যান্যদের তুলনায় শতকরা ৪৭ ভাগ কমে গেছে। এ প্রসঙ্গে গবেষকদের একজন থিওডর কচেন্ বলেন, মানুষ ওষুধ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিন্তু আমাদের গবেষণায় এটাই প্রমাণিত হলো যে, স্ট্রেসজনিত রোগের ঝুঁকি কমাতে সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকরী পন্থা মেডিটেশন। রিডার্স ডাইজেস্ট-এ প্রকাশিত হৃৎপিণ্ডের সুস্থতা বিষয়ক একটি

স্বাস্থ্য-প্রতিবেদনে এ তথ্যগুলো প্রকাশিত হয়। শুধু তা-ই নয়, হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে মেডিটেশনের ভূমিকার সত্যতা এখন স্থান পেয়েছে কার্ডিওলজির প্রধান প্রধান পাঠ্যবইয়ের সাম্প্রতিক সংস্করণগুলোতেও।

Hurst's : The Heart বইটির দ্বাদশ সংস্করণে বলা হয়েছে– '... মেডিটেশন জীবনে শৃঙ্খলা নিয়ে আসে। শরীর স্থির হয়, মন হয়ে ওঠে প্রশান্ত। এর ফলে একটি নিরাময়ের অনুরণন সৃষ্টি হয়, যা হৃদরোগের ভীতিকর বুকব্যথা থেকে মুক্তি দেয় এবং জীবনমানের উন্নতি ঘটায়। হৃদরোগীদের জীবনধারা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাই এর ভূমিকা রয়েছে এবং এটি এথেরোরিগ্রেশন করে বা করোনারি ধমনীতে জমে থাকা কোলেস্টেরলের নিঃসরণ ঘটায়।' (পৃষ্ঠা ২৪৬৮)।

Braunwald's Heart Disease বইটির অষ্টম সংস্করণে ১১৫৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে–'... মেডিটেশন, যোগ ব্যায়াম, গভীর শ্বাসপ্রশ্বাস (প্রাণায়াম) ব্যথা-বেদনা ও দুশ্চিন্তা দূর করে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এ পদ্ধতিতে মানসিক চাপ কমে ও রোগ নিরাময় সুসম্পন্ন হয়। এছাড়াও মেডিটেশন রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং শরীরে ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়ায়।'

তাই হৃদযন্ত্রের সুস্থতার জন্যে মানসিক চাপমুক্ত জীবনযাপন করুন। আর তা সম্ভব নিয়মিত মেডিটেশন বা ধ্যানমগ্নতায়। দিনে অন্তত ৩০ মিনিট মেডিটেশন আপনাকে নিয়ে যাবে নতুন আনন্দলোকে। প্রশান্তি হবে আপনার নিত্যসঙ্গী। অযাচিত সব দুঃখ-কষ্ট আর নেতিবাচকতা আপনার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে দূরে, অনেক দূরে। আপনি হয়ে উঠবেন সুস্থ সুন্দর প্রাণবন্ত এক নতুন মানুষ।

তথ্যসূত্র : Hurst's : The Heart (12th edition)
Braunwald's Heart Disease (8th edition)
রিডার্স ডাইজেস্ট (সেপ্টেম্বর ২০১০)

মেডিটেশন ও নিউরোনের সংযোগায়ন মস্তিষ্ককে শাণিত করে

মানবদেহের সবচেয়ে দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময় অঙ্গ কোনটি? উত্তরটা বুঝি সবারই জানা–আমাদের ব্রেন বা মস্তিষ্ক। এ নিয়ে তাই বিজ্ঞানীদের গবেষণা আর উৎসাহের অন্ত নেই কোনো। সময় যত যাচ্ছে মস্তিষ্কের জটিল কর্মপ্রক্রিয়া সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানীদের মনে রহস্য ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে।

মানুষের ক্ষমতা সত্যিই অসীম এবং এটি নির্ভর করে মস্তিষ্ককে আমরা কতটা চমৎকারভাবে ব্যবহার করতে পারছি, তার ওপর। বিজ্ঞানীদের ধারণা, আমাদের বুদ্ধিমত্তা কীভাবে কাজ করে বা এটি কোন প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হয় তার আধখানা হদিসও যদি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়, তবে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ানোর উপায় জানাও সম্ভব হবে।

পেশির শক্তি বাড়ানোর আশায় অনেকে ভারোত্তোলন আর নানারকম শক্ত ব্যায়াম করে থাকেন। এর ফলে পেশির শক্তি বাড়ে ঠিকই, কিন্তু কীভাবে? গবেষণায় দেখা গেছে, এতে পেশির কোষগুলোর মধ্যে এক ধরনের রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক আন্তঃপারস্পরিক যোগাযোগের সৃষ্টি হয়। ফলে পেশিতন্তুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং পেশি হয়ে ওঠে অধিকতর শক্তিশালী ও মজবুত। বিজ্ঞানীরা বলছেন, মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতাও আসলে বাড়ানো সম্ভব এভাবেই–মস্তিষ্কের কোষ অর্থাৎ নিউরোনগুলোর মধ্যকার আন্তঃপারস্পরিক সংযোগ বাড়িয়ে। এতে মস্তিষ্কের সম্ভাবনা বাড়ে বহুগুণ। গবেষকদের মতে, এর অন্যতম উপায় হলো মেডিটেশন বা ধ্যান। যার মাধ্যমে মস্তিষ্ককে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করে আমরা হয়ে উঠতে পারি আরো চৌকস, আরো সৃজনশীল আর তীক্ষ্ণধী।

আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত যা ঘটে চলেছে, সেইসব ঘটনার আদ্যোপান্ত অনেকেই বেশ দ্রুত আর সহজে বুঝতে পারেন। নিঃসন্দেহে এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দক্ষতা। বিজ্ঞানীরা বলছেন, একজন মানুষের মস্তিষ্ক কতটা তীক্ষ্ণ ও উর্বর, সেটি বোঝা যায় মূলত এই বুদ্ধিমত্তার বিষয়টি দিয়েই।

তাই এটা বাড়ানোর উপায় নিয়ে চলছে বিজ্ঞানীদের নিদ্রাহীন গবেষণা। এ প্রসঙ্গে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ-ওয়েস্টার্ন মেডিকেল সেন্টারের গবেষক জেমস বিব্ বলেন, প্রচুর তথ্য-উপাত্ত ও একাধিক গবেষণার ভিত্তিতে বিষয়টি আমাদের কাছে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোসায়েন্টিস্ট ইয়াকভ স্টার্ন বলেন, মূলত নিউরোন ও সিন্যাপ্সের (দুটি নিউরোনের মধ্যবর্তী সংযোগ-পথ) সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতেই রচিত হয় উচ্চস্তরের বুদ্ধিমত্তা। অর্থাৎ নতুন নতুন নিউরোন ও সিন্যাপ্সের উৎপত্তির ওপর নির্ভর করে আমাদের বোঝার ক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি, বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও সৃজনশীলতা।

স্টার্নের নিউরো-ইমেজিং গবেষণায় দেখা যায়, একজন মানুষ কোনো একটি বিশেষ কাজে দক্ষ হয়ে উঠলে সে কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট মস্তিষ্কের সেই বিশেষ অংশের নিউরোনের সংযোগ-পথগুলো হয়ে ওঠে অধিকতর প্রশস্ত, নমনীয় এবং কার্যকরী।

মস্তিষ্কের কাঠামো ও কর্মপ্রক্রিয়া উন্নত করার উপায় নিয়ে পরিচালিত অনেকগুলো গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা বলেন, এর একটি জাদুকরী প্রক্রিয়া হচ্ছে মনোযোগ, যা মস্তিষ্কের গঠন পরিবর্তন করতেও সক্ষম। পর্যাপ্ত মনোযোগের মাধ্যমে নিউরোনগুলোর মধ্যকার বৈদ্যুতিক সংযোগ-পথ হয়ে ওঠে আরো বিস্তৃত। এটি বোঝানো হয়েছে একটি উদাহরণ দিয়ে। যেমন, গভীর মনোযোগে একটি সুর যদি ক্রমাগত শোনা হয়, মস্তিষ্কের যে অংশের মাধ্যমে এটি অনুভূত হয় তা ক্রমশ বিকশিত হতে থাকে। আর মূলত এ মনোযোগই কোনো একটি কাজে আমাদেরকে দক্ষ ও চৌকস করে তোলে।

কাজে মনোযোগ বাড়ানোর জন্যে ধূমপানের পক্ষে খোঁড়া যুক্তি দিয়ে নানারকম সাফাই গেয়ে থাকেন ধূমপায়ীরা। কিন্তু গবেষকদের সাবধানবাণীটা একটু অন্যরকম–সিগারেটে থাকা নিকোটিন বরং স্মৃতিভ্রষ্টতার ঝুঁকিই বাড়ায়। এছাড়াও ব্রেনে ডোপামিনের প্রবাহ বাড়িয়ে স্মৃতিশক্তিকে উদ্দীপিত করার জন্যে ইদানীং কিছু কিছু ওষুধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজিস্ট মার্থা ফারাহ্ পরিচালিত একটি গবেষণায় একদল স্বেচ্ছাসেবককে দুটি গ্রুপে ভাগ করে এক গ্রুপকে এসব ওষুধ সেবন করানো হয় আর অন্য গ্রুপকে শুধু প্লাসিবো অর্থাৎ ইতিবাচক বিশ্বাসে উজ্জীবিত করা হয়। পরবর্তীতে দুটি দলের কর্মদক্ষতায় ফারাহ্ কোনো পার্থক্য খুঁজে পান নি। এ গবেষণার ফলাফলে তিনি বলেন, ইতিবাচক চিন্তার মাধ্যমে ডোপামিনের প্রবাহ বাড়িয়ে আপনি নিজেই আপনার ব্রেনকে উদ্দীপ্ত

করতে পারেন। উপরন্তু, ইতিবাচক চিন্তার ফলে আপনার বিশ্বাসের শক্তি বাড়বে, যা কখনো ওষুধের মাধ্যমে সম্ভব নয়।

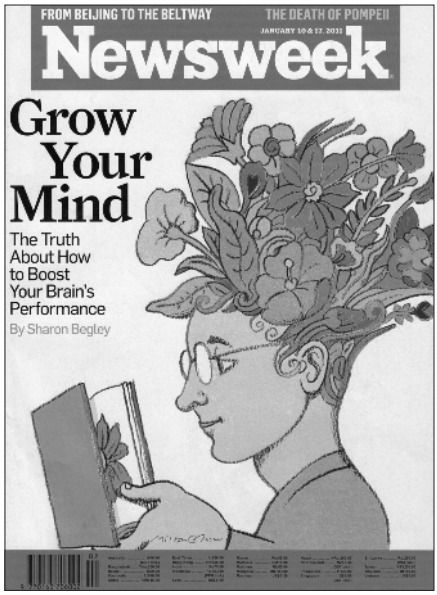

স্ট্রেসমুক্ত থাকুন সবসময়। স্ট্রেস আপনার মস্তিষ্কের নিউরোনের ক্ষতির কারণ। স্ট্রেসের ফলে নিঃসৃত কর্টিসোল হরমোন নিউরোনের আবরণ মায়েলিন শিথ্-কে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কেবল তা-ই নয়, নিউরোনগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক যোগাযোগকেও বাধাগ্রস্ত করে তোলে কর্টিসোল। তাই বিজ্ঞানীরা বলেন, স্ট্রেসমুক্ত থাকতে পারলে মস্তিষ্কের সম্ভাবনাকে আপনি বহুগুণে বাড়াতে পারবেন।

মস্তিষ্ককে যত বেশি পরিমাণে ব্যবহার করবেন এর শক্তি ও সম্ভাবনা তত বাড়তে থাকবে। ২০০৩ সালে লন্ডনের ক্যাব ড্রাইভারদের ওপর পরিচালিত একটি গবেষণায় এর প্রমাণ মিলেছে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের নিউরোসায়েন্টিস্ট এলিনর মেগার এ গবেষণার মাধ্যমে দেখান যে, যারা লন্ডন শহরের সবচেয়ে গোলমেলে রাস্তাগুলোর গলি-ঘুপচি চমৎকারভাবে মনে রাখতে পারেন, তাদের মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাস অন্যান্য ক্যাব ড্রাইভারদের তুলনায় আকারে বিস্তৃত। তার মতে, মস্তিষ্ককে এভাবে ব্যবহার না করলে আমরা ক্রমাগত এ ক্ষমতা হারাতে থাকবো।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, মস্তিষ্ককে শাণিত করে তোলা সম্ভব আমাদের সবার পক্ষেই। এজন্যে প্রথমত প্রয়োজন মেডিটেশন। কারণ, মস্তিষ্কের যে অংশটি আমাদের মনোযোগ নিয়ন্ত্রণ করে নিয়মিত মেডিটেশনে তার পুরুত্ব বাড়ে। আর কাজে মনোযোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়ে আমাদের কর্মদক্ষতা। মিয়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোসায়েন্টিস্ট আমিশি ঝা বলেন, মেডিটেশনের প্রভাবে

মনোযোগ বাড়ে এবং আমাদের মস্তিষ্কের কর্মকাঠামো পরিবর্তিত হয়। আমরা হয়ে উঠি আগের চেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত, চৌকস ও কর্মতৎপর।

মস্তিষ্ককে শাণিত করার দ্বিতীয় কার্যকরী উপায়টি হলো ব্যায়াম। তড়িঘড়ি এখনই জিমে ছুটতে হবে এমন নয়, বরং ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ আদর্শ। আর এক্ষেত্রে সর্বোত্তম হলো হাঁটা। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক আর্ট ক্রেমারের মতে, সপ্তাহে অন্তত তিন দিন ৪৫ মিনিট করে হাঁটলে আমাদের স্মৃতিশক্তি ও মস্তিষ্কের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। কারণ, ব্যায়ামের ফলে নিউরোনের সুস্থতার জন্যে প্রয়োজনীয় নিউরোট্রান্সমিটারগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। সেই সাথে মস্তিষ্কের প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স অংশে বাড়ে গ্রে-ম্যাটার বা ধূসর পদার্থের পরিমাণ। উল্লেখ্য, মস্তিষ্কের এই প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স থেকেই উৎসারিত হয় আমাদের সুখ ও আনন্দের মতো ইতিবাচক আবেগ-অনুভূতিগুলো।

এছাড়াও নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে মস্তিষ্কে নতুন সিন্যাপ্সের উৎপত্তি ঘটে এবং নিউরোনগুলোর মধ্যে তড়িৎ যোগাযোগ সুদৃঢ় হয়। শাণিত বুদ্ধিমত্তা অর্জনের জন্যে যা অত্যন্ত প্রয়োজন। ক্রেমার বলেন, নিউরোনগুলোর মধ্যে সংযোগায়নের এ প্রভাব এতটাই ব্যাপক যে, এর ফলে স্মৃতিশক্তি, পরিকল্পনা-দক্ষতা এবং একসাথে অনেক কাজ সামলানোর ক্ষেত্রে একজন সত্তরোর্ধ্ব মানুষের মস্তিষ্কও হয়ে ওঠে ৩০ বছরের তরুণ মস্তিষ্কের মতোই তুখোড় ও সৃজনশীল।

তথ্যসূত্র : নিউজউইক (১০ ও ১৭ জানুয়ারি, ২০১১)

মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি বাড়ায় মেডিটেশন

মেডিটেশন মানসিক দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ দূর করে। এটা এখন আর নতুন কোনো তথ্য নয়। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের নানারকম প্রযুক্তির সাহায্যে মস্তিষ্ক পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা এখন জানতে পারছেন যে, মেডিটেশন মস্তিষ্কের কাঠামো ও কাজকে সরাসরি প্রভাবিত করে থাকে। বিশেষ করে সচেতনতা, মনোযোগ এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে মেডিটেশনের ভূমিকা প্রত্যক্ষ করে নিউরোসায়েন্টিস্টরা রীতিমতো অভিভূত।

নভেম্বর ২০০৫-এ ম্যাসাচুসেট্স জেনারেল হাসপাতালের রিসার্চ-সায়েন্টিস্ট সারা লাজার ২০ জন নারী-পুরুষের ওপর চালানো তার এক গবেষণার প্রাথমিক ফল প্রকাশ করেন–যারা প্রতিদিন ৪০ মিনিট করে মেডিটেশন করতেন। তাদের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করে সারা দেখলেন, নিয়মিত মেডিটেশনের পর তাদের মস্তিষ্কের সেরিব্রাল কর্টেক্সের পুরুত্ব বেড়েছে। সেরিব্রাল কর্টেক্স হলো মস্তিষ্কের সেই অংশ যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মনোযোগ এবং স্মৃতিশক্তি নিয়ন্ত্রণ করে।

এর আগে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ওপর চালানো প্রায় একই ধরনের একটি পরীক্ষায়ও ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া গিয়েছিলো। কিন্তু দিনের প্রায় বেশিরভাগটাই মেডিটেশনে আত্মনিমগ্ন থাকা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের তুলনায় এবারের এ গবেষণায় অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন বোস্টন এলাকারই বিভিন্ন কর্মজীবী সাধারণ মানুষ। আর এতে যে বিষয়টি প্রমাণিত হয় তা হলো, দিনের মাত্র কিছুটা সময় নিয়মিত মেডিটেশন করলেই এ ফল পাওয়া যায়।

শুধু মনোযোগ বা স্মৃতিশক্তি নয়, সারা লাজারের গবেষণার আরেকটি চমকপ্রদ আবিষ্কার হলো–বয়স বাড়ার সাথে সাথে কর্টেক্সের যে অংশ পাতলা হতে থাকে মেডিটেশন সেটিকেও রোধ করতে পারে।

নিয়মিত মেডিটেশন করলে মনোযোগ এবং আরো বেশি সচেতনতা নিয়ে কাজ করা যায়। কেউ কেউ বলেন, তাহলে দুপুরের খাওয়ার পর কিছুটা ঘুমিয়ে নিলেও কি একইভাবে চাঙ্গা হওয়া যায় না? না, বলেছেন ইউনিভার্সিটি অব কেন্টাকির বায়োলজির প্রফেসর ব্রুস ওহারা। তিনি একদল কলেজ

ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে একটি গবেষণা চালান, যেখানে নিদিষ্ট সময়ের জন্যে তাদের কিছু সংখ্যককে মেডিটেশন, কিছু সংখ্যককে ঘুম এবং বাকিদেরকে টেলিভিশন দেখানো হয়। এরপর একটা নির্দিষ্ট স্ক্রিনে বাতি জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বলা হয় একটি নির্দিষ্ট বোতাম টিপতে।

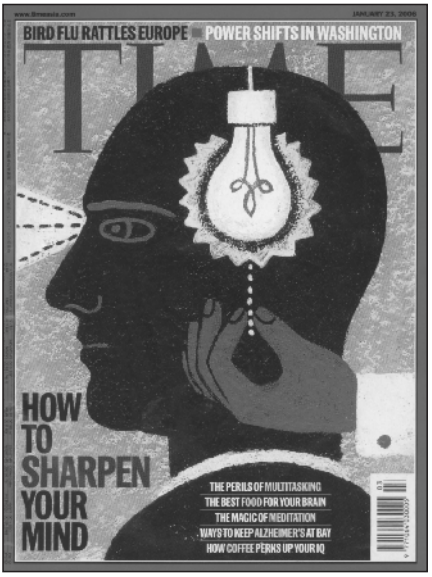

এ পরীক্ষায় দেখা গেল, যারা মেডিটেশন করেছে তারা অন্যদের চেয়ে দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে তা করতে পেরেছে। যারা ঘুমিয়ে ছিলো তাদের তৎপরতা ছিলো তুলনামূলক ধীর। অর্থাৎ মেডিটেশনের ফলে মস্তিষ্কের সু-সমন্বয় এবং তৎপরতা বাড়ে।

মেডিটেশনের এ ইতিবাচক প্রভাবের কারণেই ডয়েচ ব্যাংক, গুগল বা হাগস্ এয়ারক্রাফটের মতো বড় বড় ব্যবসায়িক কর্পোরেশনগুলো তাদের কর্মীদের জন্যে মেডিটেশন ক্লাসের ব্যবস্থা করেছে। তারা দেখছে, এতে করে তাদের কর্মীদের মেধা শাণিত হবার পাশাপাশি উৎপাদন ক্ষমতাও বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। কর্মীদের অসুস্থতার হার কমেছে, কমেছে কাজে অনুপস্থিতির হারও।

তথ্যসূত্র : টাইম ম্যাগাজিন (২৪ জানুয়ারি, ২০০৬)

মেডিটেশন দেবে নতুন আইডিয়া আর সমাধান

লিজা গিজারা একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার। তার এক ক্লায়েন্টের জন্যে একটা নতুন বিজ্ঞাপনের আইডিয়া ভাবছেন বেশ কদিন ধরেই। কিন্তু না, নতুন কোনো আইডিয়া কোনোভাবেই আসছে না। চিন্তা করতে করতে তিনি প্রায় কাহিল। এক বিকেলে সমস্ত দুর্ভাবনা ঝেড়ে ফেলে পোষা কুকুরটাকে নিয়ে লিজা বেরিয়ে পড়লেন বাড়ির পাশের সী-বিচে। বালির ওপর হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ তার মাথায় একটা কথা যেন ঝিলিক দিয়ে উঠলো–'সংযুক্ত হও'। তিনি কয়েক পা হেঁটে যেতেই একটা মূর্তি দেখতে পেলেন আর সেখানেই খুঁজে পেলেন তার সমাধান। লিজার ভাষায়, 'নিজেকে সত্যিই আমার খুব ভাগ্যবান মনে হলো। মনে হলো, সমাধানটা কেউ যেন আমার জন্যেই পাঠালো'।

আমরা নিজেরাও হয়তো অনেক সময় এরকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি যখন মনে হয়েছে আমার কোনো ভুল হচ্ছে না, সব আমার পক্ষেই আছে। ক্রিকেট খেলায় যখন ব্যাটিং করছি প্রতিটা শট যেন ঠিক সেরকমই হচ্ছে, যেমনটা আমি চাইছি কিংবা কঠিন সব সমস্যার সমাধানগুলো যেন একটার পর একটা লাইন ধরে আসছে যা এতদিন খুব ভোগাচ্ছিলো আর রীতিমতো অসম্ভব মনে হয়েছিলো। আমাদের অধিকাংশের কাছেই এমন মুহূর্তগুলো একেবারে বিরল নয়। কিন্তু এটা কি কাকতালীয় কোনো ব্যাপার? না, মোটেই নয়।

বোস্টনের মাইন্ড বডি মেডিকেল ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ডা. হার্বার্ট বেনসন। তার সাড়া জাগানো 'রিলাক্সেশন রেসপন্স' বইটি ১৯৭৫ সালে বেস্ট সেলার হয়েছিলো। সম্প্রতি 'ব্রেকআউট প্রিন্সিপাল' নামে তিনি আরেকটি বই লিখেছেন। তাতে বলেছেন, মনকে শিথিল করার মাধ্যমে কীভাবে একজন মানুষ তার মানসিক সামর্থ্যকে তুঙ্গ অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ দৈনন্দিন চিন্তাভাবনার জঞ্জাল এবং মাথা খারাপ করে ফেলা সমস্যার বাইরে এসে যদি ভাবা যায়, কিছুটা সময় যদি অন্য চিন্তায় ডুবে

থাকা যায়, তাহলে চিন্তার রাজ্যে তৈরি হয় সেই স্বচ্ছতা আর স্থিরতা, যা দেয় সঠিক সিদ্ধান্ত ও সমাধান।

শার্লিন এব্রাম ৪৩ বছর বয়সী একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। বছর কয়েক ধরেই স্বামীর সঙ্গে তার বনিবনা হচ্ছিলো না। কিন্তু ডিভোর্সের সিদ্ধান্তও তিনি নিতে পারছিলেন না। কারণ এসব নিয়ে ভাবতে গেলেই তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়তেন।

অবশেষে ১৯৯৪-এর পুরো গ্রীষ্ম জুড়ে প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি তার সেন্ট লুইসের বাড়ির বাগানে চরকার মতো ছোট্ট এক ধরনের সেলাই নিয়ে মেতে উঠতেন। প্রতিদিন কিছু সময় ধরে এটা চালাতেন, কিছু একটা বুনতেন। এবং একটা সময় তিনি ডুবে যেতেন ভাবনাহীন, ভয়হীন এক গভীর তন্ময়তায়। আর এভাবেই শার্লিন একসময় বুঝতে পারেন তার বিয়েটা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা অর্থহীন। তিনি ডিভোর্স দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ফিরে পান নতুনভাবে জীবন শুরু করার মানসিক শক্তি ও দৃঢ়তা।

প্রফেসর হার্বার্ট বেনসনের ভাষায়, চিন্তাক্লিষ্ট মনটাকে যখন কিছুক্ষণের জন্যে দূরে সরিয়ে রাখা যায়–হতে পারে সেটি শার্লিনের মতো কোনো স্ব-উদ্ভাবিত ব্যক্তিগত উপায়ে কিংবা মেডিটেশন বা শিথিলায়নের মতো কোনো পরীক্ষিত পদ্ধতিতে–তখন ব্রেনে ঘটে এক রাসায়নিক পরিবর্তন। দেহে তখন নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি হয়। একসময় বিজ্ঞানীরা এটিকে বিষ হিসেবে আখ্যায়িত করলেও আশির দশকের গোড়ায় তারা বুঝতে পারেন যে, বিভিন্ন শারীরবৃত্তিয় কার্যক্রম, যেমন : উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা আছে।

বেনসন বলেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, ব্রেনে যখন নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি হয় তখন একদিকে যেমন তা উদ্বেগজনিত ক্ষতিকর হরমোনের প্রভাবকে মোকাবেলা করছে অন্যদিকে ব্রেনে নিউরোট্রান্সমিটারের তৎপরতাকেও বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে জন্ম নেয় ভালো থাকার এক আনন্দদায়ক অনুভূতি। শুধু তা-ই নয়, ঝর্নাধারার মতো সৃজনশীল ভাবনার স্ফূরণ কিংবা কঠিন সব সমস্যার ফলপ্রসূ সমাধান খুঁজে পাওয়ার অনুভূতিও মানুষ পেতে পারে সে সময়।

তাই দৈনন্দিন কাজের বিরক্তি বা সমস্যার চাপে পড়ে হাল ছেড়ে দেবেন না। বরং নিমগ্ন হোন গভীর মেডিটেশনে কিংবা ডুবে যান সুখকর কোনো ভাবনায়। কিছুক্ষণ পর সত্যিই অনুভব করবেন পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে, কারণ তা সমাধানের উপায় এখন আপনারই হাতে।

তথ্যসূত্র : রিডার্স ডাইজেস্ট

স্কুলে মেডিটেশন চর্চা শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ কমায়

ওটা ছিলো তাদের গেমস ক্লাব। ৪৫ মিনিট খেলাধুলা করে ক্লাসে ফেরার পর ব্যাগ থেকে বই বের করে ষষ্ঠ শ্রেণীর বাচ্চাগুলো রীতিমতো হতভম্ব। ওদের মধ্যে ১০/ ১২ জনের বই থেকে কে যেন কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে নিয়েছে। যেসব পাতা ছেঁড়া হয়েছে, সামনের পরীক্ষায় সে বিষয়গুলি রয়েছে। বোকা বোকা চোখে এ ওর দিকে তাকায়। কী করবে এখন! কে করলো এটা? ঘটনা শুনে শিক্ষকরাও অবাক।

ঘটনাটা কোলকাতার সল্টলেকের ভারতীয় বিদ্যাভবন স্কুলে। ঘটেছিলো ২০০৭ সালের প্রথম দিকে। স্কুলের অধ্যক্ষা অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় বলেন, ওই ক্লাসে যারা ভালো ফল করে তাদের বই থেকেই এভাবে পাতা ছিঁড়ে নেয়া হয়েছিলো। মনে হয় ক্লাসেরই অন্য কোনো বাচ্চার কাজ এটা। কেন? অনিন্দিতা দেবীর উত্তর–'প্রতিযোগিতা, আবার কী! আসলে ওই ১০/ ১২ জন লেখাপড়ায় ভালো। ওদের বই থেকে পাতাগুলি ছিঁড়ে নিলে পরীক্ষার আগে বিষয়টি পড়তে পারবে না ওরা। হিসেব সহজ।'

দৌড়, দৌড়, দৌড়! খুব ভালো নম্বর, সবার থেকে বেশি নম্বর, প্রথম হওয়ার মতো নম্বর পেতেই হবে। প্রতিযোগিতার চাপে পড়ুয়ারা বিভ্রান্ত। চাপ কমাতে তাই মেডিটেশনের সাহায্য নিচ্ছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। অনেকে আবার নিয়মিত কাউন্সেলিং-ও করাচ্ছেন। ভারতীয় বিদ্যাভবনে পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে পড়ুয়াদের পাঁচ মিনিট মেডিটেশন করাচ্ছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। একেবারে খুদেরাও যেমন রয়েছে, তেমনি বাদ যাচ্ছে না একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়ারাও।

স্কুলে মিড টার্ম পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষা শুরু হয় বেলা ১১টায়। তার আধঘণ্টা আগে সাড়ে ১০টায় প্রার্থনা ও মেডিটেশন শুরু। টানা ৩০ মিনিট চোখ বন্ধ করে ডেস্কের ওপরে দুহাত রেখে পিঠ সোজা করে বসা। কিন্তু চোখ আর কতক্ষণ বন্ধ রাখা যায়? পাশের বন্ধু কী করছে, টিচার কোথায় গেলেন,

এগুলো তো দেখতে ইচ্ছে করে। অধ্যক্ষা বলেন, 'ওরা যে একভাবে চোখ বন্ধ করে বসে থাকতে পারবে না, সেটা ধরে নিয়েই আমরা এটা শুরু করেছি। তবে ওই যে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল, মনটা একটু শান্ত হলো, সেটাতেও ভালো ফল পাওয়া যাবে।'

পরীক্ষার হলে ঢুকেও বইতে চোখ বুলিয়ে নেয়ার অভ্যাসটা ভালো নয়। ওতে বাচ্চাদের মন আরো চঞ্চল হয় বলে শিশু-মনোবিদরা জানান। সেই জায়গায় ধ্যান ওদের স্থির করতে সাহায্য করে। প্রতিদিন প্রথম পিরিয়ডের শুরুতে পাঁচ মিনিটের জন্যে এ অভ্যাসটি করানো হবে বলে অধ্যক্ষা জানান। তিনি বলেন, 'মিথ্যা কথা বলবো না', 'সহপাঠীদের সাহায্য করবো'– এ ধরনের কিছু কথা ওরা যদি নিয়মিত মনে মনে আওড়ায়, তাহলেও ওদের মনে এর প্রভাব পড়বে।

অভিনব ভারতী স্কুলের অধ্যক্ষা সঙ্ঘমিত্রা মুখোপাধ্যায় জানান, বাচ্চাদের চাপ কমাতে তারা নিয়মিত কাউন্সেলিং করান। তিনি বলেন, অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সব থেকে বেশি চাপ কাজ করে। এর কারণ কী তা ঠিক বোঝা যায় না। এই চাপকে তারা বলছেন 'আনডিফাইন্ড স্ট্রেস'।

চীনের স্কুলগুলোতে মেডিটেশন চর্চার ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। নতুন স্কুল, নতুন ক্লাস, নতুন সেমিস্টার এবং নতুন সিলেবাস নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে সাধারণ ভীতি কাজ করে, তা থেকে মুক্তি পেতে বিভিন্ন স্কুলে গঠন করা হয়েছে মেডিটেশন ক্লাব। প্রতি বৃহস্পতিবার এই ক্লাবের সদস্য শিক্ষার্থীরা মেডিটেশন ও অন্যান্য সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নেয়। ফলে দেখা গেছে, অন্যান্যদের তুলনায় তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে এবং পরীক্ষায় তাদের ফলাফলও আগের থেকে ভালো।

তথ্যসূত্র : দি গার্ডিয়ান
আনন্দবাজার পত্রিকা

পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ ম্যাথু রিকার্ড বলেন–

মেডিটেশন স্থায়ী ও অনন্ত সুখের মূল উপাদান

সুখী হতে কে না চায়? সুখের খোঁজে কত কী-ই না করে মানুষ। সুখের আকাঙ্ক্ষা যেন সার্বজনীন। কিন্তু সত্যিকারভাবে কজনই-বা এর দেখা পায়? গুণীজনেরা বলেন, সত্যিকারের সুখের ছটায় সবসময় ঝলমল করে ওঠে একজন মানুষের চেহারা, অভিব্যক্তি ও আচরণ। চলুন শোনা যাক, তেমনই একজন সুখী মানুষের গল্প–

ম্যাথু রিকার্ড। ৬৪ বছর বয়সী এ মানুষটি একসময় কাজ করেছেন অণুজীব বিজ্ঞানী হিসেবে। বর্তমানে তিনি একাধারে লেখক আলোকচিত্রী গবেষক অনুবাদক ও একজন ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু। এতগুলো উপাধির সাথে তার নামের পাশে এখন যুক্ত হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে সুখী মানুষের উপাধি। রীতিমতো বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত এটি।

রিকার্ডের চেহারাটা যেন একজন প্রশান্ত মানুষের মুখচ্ছবি। তিনি মনে করেন, প্রত্যেক মানুষই পারে অফুরান আনন্দ আর সুখের অনুভূতিতে নিজের জীবনকে পরিপূর্ণ করে তুলতে। সহিষ্ণু দৃষ্টির এ মানুষটির ঠোঁটের কোণে একটা ছোট্ট হাসি স্থান করে নিয়েছে সবসময়ের জন্যেই। রিকার্ডের এ নিরন্তর সুখের রহস্য কী? উত্তর একটাই–দৈনন্দিন জীবনে নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা।

২০০৪ সালে একাধিক ল্যাবরেটরি টেস্টের পর রিকার্ড পেয়েছেন বিশ্বসুখী মানুষের খেতাব। কয়েক ধাপবিশিষ্ট গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, তার মধ্যে রয়েছে আনন্দপূর্ণ জীবনের এক অভাবনীয় ক্ষমতা। গবেষণাকালে বিজ্ঞানীরা তার পুরো মাথাটাকে মুড়ে ফেলেছিলেন ২৫৬টি ইলেকট্রোড দিয়ে। সীমাহীন উৎসাহ নিয়ে তারা রিকার্ডের ব্রেনের ওপর মেডিটেশনের প্রভাব অনুসন্ধান করতে থাকেন।

গবেষণা ও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিজ্ঞানীদের সামনে যে জিনিসটি উন্মোচিত হয়েছে, সেটি এককথায় দারুণ চমকপ্রদ। রিকার্ড এবং অন্যান্য

ধ্যানমগ্ন ভিক্ষুর ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে, তাদের ব্রেনের প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স অত্যন্ত সুতীক্ষ্ণ। উল্লেখ্য, মানুষের তৃপ্তি, সুখ আর আনন্দের মতো ইতিবাচক আবেগগুলো নিয়ন্ত্রিত হয় ব্রেনের এ অংশটি থেকেই।

৩৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে মেডিটেশন চর্চা করছেন ম্যাথু রিকার্ড। যার ফলে তিনি এখন তার মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। তার ভাষায়, মেডিটেশন স্থায়ী ও অনন্ত সুখের মূল উপাদান। A Guide to Developing Life's Most Important Skill বইতে সুখের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রিকার্ড লিখেছেন, সুস্থ সুন্দর মন থেকে উৎসারিত এক গভীর অনুভূতিই হলো সুখ। ২০০৭ সালে প্রকাশিত এ বইটি পরবর্তীতে বেস্ট সেলার-এর সম্মান লাভ করে। মূলত সুখ নিয়ে তার অনুভূতি উপলব্ধিগুলোই রিকার্ড তুলে ধরেছেন এ বইটিতে।

দেশ থেকে দেশে ঘুরে ঘুরে মানুষের কাছে তিনি পৌঁছে দিচ্ছেন সুখের গূঢ় তত্ত্ব। গভীর আগ্রহে এ সুখী মানুষের কথা শুনতে আসেন ছাত্র থেকে করপোরেট পেশাজীবীসহ সব ধরনের মানুষ। সহজ ভাষায় সৌম্য ভঙ্গিতে তিনি বলে চলেন–'সুখ হচ্ছে এমন এক প্রশান্ত অনুভূতি, যা অযাচিত সব দুঃখ অশান্তি আবেগকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়....'।

রিকার্ড বলেন, সুখের জন্যে আমরা চারপাশের অনেক কিছুতে অবলম্বন খুঁজে বেড়াই। কিন্তু আসলে এর সন্ধান করা উচিত নিজের অন্তর্গত আনন্দলোকে। আমি বিশ্বাস করি, সুখী হওয়ার একমাত্র উপায় এটাই। আর আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন–চারপাশে কী ঘটছে তা মোটেও বিবেচ্য নয়, বরং পারিপার্শ্বিক এ ঘটনাগুলোকে আমরা কীভাবে দেখছি অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ওপরই নির্ভর করে জীবনের সুখ ও আনন্দ।

আসলে বিষয়টি এমন যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা যা-ই হোক, আমাদের সবার মধ্যেই রয়েছে সুখী হওয়ার এক আশ্চর্য ক্ষমতা। এর জন্যে আগে আমাদের মনটাকে নিয়ন্ত্রণ করা শিখতে হবে। জানতে হবে এর উপায়। কারণ শারীরিক-মানসিক সুস্থতা, নিয়মানুবর্তী জীবনযাপন–এ সবকিছুর জন্যেই মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা জরুরি।

শরীরের সুস্থতা ও সৌন্দর্য বজায় রাখার জন্যে প্রতিদিন আমরা কত কী-ই না করি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি, সেদিকেই আমাদের মনোযোগ সবচেয়ে কম। তা হলো–নিজের মনের দিকে তাকানো, মনের যত্ন নেয়া। আসলে মনের প্রতি, অন্তর্গত অস্তিত্বের প্রতি এ মনোযোগই আমাদের উপলব্ধিগুলোকে আরো শাণিত করে তোলে। নিরন্তর সুখের দেখা পাই

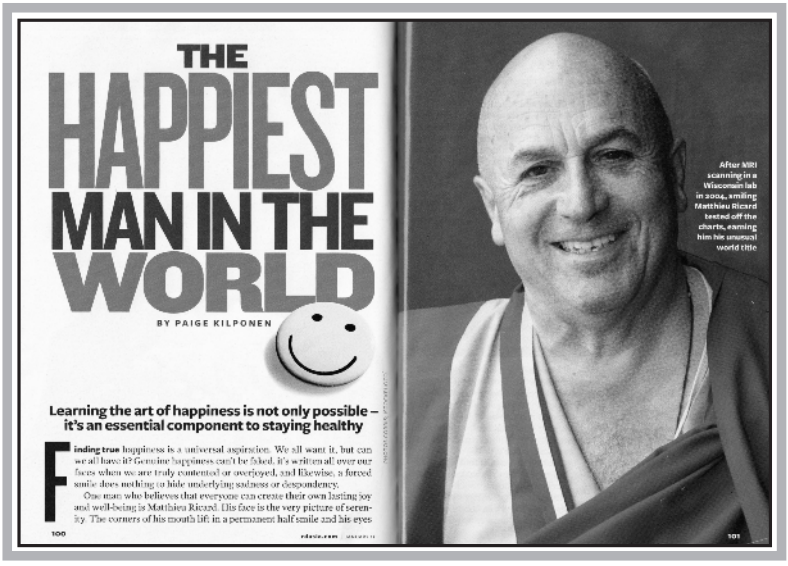

THE
HAPPIEST
MAN IN THE
WORLD

BY PAIGE KILPONEN

Learning the art of happiness is not only possible – it's an essential component to staying healthy

Finding true happiness is a universal aspiration. We all want it, but can we all have it? Genuine happiness can't be faked, it's written all over our faces when we are truly contented or overjoyed, and likewise, a forced smile does nothing to hide underlying sadness or despondency.

One man who believes that everyone can create their own lasting joy and well-being is Matthieu Ricard. His face is the very picture of serenity. The corners of his mouth lift in a permanent half-smile and his eyes

After MRI scanning in a Wisconsin lab in 2004, smiling Matthieu Ricard tested off the charts, earning him his unusual world title

আমরা। আর এর সবচেয়ে কার্যকরী প্রক্রিয়াটি হলো মেডিটেশন। দিনে আধঘণ্টা মেডিটেশন আপনাকে পৌঁছে দেবে এক আশ্চর্য সুখানুভূতির রাজ্যে।

আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত যা ঘটে চলেছে তা কিন্তু আমাদের দুঃখের কারণ নয়, বরং এসব ঘটনায় আমরা যেভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি, মূলত তা-ই আমাদেরকে অসুখী করে তোলে। এ প্রসঙ্গে রিকার্ডের উপলব্ধি– 'পৃথিবীর সবকিছুকে আমি কখনোই নিজের ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করে ফেলতে পারবো না কিন্তু নিজের মনটাকে তো পরিবর্তন করতে পারি আমি। আর যিনি নিজের মনকে পরিবর্তন করতে পারেন অর্থাৎ নিজেকে বদলাতে পারেন তিনি পৃথিবীটাকেই পারেন বদলে দিতে।'

বিশেষজ্ঞরা বলেন, সুখের পেছনে ছোটা এবং ক্রমাগত এভাবে ছুটতে থাকা আধুনিক মানুষের একটি অবসেশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে প্রতিনিয়তই আমরা যেন পারিপার্শ্বিক সব অযাচিত আবেগ-অনুভূতির সাথে যুদ্ধে পরাভূত হচ্ছি। তাই সুখী হওয়ার জন্যে রিকার্ডের পরামর্শ–ভেতরে কৃতজ্ঞতাবোধ সন্তুষ্টচিত্ততা কল্যাণকামিতা লালন করুন। আপনি সুখী হবেন। শুধু মনোরম আর সুখপ্রদ অভিজ্ঞতার পেছনে ছুটলেই আপনি সত্যিকারের সুখী হতে পারবেন না। কারণ, সুখী হওয়াটা নির্ভর করে কিছু মানবিক আচরণের ওপর যেমন : উদারতা, পরার্থপরতা, সমমর্মিতা, অন্তর্গত শক্তি। সেইসাথে চাই

প্রশান্ত মন। আর আনন্দময় সুখের পথে সবচেয়ে বড় হুমকি হলো অহংকার ও আত্মকেন্দ্রিকতা। তাই সুখী হতে হলে সমমর্মী ও অন্যের কল্যাণকামী হোন সবার আগে। এভাবেই শুরু হবে আপনার সুখযাত্রা।

'বিশ্বের সবচেয়ে সুখী মানুষ'–উপাধিটি এমন জাঁকালো আর দশাসই হলেও ম্যাথু রিকার্ডের বার্তাটি কিন্তু খুব সরল। যা সহজেই বোধগম্য এবং অনুসরণযোগ্য। তা হলো–দয়ালু হোন, নিঃস্বার্থ মমতায় প্লাবিত করুন নিজের অন্তর। অন্তর্গত শক্তি, উদারতা আর কৃতজ্ঞতাবোধে পূর্ণ হোক আপনার সমগ্র অস্তিত্ব। নিয়মিত ধ্যানমগ্ন হোন। সত্যিকারের সুখের দেখা মিলবেই।

তথ্যসূত্র : রিডার্স ডাইজেস্ট (জানুয়ারি ২০১১)

কোয়ান্টাম

কোয়ান্টাম আধুনিক মানুষের জীবনযাপনের বিজ্ঞান। সঠিক জীবনদৃষ্টি প্রয়োগ করে মেধা ও প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকে অনন্য মানুষে রূপান্তরিত করাই এর লক্ষ্য। স্ব-উদ্যোগ, স্ব-পরিকল্পনা ও স্ব-অর্থায়নে সৃষ্টির সেবায় সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করে বাংলাদেশকে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় জাতিতে রূপান্তরিত করাই এর মনছবি। কোয়ান্টাম মেথড অনুশীলন করে সমাজের সর্বস্তরের লাখো মানুষ অশান্তিকে প্রশান্তিতে, রোগকে সুস্থতায়, ব্যর্থতাকে সাফল্যে, অভাবকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করেছেন। কোয়ান্টাম চর্চার মাধ্যমে আপনিও বদলে দিতে পারেন আপনার জীবন।

www.quantummethod.org.bd